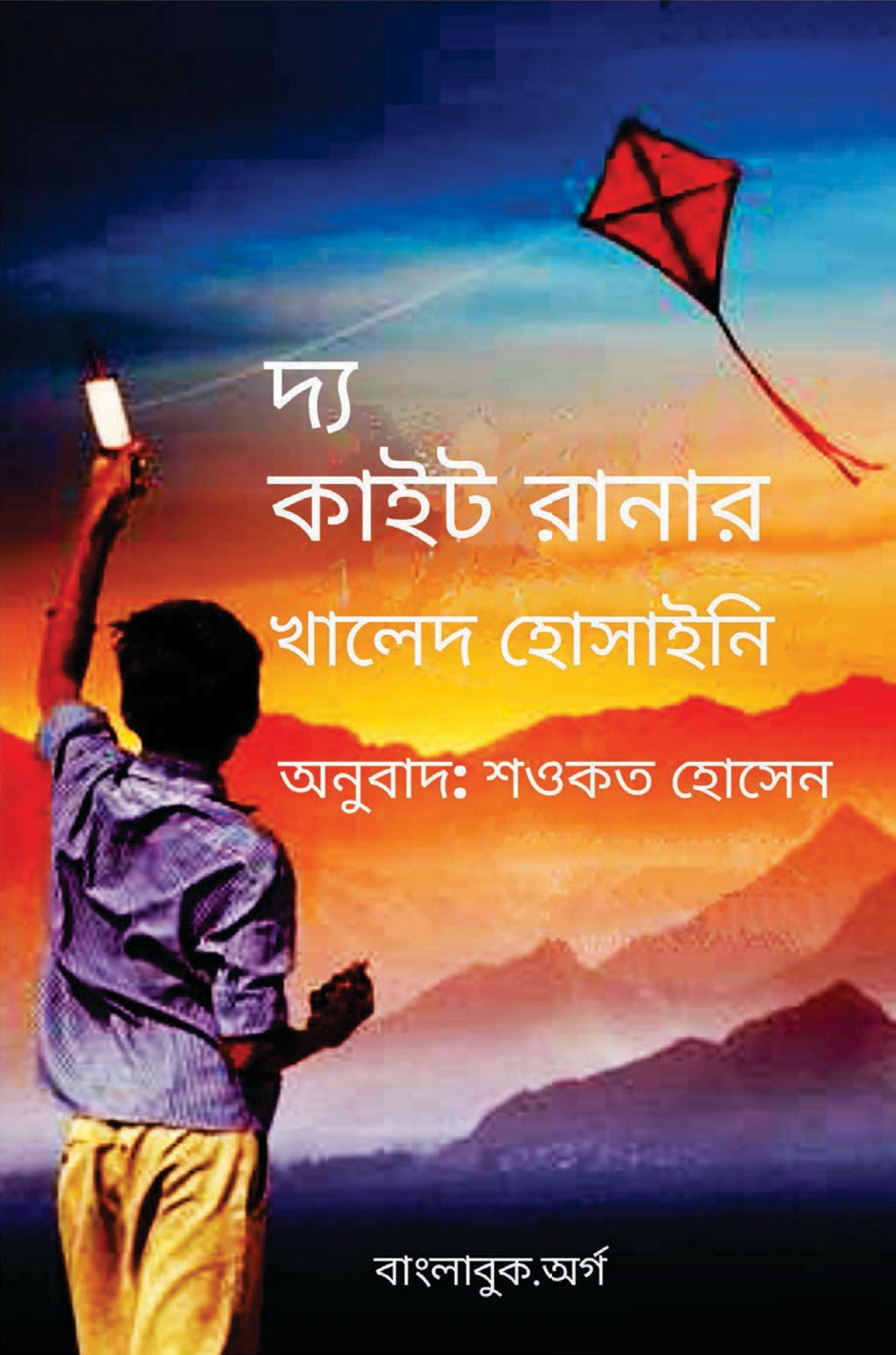

দ্য কাইট রানার

খালেদ হোসাইনি

অনুবাদ: শওকত হোসেন

বাংলাবুক.অর্গ

দ্য কাইট রানার
মূল: খালিদ হোসেইনি
অনুবাদ: শওকত হোসেন

প্রকাশক	আবদুর রউফ বকুল কথামেলা প্রকাশন ৩৮/৪, বাংলাবাজার (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০ মোবাইল ০১৭১২-৪৭৪৩০৭
প্রথম প্রকাশ	বইমেলা, ২০০৯
অনুবাদকস্বত্ব	অনুবাদক
প্রচ্ছদ	হাসান খুরশীদ রুমী
বর্ণবিন্যাস	অনুবাদক
মুদ্রণ	অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস ৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০
মূল্য	তিনশত ত্রিশ টাকা মাত্র
The Kite Runner	by Khaled Hosain Translated by Saokot Hossain Published by Abdur Rauf Bakul, Kathamela Prokashan 38/4, Bangla Bazar, Dhaka 1100 Cover Design Hassan Khurshid Rumi First Published in Book Fair 2009 Price 330.00 Only US $ 8.00 ISBN-984-8321-76-4

দ্য কাইট রানার

খালিদ হোসেইনি

অনুবাদ: শওকত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

কথামেলা
কথামেলা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছে তাঁদের পরামর্শ, সহযোগিতা, কিংবা সহায়তার জন্যে ঋণী: ড. আলফ্রেড লার্নার, ডরি ভাকিস, রবিন হেক, ড. টড ড্রে, ড. রবার্ট টাল এবং ড. স্যান্ডি চান। দত্তক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুপরামর্শের জন্যে ইস্ট স্যান হোসে কমিউনিটি ল' সেন্টারের লিনেট পার্কারকেও ধন্যবাদ জানাই। আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতা আমাকে জানানোর জন্যে ধন্যবাদ জানাই মিস্টার দাউদ ওহাবকেও। বন্ধুবর তামিম আনসারির কাছে নির্দেশনা আর সমর্থনের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। প্রতিক্রিয়া এবং উৎসাহ যোগানোর জন্য স্যান ফ্রান্সিস্কো রাইটার ওঅর্কশপের বাহিনীর কেও ধন্যবাদ জানাই। আমার বাবা, পুরোনো বন্ধু এবং বাবার মাঝে মহত যা কিছু আছে তাঁর অনুপ্রেরণার জন্যে বাবাকে ধন্যবাদ। মাকে ধন্যবাদ আমার জন্যে প্রার্থনা করার জন্যে: এই বইটি লেখার প্রতিটি ধাপে নজর রেখেছেন তিনি। ছোটবেলায় আমাকে বই কিনে দেওয়ার জন্যে খালাকে ধন্যবাদ। আমার গল্প পড়ার জন্যে আলি, স্যান্ডি দাউদ, ওয়ালিদ, রায়া, শেলা, যাহরা, রোহ এবং কাদেরকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ওদের উষ্ণ আর অটল সমর্থনের জন্যেও।

আমার এজেন্ট এবং বন্ধু ইলেইন কস্টারকে তাঁর প্রজ্ঞা এবং মহতি আচরণের জন্যে ধন্যবাদ জানাতে হয়। ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সুবিচারক সম্পাদক সিন্ডি স্পাইজেলকেও, এই কাহিনীর অনেক দুয়ার খুলতে আমাকে সাহায্য করেছেন তিনি।

এই বইটি নিয়ে একটা ঝুঁকি নেওয়ার জন্যেও সুজান পিটারসন কেনেডিকে ধন্যবাদ জানাই। এই বইটির জন্যে কঠোর প্ররিশ্রম করার জন্যে ধন্যবাদ জানাই কঠোর পরিশ্রমী কর্মচারীদের।

সবশেষে আমার সুপ্রিয় স্ত্রী রোয়াকে–ওর মতামতের প্রতি আমি আসক্ত–ওর মমতা, মহত্ব এবং এই বইটির প্রতিটি খসড়া পড়ে সম্পাদনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্যে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব জানি না। তোমার ধৈর্য আর উপলব্ধির জন্যে তোমাকে সবসময়ই ভালোবেসে যাব, রোয়া জান।

ভূমিকা

ইতালীয় ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—ত্রাদুত্তোরে-ত্রাদিতোরে। হায়াৎ মামুদ এর বাংলা করেছেন বেঈমান তর্জমা এবং এই নামে অনুবাদ সম্পর্কিত তাঁর একটি গ্রন্থের নামও রেখেছেন। বোঝা যায়, অনুবাদ যতই বিশ্বস্ত হোক না কেন, মূলকে কিছু ফাঁকি না দিয়ে, কোনো না কোনোভাবে কিছু অবিশ্বস্ত না হয়ে অনুবাদের চলার উপায় নেই। অর্থাৎ অনুবাদ হচ্ছে সেই প্রিয়তমা, কিছু মিষ্টি মিথ্যার আশ্রয় না নিলে, কিছু ছল-ছুতোর ব্যাপারে না থাকলে যার প্রতি ভালোবাসা পরিপূর্ণ হয় না। আর অনুবাদকের ক্ষেত্রে যেটুকু মূলের বিশ্বস্ত ভাষান্তর সেটুকু অনুবাদ, আর মূলকে আশ্রয় করে যেটুকু মূলের চেয়ে বেশিকিছু সেটুকু শিল্প-অনুবাদ সাহিত্য। কিন্তু এই অনুবাদ কীভাবে সাহিত্য হয়ে ওঠে, শিল্পের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হয়, এর কোনো ব্যাকরণ আছে কি না, তা আমার জানা নেই। আমরা শুধু এটুকু বুঝি যে, অনুবাদটুকু পড়ে আনন্দ পেলাম, কোথাও খটরমটর বোধ করিনি, বেশ সহজ-সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, তাহলেই আমার কাছে তা অনুবাদ সাহিত্য। শওকত হোসেনের অনেকগুলো অনুবাদগ্রন্থ পড়তে গিয়ে আমি এই বিরল অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, যেখানে তিনি অসাধারণ মমতা ও নিষ্ঠায় মূলের আয়োজনটিকে তুলে আনতে চেয়েছেন বাংলা ভাষার সীমানায়।

বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কোনো অনুবাদ হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্য—সব ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য যে অন্য ভাষার অতি সামান্যই বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। আমার তো মনে হয়, অনুবাদের মতো এতটা হতদরিদ্র শাখা বাংলা ভাষায় আর কোনোটি নয়। সাম্প্রতিক কালে এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য যাঁরা নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে শওকত হোসেন অন্যতম। দুই দশকের অধিক সময় ধরে নীরবচ্ছিন্নভাবে তিনি অনুবাদকর্মের সঙ্গে জড়িত। গভীর ভালোবাসা, অসাধারণ নিষ্ঠা, প্রত্যয় ও অঙ্গিকার না থাকলে শুধুই অনুবাদের সঙ্গে এতটা সময় ধরে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে জড়িয়ে রাখা সম্ভব হত না। এ হচ্ছে অন্য ভাষার সাহিত্যের প্রতি শওকত হোসেনের ভালোবাসা এবং নিজ ভাষার পাঠককে সেই ভালোবাসার অংশিদার করার দায়। নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন শওকত হোসেন।

আশির দশকের গোড়ার দিকে অনেকটা আকস্মিকভাবেই অনুবাদ-শিল্পের ভালোবাসায় জড়িয়ে যান শওকত হোসেন। আরম্ভক্ষণটা ছিল রানওয়ে জিরো এইট দিয়ে। তারপর অনুবাদের রানওয়ে আর শেষ হয়নি। অধিকন্তু বিগত কুড়ি বছর ধরে তিনি অনুবাদ করেছেন মার্গারেট মিচেলে-র গন উইদ দ্য উইন্ড, র‍্যনডাল ওয়ালেসের-র ব্রেভহার্ট, দফনে দ্যু মরিয়ে-র মাই কাজিন র‍্যাচেল, ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর ইসলাম সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ক্যারল অ্যান লী-এর অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের জীবনী রোজেস ফ্রম দ্য আর্থ, ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর মুহাম্মদ আ বায়োগ্রাফি অব দ্য প্রফেট, আ হিস্ট্রি অব গড এবং

দ্য ব্যাটল ফর গড, ইয়স্তেন গার্ডারে-র মায়া, হোসে সারামাগের বালথ্যাসার এন্ড ব্লিমুন্ডা, মার্সেল মোরিং-এর ইন ব্যাবিলনসহ সুপ্রচুর গ্রন্থ। লক্ষণীয় বেশ কিছু অনুবাদগ্রন্থ সাহিত্য অনুবাদ নয়–জ্ঞানের জগৎকে সম্প্রসারিত করাই এর আসল উদ্দেশ্য। এ সব গ্রন্থে নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, নতুন ভাবনার সঙ্গে, নতুন জীবনবোধের সঙ্গে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন শওকত। এ ক্ষেত্রে তিনি মূলের বিশ্বস্ত সহচর থাকতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এখন যে অনুবাদগ্রন্থটি আমি পড়ছি, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা আফগান কথাসাহিত্যিক খালিদ হোসেইনির উপন্যাস, দ্য কাইট রানার। শওকত হোসেন অনুবাদ করেছেন সরাসরি ইংরেজি থেকে।

সম্ভবত আমাদের দেশের অধিকাংশ অনুবাদ গ্রন্থের নিয়তি এই যে, বিভিন্ন ভাষার মূল্যবান গ্রন্থ যখন ইংরেজিতে অনুবাদ হয় তার পর আসে বাংলায়। অন্য ভাষার অনুবাদগ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি নেই বরং অনুবাদক যে ভাষা থেকেই অনুবাদ করুন না কেন সেই ভাষার গ্রন্থটির ওপর তার সহজ-স্বচ্ছল অধিকার জন্মালেই কেবল অনুবাদটি পাঠযোগ্য ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিহার্য। কেননা অনুবাদের দক্ষতা অভিজ্ঞতার শরণপ্রার্থী। বরিস পাস্তারনক-এর কবিতা অনুবাদ প্রসঙ্গে সানাউল হক একই কথা বলেছেন : 'অনুশীলনের মাধ্যমে অন্য সব কিছুর মতো অনুবাদকর্মেও উৎকর্ষ সম্ভব।' আর শওকত হোসেন আমাদের ভাষার সেই অঙ্গুলিমেয় অনুবাদকদের একজন যিনি আশ্চর্য নিষ্ঠার সঙ্গে অনুবাদ করে চলছেন একের পর এক বিদেশি ভাষার আকর গ্রন্থ। দ্য কাইট রানার অনুবাদটি পড়ে অনুবাদের ওপর তাঁর সহজাত শক্তি ও স্বচ্ছলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শওকত হোসেন দেখিয়েছেন যে, অনুবাদ শুধু শব্দ নিয়ে ভাবনা নয়–এ ভাবনা পুরো সংগঠন নিয়ে। আর এ সংগঠন চিন্তার, বাক্যের, বাক্য-বন্ধের, প্রবাদ-প্রবচনের, জাতিগত সংস্কার-সংস্কৃতির, ভাষাগত ব্যঞ্জনা ও অর্থদ্যোতনার। সুতরাং সংবাদপত্রের কোনো খবরকে যেভাবে অনুবাদ করা যায় কথাসাহিত্যের অনুবাদ সেভাবে সম্ভব নয়। অধিকন্তু অন্য ভাষার প্রাণের পরিচয় জেনে তাকে প্রকাশ করতে হয় নিজ ভাষার ঐশ্বর্যে। এ ক্ষেত্রে সমস্যা নানাবিধ। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষার একটি মুখ্য প্রবণতা হলো, দূরান্বয় সৃষ্টি (Parenthetical)। অর্থাৎ একই বাক্যে কমা-সেমিকোলন-ড্যাশ দিয়ে আট-দশ পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত অবলীলায় চলতে থাকে বাক্যের গতি। ইংরেজি ভাষাশৈলির এই বিশেষ প্রবণতা বাংলায় নেই। ফলে ইংরেজি থেকে যারা বাংলায় অনুবাদ করেন তাদেরকে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হয়। দ্য কাইট রানার শীর্ষক অনুবাদগ্রন্থে শওকত হোসেন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করেছেন। কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃতি দিই :

ওই বাড়িতে আঠার বছর বসবাস করার সময় হাসান আর ওর বাবার ঘরে মাত্র কয়েকবার গিয়েছি আমি। সূর্য পাহাড়ের ওপাশে ডুব দেওয়ার পরে দিনের খেলা শেষ হলে হাসান আর আমি আলাদা হয়ে যেতাম। গোলাপের ফেয়ারি পাশ কাটিয়ে বাবার

ম্যনশনের পথ ধরতাম আমি; হাসান চলে যেত ওর মাটির ঘরে, যেখানে ওর জন্ম, যেখানে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে ও।

শওকত হোসেন শব্দ নির্বাচনে আটপৌরে নন। তিনি চেষ্টা করেন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সব চেয়ে উপযোগী শব্দটি নির্বাচন করতে। এ ক্ষেত্রে তাঁর পরিশ্রম শ্রদ্ধার যোগ্য। দ্য কাইট রানার এর মতো উপন্যাস অনুবাদ করতে গেলে যে পরিমাণ ধৈর্য ও সহনশীলতা দরকার, শওকত হোসেনের তা আছে। ফলে দ্য কাইট রানার উপন্যাসটি যারা পড়বেন তারা লক্ষ করবেন প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তিনি রক্ষা করছেন অসাধারণ সংহতি ও অন্বয়। বিষয়ের ওপর দখল আর ভাষার উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকলে একটি দীর্ঘ উপন্যাসের আপাদমস্তক অনুবাদে এই সংহতি রক্ষিত হত না। শুধু তাই নয়, মূলের প্রাণৈশ্বর্য ও গতিশীলতা অনুবাদে রক্ষা করতে হলে যে সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রয়োজন, অনুবাদগ্রন্থটিতে তারও কোনো অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ফলে অনুবাদকর্মটির মধ্যে যে শ্রমের পরিচয় আছে কখনই তা অপচয় বলে মনে হয় না। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, ‘অনুবাদে বৈশিষ্ট্যের অবকাশ যতই থান না কেন, তার সুপরিমিত সীমা যেহেতু স্বেচ্ছাচারের পরিপন্থী, তাই তার চর্চা স্বায়াত্তশাসনের নামান্তর।’ অর্থাৎ অনুবাদের মধ্যে অনুবাদকের স্বাধীনতার একটা সীমা আছে, যেখানে স্বেচ্ছাচারের কোনো অবকাশ নেই। শওকত হোসেন অসাধারণ নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে সেই সীমা মেনে চলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদশিল্পে, বিশেষ করে কবিতার অনুবাদে প্রতিরূপতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে অনুবাদ হওয়া উচিত ‘অনুরূপ’। অর্থাৎ অনুবাদকর্মে সৃজনশীলতাকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে যে সৃজনশীলতা প্রত্যাশিত, গদ্যের ক্ষেত্রে তার সীমা কতটুকু? আমার বিশ্বাস তা মোটেই কম নয়। শওকত হোসেনের দ্য কাইট রানার শীর্ষক অনুবাদকর্মটির দিকে তাকালেই এই সত্যতার প্রমাণ মিলে। প্রায় প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি পদে, পদবিন্যাসে, বাক্যে ও বাক্যবন্ধে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছে নিজস্ব কল্পনাবৃত্তির ও সৃজনী প্রতিভার। এবং মূল লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-দর্শন যেন অনুবাদে রক্ষিত হয়, এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দায়িত্ববান ও বিশ্বস্ত। গোয়টে বিশ্বমানস বিনিময়ের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের একমাত্র মাধ্যম যে অনুবাদ, শওকত হোসেন তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে তা বিশ্বাস করেন। ফলে অনুবাদকর্মে তিনি কোনো তাৎক্ষণিকতা বা ঐকাহিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। অধিকন্তু অনুবাদকে তিনি গ্রহণ করেছেন এক মহান ব্রত হিসেবে, লোককল্যাণের এক বিপুল প্রকল্প হিসেবে, যেখানে তিনি বিপুলা এ পৃথিবীকে গভীরভাবে ভালোবেসে বাঙালির ঘরে ডেকে এনে বসাতে চান, ভাব ও কল্পনার যোগাযোগে বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ও মানসকে তিনি চান এক পঙক্তিভোজ্য করে তুলতে। শওকত হোসেনের এই ব্রতযাত্রা অক্ষুণ্ন থাকুক।

সরকার আবদুল মান্নান

এক

ডিসেম্বর ২০০১

১৯৭৫ সালের শীত কালের এক মেঘলা দিনে এই আমি আজকের আমিতে রূপান্তরিত হয়েছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে । একটা ভেঙে পড়া মাটির দেয়ালের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে ঠাণ্ডায় জমাট বেধে যাওয়া নালার কাছের গলিপথের দিকে উঁকি দিচ্ছি। অনেক দিন আগের কথা এটা, কিন্তু অতীত সম্পর্কে লোকে যা বলে–তাকে নাকি কবর দেওয়া যায়–সেটা ঠিক নয়; শিখেছি আমি। কারণ অতীত থাবা বাড়িয়ে দেয়। পেছনে তাকিয়ে এখন বুঝতে পারি গত পঁচিশ বছর ধরেই ওই গলিপথে উঁকি দিয়ে চলেছি।

গত গ্রীষ্মের একদিন আমার বন্ধু রহিম খান পাকিস্তান থেকে ফোন করে। আমাকে অনুরোধ করে ওকে দেখতে যাবার জন্যে। কিচেনে দাঁড়িয়ে রিসিভার কানে ধরেই বুঝে গিয়েছিলাম ফোনে ওটা রহিম খান কথা বলছে না। ওটা আমার চাপা দেওয়া পাপের অতীত। ফোন রেখে দেওয়ার পর গোল্ডেন গেইট পার্কের উত্তর প্রান্তে স্প্রেকেলস লেক বরাবর হাঁটতে বের হলাম। শেষ বেলার রোদ লেকের জলে ঝিলিক খেলছে, কয়েক ডযেন ছোট ছোট নৌকা ভাসছে ওখানে। ঠাণ্ডা শুকনো হাওয়ার টানে ভেসে চলেছে ওগুলো। হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতেই লম্বা নীল লেজঅলা এক জোড়া লাল ঘুড়ি চোখে পড়ল আমার, অনেক উঁচুতে উড়ছে। পার্কের পশ্চিম সীমানার গাছপালা আর উইন্ড মিলের ওপর নাচছে ওগুলো। পাশাপাশি একজোড়া চোখ যেন স্যান ফ্রান্সিস্কোর দিকে চেয়ে আছে, যে শহরকে এখন নিজের

BanglaBook.org

বাড়ি বলে জানি। সহসা মাথার ভেতর হাসানের কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে উঠল: *তোমার জন্যে হাজার বার।* হাসান হচ্ছে হেয়ারলিপ ঘুড়ি ধাওয়াকারী।

উইলো গাছের কাছে পার্কের বেঞ্চিতে বসে পড়লাম। ফোন রাখার ঠিক আগ মুহূর্তে রহিম খানের বলা কথাটা মনে পড়ল। *আবার ভালো হওয়ার একটা উপায় আছে।* জোড়া ঘুড়ির দিকে তাকালাম। হাসানের কথা ভাবলাম। বাবার কথা ভাবলাম। আলি। কাবুল। ১৯৭৫ সালের শীতকাল–যা আমাকে আজকের আমিতে পরিণত করেছে–এসে সব কিছু বদলে দেওয়ার আগের যাপিত জীবনের কথা ভাবলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দুই

ছোট বেলায় আমি আর হাসান বাবার বাড়ির ড্রাইভওয়েের পপলার গাছে উঠে এক টুকরো ভাঙা কাঁচের উপর রোদের আলো ঠিকরে দিয়ে পাড়াপড়শীদের বিরক্তি উৎপাদন করতাম। এক জোড়া উঁচু ডালে দুপাশে পা ঝুলিয়ে মুখোমুখি বসতাম আমরা, আমাদের প্যান্টের পকেট ভর্তি থাকত শুকনো মালবেরি আর ওয়ালনাট। পালা করে মালবেরি খেতাম আর আয়নাটা হাত বদল করতাম। একে অপরকে রস মাখিয়ে দিতাম আর হেসে কুটিকুটি হতাম। এখনও হাসানকে সেই গাছের ডালে দেখতে পাচ্ছি, রোদের আলো পাতার ফাঁক গলে ওর প্রায় নিখুঁত গোলাকার মুখের উপর এসে পড়ছে। শক্ত কাঠ কুঁদে বের করে আনা চাইনিজ পুতুলের মতো একটা চেহারা: থ্যাবড়া, চওড়া নাক, বাঁশ পাতার মতো সরু তেরচা চোখ, আলোর উপর নির্ভর করে কখনও সোনালী, কখনও সবুজ, আবার কখনও নীলকান্ত মণির মতো। এখনও ওর নিচু করে বসানো কানজোড়া আর সূচাল চিবুক দেখতে পাচ্ছি। একটা মাংসল বাড়তি অংশ, দেখে মনে হয় যেন পরে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কাটাটা ঠোঁটের ঠিক মাঝখানে শেষ হয়ে গেছে। যেন বা চাইনিজ পুতুল নির্মাতার যন্ত্র থেমে গিয়েছে, পড়ে গেছে বা হয়ত স্রেফ ক্লান্ত আর অসতর্ক হয়ে উঠেছিল সে।

অনেক সময় গাছের উপর বসে হাসানকে ওর গুলতি দিয়ে পড়শীর একচোখা জার্মান শেফার্ডের দিকে গুলি ছুড়তে রাজি করিয়েছি আমি। হাসান কখনও তা করতে চাইত না। তবে আমি চাইলে, সত্যি সত্যিই চাইলে আমার কথা ও ফেলে দিত না। হাসান কখনওই আমার কোনও কথা ফেলে দেয়নি।

BanglaBook.org

গুলতিতে দারুণ হাত ছিল ওর। হাসানের বাবা আলি আমাদের ধরে ফেলত, ক্ষেপে উঠত সে। কিংবা বলা যায় তার মতো একজন নিরীহ লোকের পক্ষে যতদূর রেগে ওঠা সম্ভব ততটাই রাগত ও। হাতের ইশারায় নেমে আসতে বলত আমাদের। আমাদের হাত থেকে আয়না কেড়ে নিয়ে মা ওকে কী বলেছিল সেটা বলত আমাদের। শয়তানও *নামাযের* সময় মুসলিমদের মনযোগ নষ্ট করার জন্যে আয়না দিয়ে আলো ঠিকরে দেয়। "কাজটা করার সময় হাসে সে," ছেলের দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে যোগ করত সে।

"হ্যাঁ, বাবা," পায়ের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলত হাসান। কিন্তু আমার নাম কখনও দেয়নি ও। কখনওই এটা বলেনি যে আয়না, পড়শীর কুকুরের গায়ে ওয়ালনাট ছোড়ার বুদ্ধিটা আমার ছিল।

লাল ইটের ড্রাইভওয়ের দুপাশে জন্মানো পপলার গাছগুলো একজোড়া রট-আয়রন গেইটের দিকে চলে গেছে। গেইটটা আবার খুলেছে বাবার এস্টেটের প্রসারিত ড্রাইভওয়েতে। ইটের রাস্তার বাম পাশে পড়েছে বাড়িটা। ওটার শেষ মাথায় পেছনের উঠোন।

এব্যাপারে সবাই একমত ছিল যে আমার আব্বা, বাবা, ওয়াযির আকবার খান এলাকার সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটা বানিয়েছে। কাবুলের উত্তরাংশের এক নতুন সমৃদ্ধ মহল্লা এটা। দুপাশে গোলাপের কেয়ারিঅলা প্রশস্ত একটা এন্ট্রিওয়ে মার্বল মেঝে আর চওড়া জানালাঅলা বিরাট একটা বাড়ির দিকে চলে গেছে। ইস্ফাহানে বাবার নিজের পছন্দ করা জটিল মোজায়েক টাইলস চারটে বাথরুমের মেঝে ঢেকে রেখেছে। কোলকাতা থেকে বাবার কেনা সোনার সুতোর কাজ করা পর্দা টানানো দেয়ালে। ভল্টেড সিলিং থেকে ঝুলছে একটা ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি।

ওপর তলায় ছিল আমার আর বাবার রুম; ওর স্টাডি, "স্মোকিং রুম" নামেও পরিচিত ছিল ওটা। সব সময় তামাক আর দারুচিনির গন্ধ পাওয়া যেত ওখানে। আলি ডিনার পরিবেশন করার পর বাবা আর ওর বন্ধুরা আয়েস করে কালো লেদার চেয়ারে বসত। পাইপ ভরে নিত ওরা-তবে বাবা একে বলত "পাইপ মোটা করা"–তারপর প্রিয় তিনটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করত: রাজনীতি, ব্যবসা আর সকার। অনেক সময় বাবাকে ওদের সঙ্গে বসা যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলে দরজা আগলে দাঁড়াত ও। "এখন যাও," বলত, "এটা বড়দের সময়। তোমার কোনও বই পড়তে যাও না কেন?" দরজা আটকে দিত ও। আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতাম কেন ওদের বেলায় সব সময় বড়দের সময় হবে। বুকের সঙ্গে হাঁটু লাগিয়ে দরজার কাছে বসে থাকতাম। অনেক সময় এক ঘণ্টা, কখনও

BanglaBook.org

বা দুই ঘণ্টাও বসে থাকতাম এভাবে, ওদের হাসি আর কথাবার্তার আওয়াজ শুনতাম।

নিচ তলার লিভিং রুমে কাস্টম-বিল্ট ওয়াল কেবিনেটঅলা অবতল একটা দেয়াল ছিল। ওটার ভেতরে দৃঢ়ভাবে বসানো পারিবারিক ছবি: ১৯৩১ সালে তোলা আমার দাদা আর বাদশাহ নাদির শাহর পুরোনো আঁশটে ছবি। বাদশাহ আততায়ীর হাতে মারা যাবার দুই বছর আগের ঘটনা এটা। হাঁটু অবধি লম্বা বুট পায়ে একটা মরা হরিণের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কাঁধের উপর রাইফেল। বাবা-মায়ের বিয়ের রাতের একটা ছবি রয়েছে। কালো স্যুটে বেপরোয়া লাগছে বাবাকে, শাদা পোশাকে তরুণী রাজকন্যার মতো হাসছে মা। এখানে আছে বাবা আর ওর সেরা বন্ধু এবং ব্যবসার অংশীদার রহিম খান, বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কেউই হাসছে না। এই ছবিতে আমি একবারে ছোটটি। আমাকে কোলে করে রেখেছে বাবা। ক্লান্ত আর গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে। আমি বাবার কোলে থাকলেও আমার আঙুলগুলো রহিম খানের গোলাপি হাত ধরে রেখেছে। বাঁকানো দেয়াল চলে গেছে ডাইনিং রুমের দিকে। এককোণে একটা মেহগনি টেবিল রয়েছে এখানে। অনায়াসে তিরিশজন অতিথি বসতে পারে। জাঁকালো পার্টি দেওয়ার বেলায় বাবার রুচির কথা ভাবলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সেটা ঘটত। ডাইনিং রুমের অন্য প্রান্তে একটা লম্বা মার্বল ফায়ার প্লেস। শীতকাল সব সময় আগুনের কমলা আভায় আলোকিত হয়ে থাকত ওটা।

একটা বিশাল স্লাইডিং ডোর অর্ধবৃত্তাকার একটা টেরেসে খুলেছে, ওটার পরেই দুই একর জায়গা জুড়ে সারি সারি চেরি গাছ নিয়ে একটা ব্যাকইয়ার্ড। পুব দেয়াল ঘেঁষে বাবা আর আলি ছোট একটা সব্জির বাগান করেছিল: টমেটো, পুদিনা, মরিচ। আর একসারি ভুট্টা গাছ, যেটা কখনওই বেড়ে ওঠেনি। আমি আর হাসান ওটাকে বলতাম, "রোগা ভুট্টার দেয়াল।"

বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে লোকোত গাছের ছায়ায় ছিল কাজের লোকদের বাসা। একটা মাঝারি মাপের মাটির ঘর। বাবার সঙ্গে ওখানে থাকত হাসান।

ওখানেই, ওই ছোট শ্যাকেই ১৯৬৪ সালের শীতে জন্ম হয়েছিল হাসানের। আমাকে জন্ম দিতে গিয়ে মা মারা যাবার ঠিক এক বছর পর।

ওই বাড়িতে আঠার বছর বসবাস করার সময় হাসান আর ওর বাবার ঘরে মাত্র কয়েকবার গিয়েছি আমি। সূর্য পাহাড়ের ওপাশে ডুব দেওয়ার পরে দিনের খেলা শেষ হলে হাসান আর আমি আলাদা হয়ে যেতাম। গোলাপের কেয়ারি পাশ কাটিয়ে বাবার ম্যানশনের পথ ধরতাম আমি: হাসান চলে যেত ওর মাটির ঘরে, যেখানে ওর জন্ম, যেখানে সারা জীবন কাটিয়ে দেবে ও। একজোড়া হারিকেনের

BanglaBook.org

আলোয় ম্লান আলোকিত ছোটখাট পরিচ্ছন্ন রুমটার কথা মনে আছে আমার। ঘরের দুপ্রান্তে দুটো জাজিম পাতা ছিল। ওগুলোর মাঝখানে একটা ক্ষয়ে যাওয়া কিনারাঅলা হেরাতি গালিচা। একটা তেপায়া টুল আর কোণে একটা কাঠের টেবিল। ওটায় বসে ড্রয়িং করত হাসান। ঘরের দেয়ালগুলো ছিল নাঙা, কেবল পুঁতি দিয়ে *আল্লাহু আকবার* লেখা একটা পর্দা ছিল ওখানে। মাসাদে বেড়াতে যাবার সময় আলির জন্যে কিনে এনেছিল বাবা।

ওই ছোট ছাপড়াতেই ১৯৬৪ সালে এক শীতের দিনে ওকে জন্ম দিয়েছিল ওর মা সানোবার। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে রক্ত ক্ষরণে মারা গিয়েছিল আমার মা, আর জন্মানোর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে মাকে হারিয়েছিল হাসান। এমন এক নিয়তির কাছে হারিয়েছিল তাকে বেশীরভাগ আফগানের কাছে যা মরণের চেয়েও খারাপ। একদল যাযাবর গায়ক আর নাচিয়েদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল সে।

মা সম্পর্কে কখনও কিছু বলেনি হাসান, যেন তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। মাকে ও কখনও স্বপ্ন দেখে কিনা ভেবেছি। সে দেখতে কেমন ছিল, এখন কোথায় আছে। মাকে দেখার কথা ও ভেবেছে কিনা সেটাও ভেবেছি। আমি যেমন আমার না-দেখা মায়ের জন্যে আকুলতা বোধ করি সেও কি একইভাবে মাকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিল? একদিন আমি আর ও বাবার বাড়ি থেকে একটা নতুন ইরানি সিনেমা দেখব বলে যায়নাব সিনেমা হলে যাচ্ছি। ইশতিকবাল মিডল স্কুলের কাছে মিলিটারি ব্যারাকের ভেতর দিয়ে শর্টকাট পথ বেছে নিয়েছিলাম আমরা। বাবা ওই শর্টকাট পথে যেতে নিষেধ করেছিল আমাদের। কিন্তু তখন রাহিম খানের সঙ্গে পাকিস্তানে ছিল ও। ব্যারাক ঘিরে রাখা বেড়া ডিঙালাম আমরা, একটা ছোট নালা লাফিয়ে পার হলাম। তারপর একটা খোলা আবর্জনা ভর্তি মাঠে এসে পড়লাম। এখানে পুরোনো পরিত্যক্ত ট্যাঙ্কে ময়লা জমা হয়। এই ট্যাঙ্কগুলোরই একটার আড়ালে একদল সৈনিক সিগারেট খেতে খেতে তাস খেলছিল। ওদের একজন আমাদের দেখে ফেলল। পাশের জনকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে ইশারা করল আমাদের দিকে। তারপর ডাকল হাসানকে।

"এই তুমি!" বলল সে। "তোমাকে আমি চিনি।"

লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি আমরা। লোকটার মাথা মোড়ানো, মুখে কালো এক গোছা দাড়ি। গাট্টাগোট্টা শরীর তার। লোকটার হাসি, টিকারি মারার ভঙ্গি দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। "হাঁটতে থাক," বিড়বিড় করে হাসানকে বললাম।

"তুমি! হাযারা! কথা বলার সময় আমার দিকে তাকাবে!" গর্জে উঠল সৈনিকটা। হাতের সিগারেট পাশের লোকটার হাতে তুলে দিয়ে এক হাতের

BanglaBook.org

তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি করল সে, তারপর অন্য হাতের মধ্যমা সেই বৃত্তের ভেতর বার বার ঢোকাতে আর বের করতে লাগল। ঢোকাচ্ছে আর বের করছে। "তোমার মাকে আমি চিনি। সেটা জানো? খুব ভালো করে চিনি তাকে। ওখানকার পেছনের ওই নালাটার কাছে থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি।"

সৈন্যরা হেসে উঠল। তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠল একজন। হাসানকে বললাম এগিয়ে যেতে। যেন না থামে।

"তার জায়গাটা খুবই টাইট!" বলছিল সৈন্যটা। অন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাঁত বের করে হাসছিল সে। পরে অন্ধকারে ছবি শুরু হলে পাশে বসে হাসানের কান্নার আওয়াজ পেয়েছি আমি। ওর গাল বেয়ে ঝরে পড়ছিল অশ্রুধারা। আমি সিটের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে কাছে নিয়ে এসেছিলাম। আমার কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছিল ও। "তোমাকে অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে সে," ফিসফিস করে বলেছিলাম। "তোমাকে আর কেউ ভেবেছে।"

আমাকে বলা হয়েছে যে সোনাবার পালিয়ে যাওয়ায় কেউই তেমন একটা অবাক হয়নি। আলির মতো কোরানে হাফেয একজন লোক তার চেয়ে উনিশ বছরের ছোট সুন্দরী অথচ দারুণ রকম বাজে মেয়ে সোনাবারকে বিয়ে করছে দেখে ভুরু কুঁচকেছে লোকে। মেয়েটা বদনামের সঙ্গে মানানসই জীবন কাটাত। আলির মতো সেও ছিল শিয়া মুসলিম, জাতিতে হাযারা। আলির চাচাত বোনও ছিল সে। তো সে কারণে স্ত্রী হিসাবে প্রথম পছন্দ। কিন্তু এ মিলটুকু বাদ দিলে আলি আর সোনাবারের মধ্যে আর কোনও মিলই ছিল না। সবচেয়ে কম মিল ছিল ওদের চেহারায়। সোনাবারের উজ্জ্বল সবুজ চোখ আর শয়তানি চেহারা যেখানে অসংখ্য পুরুষকে পাপের পথে টেনে নিয়ে গেছে বলে গুজব ছিল, সেখানে আলির মুখের নিচের দিকের পেশী জন্মগত পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল, ফলে হাসতে পারত না সে, চেহারা হয়ে গিয়েছিল চিরস্থায়ীভাবেই গম্ভীর। আলির পাথুরে চেহারায় হাসির ছাপ দেখা–কিংবা দুঃখ পাওয়া–ছিল এক বিরল ঘটনা। কারণ কেবল ওর বাঁকা চোখজোড়াই হাসিতে ঝিকিয়ে উঠত বা বেদনার অশ্রুতে ভরে উঠত । লোকে বলে চোখ হচ্ছে মনের আয়না। কথাটা আলির বেলায় পুরোপুরি সত্যি ছিল। কেবল চোখ দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করতে পারত ও।

শুনেছি সোনাবারের ইঙ্গিতপূর্ণ পদক্ষেপ আর ঢেউ তোলা নিতম্ব লোকজনকে শয়তানির দিকে ঠেলে দিত। কিন্তু পোলিওর কারণে আলির বাঁকা ক্ষয়ে যাওয়া ডান পা স্রেফ হাড়ের উপর এক পল্লা চামড়ার একটা আস্তরণ ছিল মাত্র। মাঝখানে কাগজের মতো পাতলা পেশীর একটা স্তর ছিল। আমার বয়স যখন আট বছর,

BanglaBook.org

মনে আছে, একদিন আলি আমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছিল *নান* কেনার জন্যে। ওর পেছনে গুনগুন করতে করতে হাঁটছিলাম। নকল করার চেষ্টা করছিলাম তাকে। দেখলাম হাড় সর্বস্ব পা-টা বৃত্তাকারে ঘোরাচ্ছে সে, প্রতিবার পাটা মাটিতে নামিয়ে অনার সময় গোটা শরীর ভয়ঙ্করভাবে কাত হয়ে যাচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপেই যে পড়ে যাচ্ছে না সেটাই ছিল এক অলৌকিক ব্যাপার। চেষ্টা করতে গিয়ে আবর্জনার স্তূপে প্রায় আছড়ে পড়ার দশা হল আমার। হেসে উঠেছিলাম আমি। পেছন ফিরে তাকাল আলি। তাকে যে নকল করার চেষ্টা করছি টের পেয়ে গেল সেটা। কিছু বলল না সে। তখনও বলেনি, পরেও কখনও বলেনি। সোজা হেঁটে গেছে। আলির চেহারা আর ওর হাঁটার ভঙ্গি পাড়ার অনেক ছোটছোট ছেলেমেয়েদেরই আতঙ্কিত করে তুলত। কিন্তু আসল ঝামেলা ছিল বড়বড় ছেলেরা। ওকে রাস্তায় ধাওয়া করত ওরা, হেঁটে যাওয়ার সময় ভেঙচাত। কেউ কেউ ওকে *বাবালু* বা বুগিম্যান ডাকতে শুরু করেছিল। "অ্যাই, *বাবালু*, আজ কাকে খেয়েছ?" হাসির হল্লার ভেতর গর্জে উঠত সে। "থ্যাবড়া নাক *বাবালু*, আজ কাকে খেয়েছ?"

আলি আর হাসানের হাযারা মঙ্গোলয়েড বৈশিষ্ট্যের জন্যেই ওকে থ্যাবড়া নাকঅলা বলে ডাকত ওরা। অনেক বছর হাযারাদের সম্পর্কে কেবল এটুকুই জানা ছিল আমার: ওরা মঙ্গোল বংশোদ্ভূত, দেখতে অনেকটা চাইনিজদের মতো। স্কুলের বইপত্রে ওদের কথা তেমন একটা উল্লেখ ছিল না, ওদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে আভাস ছিল মাত্র। তারপর একদিন, বাবার স্টাডিতে ওর জিনিস পত্র ঘাঁটছিলাম। মায়ের একটা পুরোনো ইতিহাসের বই পেয়ে গেলাম। খোমেনি নামের এক ইরানির লেখা। ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চুরি করে রাতের বেলা বিছানায় উঠে এলাম ওটা নিয়ে। হাযারাদের উপর লেখা একটা গোটা চ্যাপ্টার আছে দেখে অবাক হলাম। হাসানের গোষ্ঠীর নামে একটা আস্ত চ্যাপ্টার বরাদ্দ করা হয়েছে! সেখানে পড়লাম, আমার জাতি পশতুনরা হাযারাদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে, শোষণ করেছে। এতে বলা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে হাযারা জাতি পশতুনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রয়াস পেয়েছিল, কিন্তু পশতুনরা তাদের "বর্ণনার অতীত সহিংসতার মাধ্যমে দমন" করেছে। বইতে বলা হয়েছে যে আমার জাতি হাযারাদের হত্যা করেছে, ওদের আপন ভূমি থেকে উৎখাত করেছে, বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, ওদের নারীদের বাজারে বিক্রি করেছে। বইতে বলা হয়েছে পশতুনদের হাযারাদের উপর এরকম নির্যাতন চালানোর কারণ পশতুনরা সুন্নী আর হাযারারা শি'য়া। আমার অজানা অনেক কিছুই বলা হয়েছে বইটায়, আমার শিক্ষকরা যা উল্লেখ করেনি; যেসব কথা বাবাও কখনও বলেনি। তবে আমার

জানা কিছু কথাও লেখা ছিল বইটায়। যেমন, লোকে হাযারাদের ইঁদুর-খোকো, থ্যাবড়া-নাক, মালবাহী গাধা বলে ডাকে। পাড়ার কিছু ছেলেকে হাসানের উদ্দেশে এনাম ধরে চিৎকার করতে শুনেছি।

পরের সপ্তাহে ক্লাশ শেষে বইটা টিচারকে দেখিয়ে হাযারাদের উপর লেখা চ্যাপ্টারটার দিকে ইঙ্গিত করলাম। কয়েকটা পাতা উল্টে দেখল সে, নাক সিঁটকাল। তারপর বইটা ফের আমার হাতে ফিরিয়ে দিল। "এই একটা কাজ ভালোই পারে শি'য়ারা," বলল সে, নিজের কাগজপত্র তুলে নিল। "নিজেদের শহীদ হিসাবে জাহির করা।" শি'য়া কথাটা উচ্চারণ করার সময় নাক কুঁচকাল সে, যেন এটা মারাত্মক কোনও রোগের নাম।

কিন্তু জাতিগত ঐতিহ্য আর পারিবারিক রক্ত বইলেও সোনাবার আলিকে খেপানোর বেলায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তাল মিলিয়েছিল। শুনেছি ওর চেহারার প্রতি নিজের বিতৃষ্ণা আড়াল করার কোনও চেষ্টাই করেনি সে।

"এটা একটা স্বামী হল?" নাক সিঁটকাত সে। "স্বামী হিসাবে এর চেয়ে অনেক উপযুক্ত বুড়ো গাধা দেখেছি আমি।"

শেষ পর্যন্ত অনেকেই ধরে নিয়েছে বিয়েটা ছিল আলি এবং ওর চাচা সোনাবারের বাবার ভেতর এক ধরনের সমঝোতা। লোকে বলে আলি চাচাত বোনকে বিয়ে করেছিল তার বদনাম খানিকটা ঘোচানোর জন্যে। যদিও একবারেই ছোটাবেলায় এতিম হয়ে যাওয়া আলির কোনও জাগতিক সম্পদ বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কোনও কিছু ছিল না।

আলি কখনওই ওকে উত্যক্তকারীদের বিরুদ্ধে কোনও রকম বদলা নিতে যায়নি। আমার ধারণা তার আংশিক কারণ সে কখনও বাঁকা পা নিয়ে দৌড়ে ওদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারত না। তবে মূলত আলি ওর উপর হুনাদারদের চাপিয়ে দেওয়া অপমান তেমন একটা গায়ে মাখত না। সোনাবারে হাসানের জন্ম দেওয়ার মুহূর্তেই আনন্দ, উপশম খুঁজে পেয়েছিল সে। এটা ছিল খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার। কোনও ধাত্রী না, কোনও অ্যানেস্থেজিয়োলজিস্ট না, না কোনও আধুনিক মনিটরিং সরঞ্জাম। স্রেফ একটা দাগপড়া নাঙা ম্যাট্রেসে শুয়ে ছিল সোনাবার। আলি আর ধাই সাহায্য করেছে তাকে। খুব বেশী সাহায্যের আসলে প্রয়োজন ছিল না তার, কারণ জন্ম নেওয়ার সময়েও হাসান মায়ের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। কাউকে আঘাত দেওয়ার ক্ষমতা ওর ছিল না। কয়েকটা গোঙানি, একটু ধাক্কাধাক্কি, ব্যস, তারপরেই বের হয়ে এল হাসান। হাসতে হাসতেই বের হয়ে এসেছিল ও।

মুখপাতলা দাই পাড়ার এক কাজের লোকের কাছে পরে প্রকাশ করেছিল,

BanglaBook.org

সে আবার যখন-তখন যাকে-তাকে কথাটা বলে ফিরেছে: আলির ছেলে বাচ্চাটাকে এক নজর দেখেছে সোনাবার, কাটা ঠোঁট চোখে পড়ামাত্র তিক্ত কণ্ঠে হেসে উঠেছিল সে।

"এই যে," বলেছিল সে। "এবার তোমার হয়ে হাসার জন্যে নিজের একটা ছেলে পেয়ে গেলে!" হাসানকে এমনকি কোলে নিতে পর্যন্ত অস্বীকার গেছে সে। ঠিক পাঁচ দিন পর বিদায় হয়ে যায় সে।

আমাকে যে খাওয়াত হাসানের দেখভাল করার জন্যে সেই একই নার্স মহিলাকে ভাড়া করেছিল বাবা। আলি আমাদের বলেছে সে ছিল বিশাল সেই বুদ্ধ মূর্তির শহর বামিয়ানের এক নীল নয়না নারী। "খুবই চমৎকার গানের গলা ছিল তার!" আমাদের বলত সে।

কী গান গাইত সে, আমি আর হাসান সব সময় জানতে চাইতাম–যদিও আগেই জানা ছিল আমাদের। অসংখ্যবার সেকথা আমাদের বলেছে আলি। আমরা স্রেফ আলির গান শুনতে চাইতাম।

তখন গলা পরিষ্কার করে গাইতে শুরু করত সে:

উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে
খোদার শার্দুল আলির নাম ধরে ডাকি।
হে আলি, খোদার শার্দুল, মানুষের রাজা,
আমাদের দুঃখভরা মনে সুখ এনে দাও।

তারপর আমাদের ও মনে করিয়ে দিত যারা একই মায়ের দুধ খেয়েছে তাদের ভেতর এক ধরনের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকে। এই সম্পর্ক সময়ের স্রোতে নষ্ট হবার নয়। আমি আর হাসান একই মায়ের বুকের দুধ খেয়েছি। আমরা একই মাঠে, একই লনে প্রথম হাঁটতে শিখেছি। একই ছাদের নিচে প্রথম কথা বলেছি।

আমার প্রথম কথাটা ছিল: *বাবা*।

ওর ছিল: *আমির*। আমার নাম।

পেছনে তাকিয়ে এখন আমার মনে হয় ১৯৭৫ সালের শীতকালে যা ঘটেছিল–এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের ভিত্তি এই কথাগুলোর ভেতরই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

BanglaBook.org

তিন

গল্প চালু রয়েছে যে বাবা নাকি একবার বেলুচিস্তানে খালি হাতে একটা ভালুকের সঙ্গে লড়াই করেছিল। গল্পটা আর কারও সম্পর্কে হলে *লা'ফ* মানে, বাড়িয়ে বলার আফগান প্রবণতা–দুঃখজনকভাবে একটা জাতীয় রোগ বলা যায় একে–হিসাবে বাতিল করে দেওয়া হত। কেউ যদি গর্ব করে বলে যে তার ছেলে ডাক্তার, তার মানে হবে সম্ভবত ছেলেটা হয়ত কোনও একদিন হাই স্কুলের বায়োলজি পরীক্ষায় পাস করেছিল। কিন্তু বাবা সম্পর্ক কোনও গল্পের সত্যতা নিয়ে কেউ কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেনি। কেউ করলেও, বাবার পিঠের উপর তিনটা সমান্তরাল ক্ষত চিহ্ন ছিল। কল্পনার চোখে হাজার বার বাবার ধস্তাধস্তির ছবি দেখেছি। এমনকি স্বপ্নও দেখেছি। ওইসব স্বপ্নে বাবাকে কখনও ভালুকের সঙ্গে তফাত করতে পারিনি।

রহিম খানই শেষ পর্যন্ত বাবার বিখ্যাত খেতাব হয়ে ওঠা শব্দটা প্রথম উল্লেখ করেছিল: *তুপখান আগা* বা "মিস্টার হারিকেন"।

একেবারে জুৎসই একটা খেতাব। বাবা ছিল প্রকৃতির একটা শক্তি। ঘন দাড়ি, খোদ মানুষটার মতোই দুর্দমনীয় মাথাভর্তি ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো বাদামী চুলের আস্তরণঅলা এক বিশাল পশতুন পুরুষ। হাতজোড়া দেখে মনে হবে আস্ত একটা উইলো গাছ টেনে তুলে আনতে পারে। আর চোখের কৃষ্ণ ঝলক দেখলে "খোদ শয়তানও হাঁটু গেড়ে বসে মাফ চাইতে শুরু করবে," যেমনটা বলত রহিম খান। পার্টির সময় যখন ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কাঠামো নিয়ে হাজির হত সে, যেন সূর্যের দিকে তাকাচ্ছে, এমনিভাবে সবার মনোযোগ ফিরে যেত ওর দিকে।

BanglaBook.org

এমনকি ঘুমের সময়েও বাবাকে অগ্রাহ্য করা ছিল অসম্ভব। কানে তুলো গুঁজে রাখতাম আমি। মাথায় কম্বল চাপা দিতাম। কিন্তু তারপরেও বাবার নাক ডাকার আওয়াজ–গর্জন তোলা ট্রাকের মতো–দেয়াল ভেদ করে তেড়ে আসত। আমার রুমটা ছিল বাবার রুমের উল্টোদিকে। মা কীভাবে একই ঘরে ওর সঙ্গে ঘুমাত সেটা আমার কাছে একটা রহস্য বটে। মার সঙ্গে আদৌ দেখা হলে ওর কাছে জানতে চাইবার লম্বা ফিরিস্তিতে এই প্রশ্নটাও ছিল।

১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে, আমার বয়স তখন পাঁচ বা ছয় হবে, একটা এতীমখানা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাবা। রহিম খানের কাছে গল্পটা শুনেছি। সে বলেছে, কোনও রকম আর্কিটেকচারাল অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বাবাই ব্লুপ্রিন্ট এঁকেছিল। সংশয়বাদীরা বাবাকে বোকামি ছেড়ে একজন আর্কিটেক্ট নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে, কিন্তু অবশ্যই সেটা উড়িয়ে দিয়েছে বাবা। ওর গোঁয়ার্তুমি দেখে সাবাই হতাশায় মাথা নেড়েছে। তারপর বাবা যখন সফল হল, সবাই আবার বিস্ময়ে তার সফলতার জন্যে মাথা নেড়েছিল। কাবুল নদীর দক্ষিণের জাদেহ মেওয়ান্দ থেকে একটু দূরে দোতলা এতীমখানা নির্মাণের টাকা নিজেই যুগিয়েছে বাবা। রহিম খান বলেছে, বাবা ব্যক্তিগতভাবে গোটা প্রজেক্টের অর্থ সংস্থান করেছে। এঞ্জিনিয়ার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, প্লাম্বার আর মিস্ত্রিদের মজুরি মিটিয়েছে; শহরের বড় কর্তাদের কথা–যাদের "গোঁফে তেল দিতে হয়"–না হয় বাদই থাকল।

এতীমখানা শেষ হতে তিন বছর সময় লেগেছিল। ততদিনে আমার বয়স আট বছর হয়ে গেছে। এতীমখানা উদ্বোধনের আগের দিনের কথা আমার মনে আছে। আমাকে কাবুলের কয়েক মাইল উত্তরে গারঘা লেকে নিয়ে গিয়েছিল বাবা। হাসানকেও সঙ্গে নিতে বলেছিল। কিন্তু বাবাকে মিথ্যে করে বলেছিলাম, ওর সর্দি লেগেছে। বাবাকে একান্তে পেতে চেয়েছিলাম আমি। তাছাড়া, গারঘা লেকে একবার আমি আর হাসান পাথর ছুড়ে মেরেছিলাম। হাসানের পাথরটা আট বার পিছলে গিয়েছিল। আমি পেরেছিলাম মাত্র পাঁচবার। বাবা ছিল ওখানে, দেখছিল। হাসানের পিঠে চাপড় দিয়েছে ও। এমনকি ওর কাঁধও জড়িয়ে ধরেছিল।

শুধু বাবা আর আমি লেকের ধারে একটা পিকনিক টেবিলে বসেছিলাম। সেদ্ধ ডিম আর *কোফতা* স্যান্ডউইচ–*নান* রুটির ভেতর *ঠেসে* দেওয়া মাংসের বড়া আর আচার–খাচ্ছিলাম। পানি ছিল গাঢ় নীল। আয়নার মতো তলে ঠিকরে যাচ্ছিল রোদের আলো। শুক্রবারদিনগুলোয় দিনের বেলাটা রোদের আলোয় কাটানোর জন্যে বের হয়ে আসা অসংখ্য পরিবারের

BanglaBook.org

ভিড়ে গিজগিজ করে লেকের আশপাশ। কিন্তু সেটা ছিল সপ্তাহের মাঝামাঝি একটা সময়, আমি আর বাবা ছিলাম শুধু। আর ছিল জনা দুই লম্বাচুলো দাড়িঅলা টুরিস্ট–'হিপ্পি', লোকে ওদের এনামেই ডাকে বলে শুনেছি। পানিতে পা ডুবিয়ে ছিপ হাতে বসেছিল ওরা। বাবার কাছে ওদের চুল বড় রাখার কারণ জানতে চাইলাম। বাবা মৃদু আওয়াজ করে উঠলেও কোনও জবাব দিল না। পরের দিনেব বক্তৃতার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ও। একগোছা টাইপ করা কাগজে নজর বুলিয়ে যাচ্ছিল। এখানে সেখানে পেন্সিলের সাহায্যে নোট রাখছিল। ডিমে হানা দিয়ে বাবার কাছে জানতে চাইলাম স্কুলে ছেলেদের মুখে শোনা কথাটা ঠিক কিনা: ডিমের খোসা খেয়ে ফেললে সেটা নাকি পেশাবের সঙ্গে বের করে দিতে হয়। আবার হুম করে শব্দ করল বাবা।

স্যান্ডউইচে একটা কামড় দিলাম। হলদে চুল টুরিস্টদের একজন আরেকজনের পিঠে চাপড়ে জোরে হেসে উঠল। দূরে লেকের ওপারে একটা ট্রাক পাহাড়ের একটা কোণ বেয়ে কোনওমতে উঠে যাচ্ছিল। ওটার সাইড-মিররে ঝলকে যাচ্ছিল সূর্যের অলো।

"আমার ~~মনে হয়~~ *সারাতান হয়েছে,"* বললাম। ক্যান্সার। বাতাসে উড়তে থাকা পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলে তাকাল বাবা। আমাকে বলল নিজেই সোডা নিয়ে আসতে পারি আমি, গাড়ির ট্রাঙ্কের ভেতরে খুঁজলেই হবে।

পরের দিন এতীমখানার বাইরে চেয়ারের ঘাটতি দেখা গেল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। খুব হাওয়া বইছিল সেদিন। মূল দালানের ঠিক বাইরে বানানো ছোট পোডিয়ামে বাবার পেছনে বসে ছিলাম আমি। বাবার গায়ে ছিল সবুজ কোট আর কারাকুল হ্যাট। বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ প্রবল হাওয়া টুপি উড়িয়ে নিয়ে গেল ওর। হেসে উঠল সবাই। ইশারায় আমাকে টুপিটা ধরে রাখতে বলল ও। কাজটা করতে পেরে খুশিই হয়েছিলাম । কারণ তখন সবাই বুঝতে পারছিল উনি আমার পিতা, *আমার* বাবা। বাবা আবার মাইক্রোফোনের দিকে ফিরে বলল তার আশা দালানটা টুপির চেয়ে মজবুত হবে। তখন আবার হেসে উঠল সবাই। বাবা বক্তৃতা শেষ করার পর লোকজন উঠে দাঁড়িয়ে উল্লাস প্রকাশ করল। অনেক ক্ষণ ধরে তালি বাজিয়েছিল তারা। পরে লোকজন ওর সঙ্গে করমর্দন করেছিল। ওদের কেউ কেউ আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। বাবার জন্যে, নিজেদের জন্যে সেদিন গর্ব বোধ করেছি আমি।

কিন্তু বাবার সাফল্য সত্ত্বেও লোকে ওকে নিয়ে সন্দিহান ছিল। তারা বলত ব্যবসা ওর রক্তে নেই। বাবার মতো আইন বিষয়েই পড়াশোনা করা

BanglaBook.org

উচিত তার। তো কেবল ব্যবসা করে নয় বরং কাবুলের অন্যতম ধনী লোক হয়ে ওদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছিল বাবা। বাবা আর রহিম খান মিলে বিপুল সাফল্যের সঙ্গে একটা কার্পেট রপ্তানীকারী কারখানা, দুটো ফার্মাসি আর একটা রেস্তরাঁ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

লোকে যখন বলাবলি করছিল যে বাবা কখনও ভালো ঘরে বিয়ে করতে পারবে না-শত হোক, রাজরক্ত নেই ওর শরীরে-তখন খুবই উচ্চশিক্ষিত, সর্বজনস্বীকৃত কাবুলের সবচেয়ে সম্মানিত সুন্দরী এবং গুণবতী মহিলা সুফিয়া আক্রামি-আমার মাকে-বিয়ে করেছিল ও। মা কেবল ইউনিভার্সিটিতে ফারসি সাহিত্যই পাড়াত না, এক রাজ পরিবারের উত্তরসুরি ছিল ও। বাবা খুব কায়দা করে মাকে "আমার রাজকুমারি" ডেকে তার সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিত।

একমাত্র জোরাল ব্যতিক্রম আমাকে বাদ দিয়ে চারপাশে জগতকে নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছিল বাবা। তবে সমস্যা ছিল বাবা নিজেই: জগতকে স্রেফ শাদা আর কালো হিসাবে দেখত ও। কোনটা শাদা আর কোনটা কালো সেটাও নিজেই স্থির করত ও। এমন একজন লোককে ভয় না পেয়ে তার সঙ্গে বসবাস করতে পারবে না তুমি, হয়ত তাকে খানিকটা ঘৃণাও করতে পারো।

আমি ফিফথ গ্রেডে পড়ার সময় এক মোল্লাহ আমাদের ইসলাম শিক্ষা দিত। তার নাম ছিল মোল্লাহ ফাতিউল্লাহ খান। ছোটাখাট সুঠামদেহী লোক, সারামুখে ব্রনের দাগ। কর্কশ কণ্ঠস্বর। আমাদের সে *যাকাতের* সুফল আর *হজের* দায়িত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিত। দৈনিক প্রার্থনা *নামাযের* জটিলতাও শেখাত। কোরানের বিভিন্ন পঙক্তি মুখস্থ করাত। আমাদের কখনওই কথাগুলো তর্জমা করে না শোনালেও অনেকসময় একটা নাঙা উইলো ডালের বেত হাতে নিয়ে এটা বোঝাতে জোর দিয়েছে যে আল্লাহ যাতে ঠিকমতো শুনতে পান সেজন্যে আমাদের আরবী শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে হবে। একদিন সে আমাদের বলল ইসলাম মদপানকে জঘন্য গুনাহ মনে করে। যারা মদ খায় *কেয়ামতের* দিন-শেষবিচার-গুনাহর জন্যে জাবাবদিহি করতে হবে তাদের। সেইসব দিনে মদ্যপান কাবুলের মামুলি ব্যাপার ছিল। এজন্যে কেউ তোমাকে প্রকাশ্যে মারধর করত না। তবে যেসব আফগান মদ খেত সেটা শ্রদ্ধাবশত গোপনে সারত তারা। নির্দিষ্ট "ফার্মাসি" থেকে লোকে বাদামী কাগজের ব্যাগে করে "ওষুধ" হিসাবে স্কচ কিনত। ব্যাগটা চোখের আড়ালে রাখত তারা, অনেক সময় যারা এই জাতীয় দোকানের চরিত্র জানত তাদের চকিত ভর্ৎসনাপূর্ণ নজর কাড়ত তারা।

বাবার স্টাডি রুম মানে স্মোক রুমে ছিলাম আমরা। মোল্লাহ ফাতিউল্লাহ

BanglaBook.org

ক্লাসে আমাদের কী শিখিয়েছে বললাম ওকে। রুমের কোণে বানানো বারে নিজের জন্যে হুইস্কি ঢালছিল বাবা। শোনার পর মাথা দুলিয়ে মদে চুমুক দিল ও। তারপর একটা চামড়ার সোফায় বসে মদের গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। কোলে তুলে নিল আমাকে। আমার মনে হল বুঝি একজোড়া গাছের গুঁড়ির উপর বসে আছি। লম্বা করে দম নিয়ে নাক দিয়ে সেটা ছাড়ল ও। গোঁফের ফাঁক দিয়ে যেন অনন্তকাল ধরে হাওয়া বের হয়ে আসতে লাগল। বাবাকে জড়িয়ে ধরব নাকি জান বাঁচাতে লাফ দিয়ে নেমে পালাব ঠিক করতে পারছিলাম না আমি।

"বুঝতে পারছি স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের আমিল দেখে দ্বিধায় পড়ে গেছ তুমি," ভারি গলায় বলল সে।

"কিন্তু তার কথা সত্যি হলে তুমি কি গুনাহ্‌গার হয়ে যাবে, বাবা?"

"হুম," দাঁতের নিচে একটা বরফের টুকরা চুরমার করল বাবা। "তোমার বাবা গুনাহ্ সম্পর্কে কী ভাবে জানতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে বলছি," বলল বাবা, "কিন্তু তার আগে একটা জিনিস ভালো করে বুঝে নাও, আমির: ওই দাড়িঅলা নির্বোধগুলোর কাছ থেকে কখনওই সত্যিকারের কিছু শিখতে পারবে না।"

"মোল্লাহ ফতিউল্লাহ্ খানের কথা বলছ?"

গ্লাস নেড়ে ইঙ্গিত করল বাবা। টুংটাং শব্দ করে উঠল বরফগুলো। "ওদের সবার কথা বলছি। হতচ্ছাড়া সাধুমনা বানরগুলোর দাড়িতে আমি পেচ্ছাপ করি।"

হাসতে শুরু কররাম আমি। বানর, সাধুমনা বা যাই হোক, তাদের দাড়িতে বাবার পেশাব করার দৃশ্যটা খুবই বাড়াবাড়ি মনে হল।

"এরা তজবীহর দানা গোনা আর তাদের অজানা ভাষায় লেখা একটা বই থেকে পড়া ছাড়া আর কিছুই জানে না। বইটার মানেও বোঝে না।" একটা চুমুক দিল ও। "আফগানিস্তান যদি কখনও এদের হাতে গিয়ে পড়ে তো আল্লাহ যেন আমাদের রক্ষা করেন।"

"কিন্তু মোল্লাহ ফাতিউল্লাহ খানকে তো আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে," বোকার মতো হাসতে হাসতে কোনওমতে বললাম।

"জেঙ্গিস খানও তাই," বলল বাবা। "অনেক হয়েছে। গুনাহর কথা জানতে চেয়েছ তুমি। তোমাকে সেটা বলতে চাই। শুনতে চাও?"

"হ্যাঁ," বললাম আমি, ঠোঁটজোড়া শক্ত করে চেপে রাখলাম। কিন্তু হাসির একটা দমক নাক দিয়ে বেরিয়ে এসে নাক ডাকার মতো একটা শব্দ

BanglaBook.org

তুলল। ফলে আবার হাসতে শুরু করলাম আমি।

বাবার পাথরের মতো চোখজোড়া আমার চোখের দিকে তাকাল, ব্যস, আর হাসি রইল না আমার মুখে। "আমি তোমার সঙ্গে সমবয়সী হিসাবে কথা বলতে চাই। একবারের জন্যে হলেও সামাল দিতে পারবে মনে করো?"

"হ্যাঁ, বাবা জান," বিড়বিড় করে বললাম, ভাবছিলাম, যদিও প্রথমবারের মতো নয়, মাত্র কয়েকটা কথায় বাবা কীভাবে আমাকে আঘাত দিতে পারল। একটা চকিত ভালো সময় ছিল সেটা আমাদের–আমার সঙ্গে তেমন এটা কথাই বলত না বাবা, কোলে বসানো তো আরও পরের কথা–সেটা নষ্ট করার মতো বোকামি করেছি আমি।

"ভালো," বলল বাবা, কিন্তু ওর চোখজোড়ায় ভাবনার ছাপ। "শোন, মোল্লাহরা যাই শেখাক না কেন, গুনাহ মাত্র একটা। একটাই। সেটা হচ্ছে চুরি। বাকি সব গুনাহই এই চুরিরই একটা ধরন। বুঝতে পারছ?"

"না, বাবা জান," বললাম আমি, মরিয়া হয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম। ফের বাবাকে নিরাশ করতে চাইনি।

অধৈর্যের সঙ্গে দম নিল বাবা। এতেও আঘাত লাগল। কারণ বাবা অধৈর্য মানুষ ছিল না। রাত অন্ধকার হওয়ার আগে তার বাড়ি ফিরে আসার সবগুলো সময়ের কথা ভাবলাম। একা ডিনার করতাম আমি। আলির কাছে বাবা কোথায় গেছে, কখন ঘরে ফিরবে, জানতে চাইতাম অবশ্য। যদিও খুব ভালো জানতাম কনস্ট্রাকশন সাইটে আছে ও। এটা দেখভাল করছে, ওটার খবরদারি করছে। এর জন্যে কি ধৈর্যের প্রয়োজন নেই? এরই মধ্যে যাদের জন্যে এতীমখানা বানানো হচ্ছিল তাদের সবাইকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিলাম। অনেকসময় ভাবতাম ওরা বাবামায়ের সঙ্গে মরে গেলেই ভালো ছিল।

"যখন কাউকে খুন করলে, একটা প্রাণ চুরি করলে তুমি," বলল বাবা। "তুমি তার স্ত্রীর স্বামীর অধিকার চুরি করলে, ছেলেমেয়েদের বাবার অধিকার চুরি করলে। যখন মিথ্যে বললে তখন কারও সত্যি জানার অধিকার চুরি করলে তুমি। যখন ঠকালে, আরেকজনের ন্যায়ের অধিকার চুরি করলে। বুঝতে পারছ?"

বুঝেছিলাম। বাবার বয়স যখন ছয় বছর, একটা চোর মাঝরাতে হাজির হয়েছিল আমার দাদার বাড়িতে। আমার দাদা ছিল একজন সম্মানিত বিচারক, তাকে আটকায় সে। কিন্তু চোরটা তার গলায় ছুরির ঘাই দিয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় দাদা। বাবার বাবাকে চুরি করে নিয়ে যায় চোরটা। পরদিন দুপুরের ঠিক আগে শহরের লেকেরা খুনীকে পাকড়াও করে

BanglaBook.org

ফেলে। দেখা গেল কান্দুয এলাকা থেকে আসা এক ভবঘুরে সে। আসরের *নামাযের* ওয়াক্তের দুঘণ্টা আগেই একটা ওক গাছের ডালে তাকে ঝুলিয়ে দেয় ওরা। বাবা নয়, রহিম খান গল্পটা বলেছিল আমাকে। বরাবরই বাবার সম্পর্কে অন্যলোকের কাছ থেকে নানা কথা জানতে পারছিলাম আমি।

"চুরির মতো এত খারাপ কাজ আর নেই, আমির," বলল বাবা। "যা তার নয়, সেটা জীবনই হোক বা এক টুকরো *নান* রুটিই হোক, সেটা যে লোক নেয়...আমি তেমন লোকের গায়ে থুতু ফেলি। যদি কখনও আমার সামনে পড়ে যায় সে, খোদা ছাড়া আর কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। বুঝতে পেরেছ?"

বাবা চোর পেটাচ্ছে, এই দৃশ্যটা আমার কাছে যুগপৎ উত্তেজনাকর আর ভীতিকর মনে হল। "হ্যাঁ, বাবা।"

"ওই আকাশের বুকে খোদা বলে কেউ যদি থেকে থাকেন, তাহলে আমি আশা করব আমার মদ বা শুয়োরের মাংস খাওয়ার দিকে নজর রাখার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ আছে তাঁর। এবার নামো। গুনাহ নিয়ে এইসব কথাবার্তা আবার তৃষ্ণার্ত করে তুলেছে আমাকে।"

বারে গ্লাস ভরতে দেখলাম ওকে। মনে মনে ভাবলাম আবার কবে এভাবে কথা বলতে পারব আমরা। কারণ সত্যি কথা হচ্ছে, আমার সব সময় মনে হত বাবা আমাকে খানিকটা ঘৃণা করে। কেন করবে না? শত হোক, আমি ওর প্রিয় স্ত্রীকে, সুন্দরী রাজকুমারীকে খুন করেছি। তাই নয়কি? আমি অন্তত খানিকটা ওর মতো হয়ে ওঠার সৌজন্যটুকু দেখাতে পারতাম। কিন্তু ওর মতো হইনি আমি। একেবারেই না।

স্কুলে শেরজাঙ্গী—মানে "কবিতার লড়াই"—নামে একটা খেলা খেলতাম আমরা। ফারসি টিচার এটা পরিচালনা করত। খেলাটা ছিল অনেকটা এরকম: তুমি যেকোনও একটা কবিতা থেকে আবৃত্তি করবে, তোমার প্রতিপক্ষকে তখন তোমার কবিতার শেষ শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া একটা কবিতা দিয়ে জবাব দিতে হবে। ক্লাসের সবাই আমাকে তাদের দলে টানতে চাইত, কারণ খৈয়াম, হাফিয বা রুমির বিখ্যাত *মসনাবী* থেকে অসংখ্য কবিতা আবৃত্তি করতে পারতাম আমি। একবার পুরো ক্লাসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে গিয়েছিলাম। সেদিন বেশ গভীর রাতে কথাটা বাবাকে বলেছিলাম। স্রেফ মাথা দুলিয়েছে ও, বিড়বিড় করে বলেছে, "ভালো।"

এভাবে বাবার দূরত্ব থেকে নিজেকে বাঁচাতাম আমি: আমার মৃত মায়ের বইপত্রের মাঝে। আর হাসান তো ছিলই। সব পড়তাম আমি। রুমী, হাফিয,

সা'দী, ভিক্টর উগো, জুল ভার্ন, মার্ক টোয়াইন, ইয়ান ফ্লেমিং। মায়ের বইগুলো শেষ করার পর–ক্লান্তিকর ইতিহাসের বইগুলো বাদে–আমি কখনওই তেমন একটা পড়তাম না ওসব, তবে উপন্যাস আর মহাকাব্য পড়তাম–হাতখরচার টাকা বইয়ের পেছনে খরচ করতে শুরু করলাম। সিনেমা পার্কের কাছের একটা বইয়ের দোকান থেকে সপ্তাহে একটা বই কিনতাম। রুমের শেলফে জায়গা ফুরিয়ে যাওয়ার পরে কার্ডবোর্ড বাক্সে জমাতে লাগলাম সেগুলোকে।

অবশ্যই একজন কবিকে বিয়ে করা এক কথা, কিন্তু এমন একটা ছেলের বাবা হওয়া যে কিনা শিকারের চেয়ে বইয়ের পাতায় মুখ দাবিয়ে রাখতে পছন্দ করে...বেশ, আমার ধারণা, বাবা ঠিক এভাবে চিন্তা করেনি। সত্যিকারের পুরুষ কবিতা পড়ে না–খোদা না করুক, এসব যদি কখনওই না লিখত এরা! সত্যিকারে পুরুষ–আসল ছেলে–বাবা ছোট থাকতে যেভাবে সকার খেলেছে সেভবে সকার খেলে। এটা নিয়ে মাতামাতি করা যেতে পারে বটে। ১৯৭০ সালে এতীমখানা নির্মাণ কাজে বিরতি দিয়ে এক মাসের জন্যে তেহরানে চলে গিয়েছিল বাবা টেলিভিশনে ওয়ার্ল্ড কাপ গেমস দেখবে বলে। কারণ তখন আফগানিস্তানে টিভি ছিল না। নিজের ভেতর এই উন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে সকার টিমে যোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার অবস্থা ছিল করুণ, দলের জন্যে এক ভয়ঙ্কর দায়। সব সময় সম্ভাব্য কোনও পাসের সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতাম বা খোলা পথ আগলে রাখতাম। মাঠ জুড়ে রোগাটে পায়ে টলমল করে ঘুরে বেড়াতাম, আমার কাছে পাস করার জন্যে চিৎকার করতাম, কিন্তু সেটা কখনও পাইনি। মাথার উপর হাত তুলে তারস্বরে চিৎকার করেছি, 'আমি আছি! আমি আছি!" কিন্তু আমাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কিন্তু বাবা ক্ষান্ত দেওয়ার পাত্র ছিল না। এটা যখন প্রমাণ হয়ে গেল যে অ্যাথলিট হিসাবে তার যোগ্যতার এতটুকু প্রতিভাও নেই আমার, আমাকে তখন অন্ধ সমর্থক বানাতে উঠেপড়ে লাগল ও। এটা আমার পারা উচিত ছিল নিশ্চয়ই? যতদূর সম্ভব মেকি আগ্রহ দেখানোর চেষ্টা করে গেছি আমি। কাবুলের টিম যখন কান্দাহারকে হারিয়ে দিল, ওর সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছি আমি। আমাদের দলের বিরুদ্ধে পেনাল্টির নির্দেশ দিলে জোর গলায় গালি দিয়েছি রেফারিকে। কিন্তু আমার যে আসলে কোনও আগ্রহ নেই বাবা সেটা টের পেয়ে গিয়েছিল। ছেলে যে সকার খেলতে বা দেখতে পারবে না, এই সত্যিটা মেনে নিয়েছিল।

মনে আছে একবার আমাকে বসন্তের প্রথম দিনে, মানে নববর্ষে অনুষ্ঠিত *বাযকাশি* টুর্নামেন্ট নিয়ে গিয়েছিল বাবা। *বাযকাশি* ছিল, এখনও আছে, আফগানিস্তানের জাতীয় আবেগ। সাধারণভাবে ধনী এফিসিওনাদোদের

BanglaBook.org

পৃষ্ঠপোষকতায় খুবই দক্ষ এজন ঘোড়সওয়ার–*চাপান্দায*–কে একটা জটলা থেকে কোনও বাছুর বা ছাগলের বাচ্চার লাশ ছিনিয়ে নিয়ে ওটাকে সঙ্গে নিয়ে গোটা স্টেডিয়াম ঘুরে সবেগে ছুটে একটা বৃত্তে নিয়ে ফেলতে হয়। এই সময় *চাপান্দায*দের একটা দল তাকে ধাওয়া করে, তার কাছ থেকে লাশটা কেড়ে নেওয়ার জন্যে যা কিছু সম্ভব–ল্যাথি মারা, খাঁমচি দেওয়া, চাবুক দিয়ে আঘাত করা, ঘুসি মারা–সবই করে। ওই দিন মাঠের ঘোড়সওয়াররা রণহুঙ্কার ছেড়ে মাঠে ছোটার সময় উত্তেজনায় ভেঙে পড়ে জনতা। ধুলোর মেঘের ভেতর লাশটার জন্যে ধস্তাধস্তি করে। খুরের ঘায়ে কাঁপতে থাকে জমিন। উপরের সারি থেকে অশ্বারোহীদের পূর্ণ গতিতে চিৎকার ছেড়ে ছুটে যেতে দেখেছি আমরা। ঘোড়াগুলোর মুখ ফেনায় ভরে উঠেছিল।

এক সময় ইশারায় একলোককে দেখাল বাবা। "আমির, ওই যে ওখানে লোকজনে ঘেরাও হয়ে বসে থাকা লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ?"

দেখেছি আমি।

"হেনরি কিসিঞ্জার ওটা।"

"ওহ্," বললাম আমি। কিসিঞ্জার কে জানতাম না আমি। হয়ত জিজ্ঞেস করতাম। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করলাম *চাপান্দায*দের একজন স্যাডল থেকে উল্টে পড়ে গেছে। অসংখ্য খুরের নিচে পিষে গেল লোকটা। তার শরীরটাকে কাপড়ের পুকতুলের মতো মাঠ জুড়ে ছোড়াছোড়ি করা হল । শেষমেষ ভীড়টা সরে গেলে থামল ওটা। একবার নড়ে উঠে নিথর পড়ে রইল। বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে আছে তার পাজোড়া। বালিতে মিশে যাচ্ছে রক্তের একটা ধারা।

কাঁদতে শুরু করলাম আমি।

বাড়ি ফেলার সময় গোটা পথ কেঁদেছি। মনে আছে বাবার হাত কীভাবে স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে ধরেছিল। বারবার খুলছিল আর বন্ধ হচ্ছিল। নীরবে গাড়ি চালানোর সময় বাবা ওর বিরক্তি ভরা চেহারা লুকোনোর যে বীরত্বপূর্ণ প্রয়াস পেয়েছিল সেটা হয়ত কখনওই ভুলতে পারব না আমি।

সেদিন আরও রাতে বাবার স্টাডির পাশ দিয়ে যাবার সময় রহিম খানের সঙ্গে বাবাকে কথা বলতে শুনলাম। বন্ধ দরজার গায়ে কান পাতলাম।

"–সে স্বাস্থ্যবান এজন্যেই শোকর করা উচিত," বলছিল রহিম খান।

"জানি জানি। কিন্তু সে সব সময় হয় বইতে মুখ ডুবিয়ে রাখে নয়ত যেন কোনও স্বপ্ন হারিয়ে ফেলেছে এমনিভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়।"

"তো?"

BanglaBook.org

"আমি অমন ছিলাম না।" হতাশ শোনাল বাবার কণ্ঠ। প্রায় ক্ষিপ্ত।

হেসে উঠল রহিম খান। "বাচ্চারা তো রং করার খাতা নয়। ওদের তোমার প্রিয় রঙ দিয়ে ভরে তোলার উপায় নেই।"

"তোমাকে বলছি," বলল বাবা, "আমি মোটেই অমন ছিলাম না। আমি যাদের সঙ্গে বেড়ে উঠেছি তারাও কেউ এমন ছিল না।"

"কি জানো, অনেক সময় তুমি আমার দেখা সবচেয়ে আত্মকেন্দ্রিক লোক হয়ে দাঁড়াও।" বলল রহিম খান। সে ছিল আমার চেনা একমাত্র লোক যে বাবাকে এমন কথা বলেও পার পেয়ে যেত।

"এর সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"নেই?"

"নেই।"

"তাহলে কী?"

চামড়ার চেয়ারে বাবার নড়েচড়ে বসায় ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ কানে এল। চোখ বন্ধ করে আরও শক্ত করে দরজার উপর কান চেপে ধরলাম। শুনতে ইচ্ছে করছে আবার ইচ্ছে করছে না। "অনেক সময় এই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ওকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলতে দেখি। ওকে ওরা কীভাবে ঠেলে সরিয়ে দেয় চোখে পড়ে আমার। ওর কাছ থেকে খেলনা কেড়ে নেয়। ওকে এখানে একটা ধাক্কা মারে, তো ঠেলা মারে ওখানে। কি জানো, সে কখনও পাল্টা আঘাত করে না। কখনওই না। কেবল...মাথা নিচু করে..."

"মানে ও মারকুটে নয়," বলল রহিম খান।

"আমি একথা বুঝাইনি, রহিম। তুমি জান।" পাল্টা জবাব দিল বাবা। "ছেলেটার মাঝে একটা কিছুর অভাব আছে।"

"হ্যাঁ, খারাপ প্রবণতা।"

"আত্মরক্ষার সঙ্গে খারাপের কোনও সম্পর্ক নেই। পাড়ার ছেলেরা যখন ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে তখন কী হয় জানো? হাসান এসে ওদের তাড়িয়ে দেয়। নিজের চোখে দেখেছি। ওরা বাড়ি ফিরে এলে ওকে যদি জিজ্ঞেস করি, 'হাসানের মুখে আঁচড়ের দাগ পড়ল কীভাবে?' সে বলে, 'ও পড়ে গিয়েছিল।' তোমাকে বলে দিচ্ছি, রহিম, ছেলেটার মধ্যে একটা কিছুর অভাব আছে।"

"ওকে ওর নিজের পথ বেছে নিতে দিতে হবে তোমাকে," বলল রহিম খান।

"তা কোথায় যাচ্ছে ও শুনি?" বলল বাবা। "যে ছেলে নিজের মতো করে দাঁড়াতে পারে না সে বড় হয়ে কারও জন্যেই দাঁড়াতে পারবে না।"

BanglaBook.org

"যথারীতি তুমি বড্ড বেশী সরলীকরণ করে ফেলছ।"

"মনে হয় না।"

"ও কখনও তোমার ব্যবসার হাল ধরতে পারবে না ভেবে ভয় পাচ্ছ তুমি।"

"এবার কে অতিসরলীকরণ করছে?" বাবা বলল। "দেখ, আমি জানি তোমাদের ভেতর একটা ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। সেজন্যে আমি খুশি। ঈর্ষান্বিত, তবে খুশি। সত্যিই বলছি। ওর এমন একজন দরকার যে ওকে...বুঝতে পারবে। কারণ খোদা জানেন, আমি জানি না। কিন্তু আমিরের একটা কিছু আমাকে ভাবনায় ফেলে দেয়, আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। এটা অনেকটা..." বুঝতে পারছিলাম সঠিক শব্দ খুঁজে ফিরছে ও। গলা নামাল ও, কিন্তু ঠিকই শুনতে পেলাম আমি। "ডাক্তারকে নিজের চোখে ওকে বের করে আনতে না দেখলে ওকে আমার ছেলে বলে কখনওই বিশ্বাস করতাম না।"

পরদিন সকালে আমার নাশতা তৈরি করার সময় হাসান জানতে চাইল কোনও কিছু আমাকে ভাবনায় ফেলে দিয়েছে কিনা। ওকে ধমক দিয়ে নিজের চরকায় তেল দিতে বলে দিলাম।

খারাপ প্রবণতা সম্পর্কে ভুল বলেছিল রহিম খান।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

চার

১৯৩৩ সালে, যে বছর বাবার জন্ম হল এবং বাদশাহ্ জহির শাহ্ তাঁর চল্লিশ বছর মেয়াদী আফগানিস্তান শাসন শুরু করেছিলেন, কাবুলের এক সম্পদশালী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের তরুণ দুই ভাই ওদের বাবার ফোর্ড রোডস্টার্টারের হুইলের পেছনে উঠে বসে; হাশিশের প্রবল নেশায় মত্ত এবং ফরাসি মদের ঘোরে পাঘমানের পথে এক হাযারা দম্পতিকে হত্যা করে বসে ওরা। পুলিস খানিকটা অনুতপ্ত তরুণ এবং মৃত দম্পতির এতীম ছেলেকে দাদার সামনে হাজির করে। দাদা ছিল খুবই সম্মানিত জাজ। তার খ্যাতি ছিল অটল। দুই ভাইয়ের বিবৃতি আর তাদের বাবাদের ক্ষমার আবেদন শোনার পর দাদা দুই তরুণকে অবিলম্বে কান্দাহার গিয়ে এক বছরের জন্যে সেনোবহিনীতে যোগ দিতে নির্দেশ দিল। সেনাদলে নাম লেখানোর দায় থেকে ওদের পরিবার কীভাবে যেন নিস্কৃতি আদায় করা সত্ত্বেও এই হুকুম দেওয়া হয়। ওদের বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল বটে তবে সেটা তেমন জোরাল ছিল না। শেষমেষ সবাই একমত হয়েছিল যে, শাস্তি টা কঠিন হলেও ন্যায্য হয়েছে। এতীম ছেলেটাকে দাদা নিজের সংসারে দত্তক করে নিয়েছিল। অন্য চাকরদের তাকে শিক্ষা দিতে বলে দিয়েছিল। সেই ছেলেটাই আলি।

বাবা আর আলি ছেলেবেলার বন্ধু হিসাবে একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে। অন্তত পোলিওতে আলি খোড়া হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত। ঠিক যেমন আমি আর হাসান এক প্রজন্ম পরে বেড়ে উঠেছি। বাবা সব সময় আলির সঙ্গে মিলে যে দুরন্তপনা করছে তার গল্প করত, কিন্তু আলি মাথা নেড়ে বলত:

BanglaBook.org

"কিন্তু আগা সাহিব, ওদের বলো আসলে দুষ্ট বুদ্ধিটা কার ছিল? আর কে ছিল সাধারণ কামলা?" বাবা হেসে উঠে আলিকে জড়িয়ে ধরত।

কিন্তু এইসব গল্পের কোনওটাতেই বাবা কখনওই আলিকে বন্ধু বলে উল্লেখ করেনি।

কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হল, আমিও হাসানকে কখনও বন্ধু ভাবিনি। অন্তত স্বাভাবিক অর্থে তো নয়ই। যদিও আমরা একে অন্যকে হাতে না ধরে সাইকেল চালানো শিখিয়েছি, কার্ডবোর্ড বক্স দিয়ে পুরোপুরি কার্যকর ক্যামেরা তৈরি করেছি, ঘুড়ি উড়িয়ে, ঘুড়ির পেছনে দৌড়ে পার করে দিয়েছি গোটা শীতকাল; যদিও আমার কাছে আফগানিস্তানের ছবিটা হচ্ছে শীর্ণ হাড় জিরজিরে মাথা মোড়ানো, নিচু করে বসানো কানঅলা একটা ছেলের চেহারা; একটা ছেলে যার চেহারা চাইনিজ পুতুলের মতো, কাটা ঠোঁটের হাসি যার মুখে চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

এসব কথা ভাববার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিহাস ভুলে যাওয়া সহজ নয়। ভুলে যাওয়া সহজ নয় ধর্মও। শেষ পর্যন্ত আমি ছিলাম একজন পশতুন, আর ও হাযারা। আমি সুন্নী, আর সে শিয়া। কোনও কিছুই একে বদলে দিতে পারবে না। কোনও কিছুই না।

কিন্তু আমরা ছিলাম ছোট ছোট ছেলে, একসঙ্গে হামাগুড়ি দিতে শিখেছি। কোনও ইতিহাস, জাতিগত পরিচয়, সমাজ বা ধর্ম সেটা বদলে দিতে পারবে না। আমার জীবনের প্রথম বার বছরের বেশীর ভাগ হাসানের সাথে খেলে পার করেছি আমি। অনেক সময় আমার গোটা কিশোর বেলাটাকেই হাসানের সঙ্গে কাটানো এক দীর্ঘ গ্রীষ্মের অলস বিকেল বলে মনে হয়। বাবার উঠোনের গাছপালার জটলার মধ্যে এক অন্যকে ধাওয়া করে বেড়াচ্ছি। লুকোচুরি খেলছি, চোর-পুলিস খেলছি, কাউবয় আর ইন্ডিয়ান-ইন্ডিয়ান খেলছি। পোকামাকড়ের উপর অত্যাচার চালিয়েছি- নিঃসন্দেহে আমাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য ছিল যেদিন আমরা একটা মৌমাছির হুল উপড়ে নিয়ে ওটাকে একটা দড়িতে বেঁধে নিয়েছিলাম। বেচারা উড়ে যাবার চেষ্টা করলেই আবার টেনে ধরতাম আমরা।

কাবুলের উপর দিয়ে উত্তরের পাহাড়ে যাবার সময় যাযাবর *কোচিদের* ধাওয়া করতাম আমরা। আমাদের পাড়ার দিকে ওদের কাফেলার এগিয়ে আসার আওয়াজ পেতাম আমরা: ভেড়ার ডাক, উটের গলার ঘণ্টা ধ্বনি। আমাদের রাস্তার উপর দিয়ে ধীর গতিতে এগিয়ে চলা কাফেলা দেখার জন্যে বাইরে ছুটে যেতাম। রোদে-জলে পোড়া নোংরা চেহারার পুরুষ, লম্বা রঙিন

শাল, পুঁতি গায়ে আর কব্জি আর গোড়ালিতে ব্রেসলেট পরা মহিলা। ওদের খচ্চরের দিকে পানি ছিটাতাম। হাসানকে রোগা ভুট্টার দেয়ালের উপর বসে উটের পেছনে গুলতি দিয়ে নুড়ি পাথর ছুড়ে মারতে উস্কানি দিতাম।

আমরা একসঙ্গে আমাদের প্রথম ওয়েস্টার্ন ছবিটা দেখেছিলাম। সিনেমা পার্কে। জন ওয়েনের *রিয়ো ব্রাভো*। আমার প্রিয় বইয়ের দোকানের উল্টোদিকেই ছিল সিনেমা হলটা। মনে আছে জন ওয়েনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমাদের ইরানে নিয়ে যেতে অনেক অনুরোধ করেছিলাম বাবাকে। প্রবল হাসিতে ফেটে পড়েছিল বাবা–ট্রাক এঞ্জিনের গর্জে ওঠার সঙ্গে ওই আওয়াজের তেমন একটা পার্থক্য নেই–আবার যখন কথা বলতে পেরেছিল, কণ্ঠস্বর ডাবিং করার ধারণাটা বুঝিয়ে বলেছিল সে আমাদের। আমি আর হাসান বোকা, হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জন ওয়েন আসলে ফারসিতে কথা বলেনি। ইরানি নয় সে! আমেরিকান, ঠিক কাবুলে সব সময় চোখে পড়া বন্ধুসুলভ দীর্ঘপায়ের নারী-পুরুষদের মতো। ছেঁড়াফাটা উজ্জ্বল রঙের শার্ট পরে ঘুরে বেড়ায় ওরা। তিনবার *রিয়ো ব্রাভো* দেখেছি আমরা। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে প্রিয় ওয়েস্টার্ন *দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট সেভেন* দেখেছিলাম তের বার। প্রতিবার দেখার সময় শেষে মেক্সিক্যান ছেলেটা চার্লস ব্রনসনকে কবর দেওয়ার দৃশ্যে কেঁদে উঠেছি আমরা। পরে জানা গেছে এ লোকটাও ইরানি ছিল না।

আমরা কাবুলের শের-ই-নও এলাকার মরচে গন্ধঅলা বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছি, কিংবা ওয়াযির আকবার খান এলাকার নতুন শহরে চলে গেছি। সদ্য দেখা ছবি নিয়ে আলোচনা করতাম আমরা, বাজারিদের শোরগোলময় ভীড়ে ঘুরে ড়োতাম। ব্যবসায়ী আর ফকিরদের মাঝে পথ করে নিতাম আমরা। মালে ঠাসা ছোট ছোট দোকানে ভরা সংকীর্ণ গলিপথে হাঁটতাম। বাবা আমাদের সাপ্তাহিক হাত খরচার জন্যে দশ আফগানি দিত। আমরা তা গরম কোকা-কোলা আর গুঁড়ো পেশতা বাদামের আস্তর দেওয়া গোলাপ জলের আইসক্রিমের পেছনে খরচ করতাম।

স্কুলে পড়ার বছর গুলোয় দৈনন্দিন রুটিন ছিল আমাদের। আমি যখন নিজেকে অনেক কষ্টে বিছানা থেকে তুলে বাথরুমে নিয়ে যেতাম, হাসান তার অনেক আগেই উঠে পড়ত। আলির সঙ্গে ফজরের *নামাজ* পড়ে ফেলত ও। আমার নাশতা বানানো হয়ে যেত ওর: গরম ব্ল্যাক কফি, তার সঙ্গে শুগার কিউব আর একটুকরো *নানের* টোস্ট, আমার প্রিয় চেরি মার্মালেড মাখানো থাকত ওতে। সবকিছু ডাইনিং টেবিলের উপর সুন্দরভাবে গোছানো থাকত।

BanglaBook.org

আমি খেতে খেতে হোমওঅর্ক নিয়ে অনুযোগ করতাম, হাসান আমার বিছানা গুছিয়ে জুতো পলিশ করে ইউনিফর্ম ইস্ত্রি করত, বই আর পেন্সিল গুছিয়ে দিত। ইস্ত্রি করার সময় ফয়েতে আপন মনে গান গাইতে শুনতাম ওকে। নাকি সুরে প্রাচীন হাযারা গান গাইছে। তারপর বাবা আর আমি কালো ফোর্ড মাস্টাংয়ে চেপে রওয়ানা হয়ে পড়তাম-এই গাড়িটা সব জায়গায় ঈর্ষাতুর দৃষ্টি আকর্ষণ করত, কারণ এটা ছিল একটা থিয়েটারে টানা ছয়মাস চলা ছবি বুলিটে স্টিভ ম্যাককুইনের চালানো গাড়ি। হাসান বাড়িতে থেকে বাড়ির দৈনন্দিন কাজে আলিকে সাহায্য করত: ময়লা কাপড়চোপড় হাতে ধুয়ে উঠোনে শুকোতে দেওয়া, মেঝে ঝাড়ু দেওয়া, বাজার থেকে টাটকা *নান* কিনে আনা, ডিনারের জন্যে সিরকায় মাংস ভেজানো, লনে পানি দেওয়া।

স্কুল শেষে আমি আর হাসান একসঙ্গে একটা বই নিয়ে বাবার ওয়াযির আকবার খান-এর বাড়িটার ঠিক উত্তরে একটা গামলা আকৃতির টিলায় উঠে যেতাম। টিলার চূড়ায় একটা পরিত্যক্ত গোরস্থান ছিল, নামফলকহীন সারি সারি কবর সেখানে। আইলগুলো লতাপাতায় ছাওয়া। শীত আর বর্ষার মৌসুমগুলো লোহার গেইটে মরচে ধরিয়ে দিয়েছে। কবরস্থানের নিচু শাদা দেয়ালটার পড়োপড়ো অবস্থা। কবরস্থানে ঢোকার মুখে একটা ডালিম গাছ ছিল। গ্রীষ্মের এক দিন আমি হাসানের কিচেন নাইফ দিয়ে ওটার গায়ে আমাদের নাম খোদাই করে ফেললাম: "আমির আর হাসান, কাবুলের দুই সুলতান।" কথাগুলো এটা স্থির করে দিল: গাছটা আমাদের। স্কুল শেষে আমি আর হাসান ওটার ডালে উঠে রক্তলাল ডালিম পেড়ে খেতাম। ফল খাওয়া শেষে ঘাসে হাত মুছে হাসানকে বই পড়ে শোনাতাম আমি। পায়ের উপর পা তুলে বসে অন্যমনস্কভাবে ঘাস ছিঁড়ত ও, আর আমি, ও পড়তে পারত না এমন সব গল্প পড়ে শোনাতাম ওকে। ডালিম গাছের পাতার ফাঁক গলে চুইয়ে আসা রোদ লুকোচুরি খেলত ওর মুখের উপর। হাসান ওর বাবা আলি আর বেশীর ভাগ হাযারার মতোই অশিক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠবে এটা ওর জন্মের মুহূর্তে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, এমনকি সোনাবারের জঠরে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বেড়ে ওঠার সময়েও হতে পারে। হাজার হোক, লিখিত শব্দের কী প্রয়োজন আছে কাজের লোকের? কিন্তু নিরক্ষরতা সত্ত্বেও বা একারণেই হয়ত হাসান শব্দের রহস্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ওর জন্যে নিষিদ্ধ এক জগতের মোহে পড়েছিল। ওকে কবিতা আর গল্প পড়ে শোনাতাম আমি। অনেক সময় ধাঁধাও ধরতাম। তবে ধাঁধার সমাধানে ও আমার চেয়ে ঢের বেশী চালু দেখার পরে অবশ্য সেটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তো ওকে

banglabook.org

আমি চ্যালেঞ্জ বিহীন জিনিস পড়ে শোনাতাম। যেমন বিনয়ী মোল্লাহ নাসিরুদ্দিন আর তার গাধার রস কাহিনী। গাছের নিচে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পশ্চিমে সূর্য পাটে না বসা পর্যন্ত বসে থাকতাম আমরা। কিন্তু তারপরেও হাসান জোর করে বলতে চেষ্টা করত দিনের অলো ফুরিয়ে যায়নি, আরও একটা গল্প বা একটা অধ্যায় পড়ার মতো দিনের আলো এখনও আছে।

পড়ার সময় আমার সবচেয়ে প্রিয় অংশ ছিল এমন কোনও শব্দ খুঁজে পাওয়া যেটার মানে হাসানের অজানা। আমি ওকে টিটকারি দিতাম, ওর ভুল ধরিয়ে দিতাম। একবার, ওকে মোল্লাহ নাসিরুদ্দিনের গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলাম, আমাকে থামিয়ে দিল ও। "এই কথাটার মানে কী?"

"কোনটা?"

"নির্বোধ।"

"কথাটার মানে জান না তুমি?"

"না, আমির আগা।"

"কিন্তু এটাতো একেবারেই সাধারণ একটা শব্দ!"

"হলেও জানি না আমি।" আমার টিটকারি গায়ে লাগলেও ওর হাসিমাখা মুখ দেখে বোঝা যেত না সেটা।

"কিন্তু আমার স্কুলের সবাই কথাটার মানে জানে," বললাম। "তো দেখা যাক। 'নির্বোধ।' এর মানে হল চৌকষ, বুদ্ধিমান। এটা দিয়ে একটা বাক্য বানাচ্ছি তোমার জন্যে। 'শব্দের বেলায় হাসান একটা নির্বোধ।'"

"আচ্ছা," মাথা দুলিয়ে বলেছে ও।

পরে এ নিয়ে অপরাধবোধে ভুগেছি আমি। তো আমার কোনও পুরোনো শার্ট বা ভাঙা খেলনা ওকে দিয়ে সেটার ক্ষতি পুরণের চেষ্টা করতাম। নিজেকে বোঝাতাম নির্বিষ একটা ঠাট্টার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়েছে।

হাসানের সবচেয়ে প্রিয় বই ছিল প্রাচীন পারসিয়ান বীরদের নিয়ে লেখা দশম শতাব্দীর মহাকাব্য *শাহনামা*। প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারই পছন্দ করত ও। পুরোনো দিনে শাহরা, ফেরিদুন, যাল এবং রুদাবেহ। তবে ওর এবং আমারও সবচেয়ে প্রিয় গল্প ছিল "সোহারাব-রুস্তম", মহাবীর রুস্তম আর তার চ্যাপ্টা পাঅলা ঘোড়া রাকশ-এর কাহিনী। রুস্তম তার প্রতিপক্ষ সোহরাবকে লড়াইতে মারাত্মকভাবে আহত করে, কিন্তু পরে জানতে পারে সোহরাব আসলে তারই হারিয়ে যাওয়া ছেলে। শোকে মূহ্যমান রুস্তম তার ছেলের অন্তিম কথাগুলো শুনেছিল:

BanglaBook.org

তুমি সত্যিই আমার বাবা হলে তোমার তলোয়ার আপন ছেলের রক্তে রাঙিয়েছ। নিজের গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ করতেই করেছ সেটা। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসায় ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম, তোমার নামে আবেদন জানিয়েছিলাম। কারণ আমি তোমার মাঝে আমার মায়ের স্মৃতি, দেখতে চেয়েছি। কিন্তু তোমার কাছে বৃথাই আবেদন জানিয়েছি। এখন দেখা হওয়ার সেই সময় ফুরিয়ে গেছে...

"আবার পড়ো না, আমির আগা।" বলত হাসান। অনেক সময় আমি এই অনুচ্ছেদটা পড়ার সময় হাসানের চোখজোড়া জলে ভরে উঠত। আমি সব সময়ই ভেবেছি আসলে কার জন্যে কেঁদেছে ও। শোকে আকুল রুস্তমের জন্যে, যে নিজের গায়ের জামাকাপড় ছিঁড়ে ছাইয়ের গাদায় মাথা গুঁকিয়েছে; নাকি মৃত্যুপথযাত্রী সোহরাবের জন্যে, যে কিনা স্রেফ বাবার ভালোবাসার জন্যে ব্যকুল হয়ে ছিল? ব্যাক্তিগতভাবে আমি রুস্তমের নিয়তির ভেতর কোনও ট্র্যাজিডি দেখিনি। হাজার হোক, সব বাবাই কি তাদের অন্তরে ছেলেদের খুন করার একটা গোপন বাসনা লালন করে না?

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের একদিন। হাসানের সঙ্গে আরেকটা তামাশা করলাম আমি। ওকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম। হঠাৎ লেখা গল্প থেকে সরে এলাম আমি। ভান করলাম বই থেকেই পড়ছি, কিন্তু আসলে টেক্সট পুরোপুরি বাদ দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলে যাচ্ছিলাম। হাসান স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারেনি সেটা। ওর কছে বইয়ের পৃষ্ঠায় লেখা শব্দগুলো ছিল কিছু সাঙ্কেতিক হিজিবিজি, দুর্বোধ্য, রহস্যময়। শব্দ ছিল গোপন তোরণ। আমার হাতেই ছিল তার চাবিকাঠি। পরে ওকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম গল্পটা ওর ভালো লেগেছে কিনা। হাসান তালি বাজাতে শুরু করতেই আমার গলায় যেন সুড়সুড়ি লাগল।

"কী করছ?" বললাম আমি।

হাত তালি অব্যহত রেখেই সে বলল, "অনেক দিন পর একটা সেরা গল্প শোনালে তুমি আমাকে।"

হাসলাম আমি। "তাই নাকি?"

"সত্যি।"

"ফ্যাসিনেটিং।" বিড়বিড় কর বললাম, সত্যিই। এটা তো...একবারেই অপ্রত্যাশিত। "ঠিক বলছ তো, হাসান?"

BanglaBook.org

তখনও হাততালি দিচ্ছিল সে। "দারুণ হয়েছে, আমির আগা। আমাকে ওটা থেকে আরও একটু পড়ে শোনাবে?"

"অবাক কাণ্ড," খানিকটা রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় বিড়বিড় করে বললাম আমি। নিজের উঠোনে লুকোনো গুপ্তধনের খোঁজ পাওয়া কারও মতো বোধ হচ্ছিল আমার। টিলা বেয়ে নামার সময় আমার মাথার ভেতর *চামানের* দিকে ছুড়ে মারা আতশবাজির মতো চিন্তার তুফান চলছিল। *অনেক দিন পর একটা সেরা গল্প শোনালে তুমি আমাকে,* বলেছে ও। ওকে *অনেক গল্প* পড়ে শুনিয়েছি আমি। আমাকে কী যেন জিজ্ঞেস করছিল হাসান।

"কী?" বললাম।

"ওই 'ফ্যাসিনেটিং' কথাটার মানে কী?"

হেসে উঠলাম আমি। ওকে জড়িয়ে ধরে চকাশ করে একটা চুমু খেলাম গালে।

"এটা আবার কিজন্যে?" হতচকিত, লজ্জায় লাল হয়ে জানতে চাইল সে।

ওকে বন্ধুসুলভ একটা ঠেলা দিলাম। হাসলাম। "তুমি একটা রাজপুত্তুর, হাসান। তুমি একটা রাজকুমার, তোমাকে আমি ভালোবাসি।"

সেই রাতেই জীবনের প্রথম ছোট গল্পটা লিখলাম আমি। তিরিশ মিনিট লেগেছিল। এক লোককে নিয়ে বিষাদের গল্প। একটা জাদুর পেয়ালা পেয়েছিল সে। তারপর জানতে পারে পেয়ালার ভেতর চোখের পানি ফেললে সেটা মুক্তো হয়ে যায়। কিন্তু সারাজীবন গরীবী হালে থাকলেও সুখী ছিল সে, তেমন একটা কান্নাকাটি করত না। তো নিজেকে কাঁদানোর একটা উপায় বের করল সে যাতে অশ্রু ধনী করে দিতে পারে তাকে। মুক্তোর পরিমাণ বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার লোভও বাড়তে লাগল। গল্পটা শেষ হয়েছে এভাবে, লোকটা মুক্তোর পাহাড়ে বসে আছে, হাতে ছুরি, অসহায়ের মতো কেঁদে পানি ঝরাচ্ছে পেয়ালায়, প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃতদেহ পড়ে আছে তার কোলে।

সেরাতে সিঁড়ি বেয়ে বাবার স্মোকিং রুমে ঢুকে এলাম আমি। আমার হাতে দুই তা কাগজ, যার উপর গল্পটা লিখেছিলাম। বাবা আর রহিম খান পাইপ টানছিল। ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিচ্ছিল।

"কী ব্যাপার, আমির?" সোফায় হেলান দিয়ে বসে মাথার পেছনে দুহাত জড়ো করে জানতে চাইল বাবা। ওর মুখের চারপাশে নীল ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খাচ্ছিল। ওর তাকানোর ভঙ্গি দেখে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে

BanglaBook.org

গেল। গলা খাকারি দিয়ে বললাম, একটা গল্প লিখেছি আমি।

বাবা মৃদু মাথা ঝাঁকাল। মেকি আগ্রহের চেয়ে বেশী কিছু প্রকাশ করল তা। "বেশ, এটা তো খুবই ভালো কথা, তাই না?" বলল ও। এরপর আর কিছু না। ধোঁয়ার মেঘের ভেতর দিয়ে স্রেফ চেয়ে রইল আমার দিকে।

হয়ত মিনিটখানেকের একটু কম ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু আজও সেই সময়টুক কে আমার জীবনের দীর্ঘতম সময় বলে মনে হয়। একের পর এক সেকেন্ডগুলো পার হচ্ছিল। একটার সঙ্গে অন্যটির যেন অনন্তকালের তফাত। হাওয়া হয়ে উঠেছিল ভারি, স্যাঁতসেঁতে, প্রায় নিরেট। আমি যেন নিঃশ্বাসের সঙ্গে নুড়ি পাথর টেনে নিচ্ছিলাম। আমার দিকে চেয়েই রইল বাবা। পড়তে চাইল না।

বরাবরের মতো রহিম খানই উদ্ধার করল আমাকে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। প্রশ্রয়ের হাসি দিল। তাতে কোনও ভান ছিল না। "ওটা দেখতে পারি আমি, আমির জান? পড়তে খুবই ভালো লাগবে আমার।" আমার সঙ্গে কথা বলার সময় কদাচিত *জান* কথাটা ব্যবহার করে বাবা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল বাবা। মনে হল যেন স্বস্তি পেয়েছে, যেন রহিম খান তাকেও উদ্ধার করেছে। "হ্যাঁ, রহিম কাকাকে দাও ওটা। আমি উপরে রেডি হতে গেলাম।" এ কথা বলে রুম ছেড়ে চলে গেল সে। বেশীরভাগ দিনই প্রায় ধার্মিকের মতো বাবাকে প্রবলভাবে বন্দনা করেছি। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল যদি নিজের শরীরের শিরা-উপশিরা কেটে তার অভিশপ্ত রক্ত বের করে দিতে পারতাম।

এক ঘণ্টা বাদে সন্ধ্যার আকাশ যখন ম্লান হয়ে এল, বাবার গাড়িতে করে একটা পার্টিতে যোগ দিতে বের হয়ে গেল ওরা। বেরিয়ে যাবার পথে রহিম খান আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আমার লেখা গল্পটা আর একটা কাগজ তুলে দিল আমার হাতে। চকিত হাসির সঙ্গে চোখ টিপে বলল, "তোমার জন্যে। পরে পড়ো।"

তারপর একটু থেমে একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল সে, যেটা আমাকে লেখালেখির ব্যাপারে এত বেশী উৎসাহ যুগিয়েছে যা কোনও সম্পাদকও পারেনি। শব্দটা ছিল *সাবাস*।

ওরা চলে যাবার পর খাটে বসে আমি ভাবছিলাম রহিম খান আমার বাবা হলেই ভালো ছিল। তারপরই বাবা এবং তার বিশাল বুকের ছাতির কথা ভাবলাম। আমাকে ও বুকে চেপে ধরলে কত ভালো লাগে ভাবলাম। সকালে তার শরীর থেকে কেমন ব্রুটের সুবাস আসে। কীভাবে তার দাড়ি আমার

BanglaBook.org

গালে সুড়সুড়ি খেলে। আকস্মিক অপরাধবোধে এতটাই আপ্লুত হয়ে উঠেছিলাম যে সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমে গিয়ে সিঙ্কে বমি করে ফেললাম।

সেইদিন আরও গভীর রাতে বিছানায় গুটিসুটি হয়ে শুয়ে রহিম খানের চিঠিটা বারবার পড়লাম আমি। চিঠিটা ছিল এরকম:

আমির জান,

তোমার লেখা গল্পটা খুবই ভালো লেগেছে আমার। *মাশাল্লাহ,* খোদা তোমাকে বিশেষ একটা গুন দিয়েছেন। এই গুনটার পরিচর্যা করা এখন তোমার দায়িত্ব, কারণ যে লোক খোদার দেওয়া নেয়ামত নষ্ট করে সে একটা নির্বোধ। নির্ভুল ব্যাকরণ আর কৌতুহলোদ্দীপক স্টাইলে গল্পটা লিখেছ তুমি। তবে তোমার গল্পের সবচেয়ে মুগ্ধ হওয়ার মতো ব্যাপার হচ্ছে এতে পরিহাস আছে। তুমি হয়ত কথাটার মানে নাও জানতে পারো। তবে একদিন বুঝতে পারবে। এটা এমন একটা জিনিস যা অনেক লেখকই সারাজীবন খুঁজে বেড়ায়, কিন্তু কখনও তার দেখা পায় না। তুমি প্রথম গল্পেই সেটা পেয়ে গেছ।

তোমার জন্যে আমার দরজা সব সময়ই খোলা, আমির জান। তোমার বলার মতো যে কোনও গল্পই শুনতে রাজি আছি আমি। সাবাস।

তোমার বন্ধু
রহিম

রহিম খানের চিরকুটে উৎফুল্ল হয়ে গল্পটা হাতে নিয়ে নিচে ফয়েতে নেমে এলাম। এখানে একটা তক্তপোষের উপর ঘুমাচ্ছিল আলি আর হাসান। যখন বাবা বাইরে থাকত আর আমার দিকে খেয়াল রাখতে হত আলিকে, কেবল তখনই ঘরের ভেতর থাকত ওরা। হাসানকে ধাক্কা মেরে তুলে ও গল্প শুনতে চায় কিনা জানতে চাইলাম।

নিদ্রালু চোখজোড়া ডলতে ডলতে আড়মোড়া ভাঙল ও। "এখন? এখন ক'টা বাজে?"

"ও নিয়ে ভেব না। এটা আলাদা গল্প। আমি নিজে লিখেছি," ফিসফিস করে বললাম আমি, আলি যেন জেগে না ওঠে। হাসানের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"তবে তো শুনতেই হয়," বলল ও। গায়ের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে

BanglaBook.org

ফেলেছে আগেই।

মার্বল ফায়ারপ্লেসের পাশে লিভিং রুমে বসে ওকে গল্পটা পড়ে শোনালাম। এবার আর খেলাচ্ছলে গল্প থেকে সরে গেলাম না। এটা আমার নিজের লেখা! অনেক দিক থেকে হাসান ছিল আদর্শ শ্রোতা। কাহিনীতে একেবারে ডুবে যায়। গল্পের ধারা বদলের সঙ্গে সঙ্গে ওর চেহারাও বদলে যায়। আমি যখন শেষ বাক্যটা পড়লাম, চাপা হাত তালি দিয়ে উঠল সে।

"*মাশাল্লাহ*, আমির আগা। সাবাস!" উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ওর চেহারা।

"তোমার ভালো লেগেছে?" দ্বিতীয়বারের মতো ইতিবাচক মন্তব্যের স্বাদ পেয়ে বলে উঠলাম আমি। কী যে মধুর ছিল সেটা।

"একদিন, *ইনশাআল্লাহ*, বড় লেখক হবে তুমি," বলল হাসান। "সারা দুনিয়ার লোক তোমার লেখা পড়বে।"

"বাড়িয়ে বলছ," কথাটা বলার জন্যে ওকে ভালোবেসেই বললাম আমি।

"না। তুমি বিরাট আর বিখ্যাত হবে।" আবার বলল ও। তারপর একটু থামল, যেন একটা কিছু বলতে যাচ্ছে। নিজের কথাগুলো ওজন করে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। "কিন্তু গল্পটা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন করার অনুমতি দেবে?"

"অবশ্যই।"

"মানে..." শুরু করেও আবার থেমে গেল ও।

"বলো তুমি, হাসান," বললাম। হাসলাম। যদিও আমার ভেতরের অরক্ষিত লেখকটি কথাটা শুনতে চাইছিল কিনা সেটা আর নিশ্চিত ছিল না।

"মানে," বলল সে, "লোকটা কেন তার স্ত্রীকে মেরে ফেলল জিজ্ঞেস করতে পারি? আসলে, কান্নার জন্যে তাকে কেনই বা দুঃখ পেতে হবে? একটা পেঁয়াজ শুঁকলেই কি হত না?" হতবাক হয়ে গেলাম আমি।

এই বিশেষ কথাটা, এত পরিষ্কার পুরোপুরি নির্বুদ্ধিতা, আমার মাথায়ই আসেনি। হঠাৎ ঠোঁট নাড়লাম আমি। মনে হচ্ছিল যে-রাতে লেখার উদ্দেশ্য–পরিহাস–সম্পর্কে শিখেছিলাম, আবার, সেই একই রাতে একটা ক্রটির কথাও জেনেছি: প্লট হোল। এত লোক থাকতে হাসনের কাছে শিখেছি। যে পড়তে জানে না, সারা জীবন একটা অক্ষরও লিখেনি। একটা শীতল গম্ভীর কণ্ঠস্বর হঠাৎ আমার ভেতর থেকে কথা বলে উঠল, ওই *অশিক্ষিত হাযারা জানে কী? বাবুর্চি ছাড়া জীবনে আর কিছুই হতে পারবে না সে। সে তোমার সমালোচনা করার সাহস পায় কী করে?*

"বেশ," শুরু করেছিলাম আমি, কিন্তু বাক্যটা শেষ করতে পারিনি।

কারণ সহসা চিরদিনের বদলে গিয়েছিল আফগানিস্তান।

BanglaBook.org

পাঁচ

বজ্রপাতের মতো গর্জে উঠল কি যেন। জমিন কেঁপে উঠল খানিকটা। গুলির *র‍্যাট-আ-ট্যাট-ট্যাট* আওয়াজ পেলাম আমরা। "বাবা!" কেঁদে উঠল হাসান। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই লিভিং রুম থেকে ছিটকে বের হয়ে এলাম আমরা। আলিকে দেখলাম পাগলের মতো ফয়ে বরাবর দিয়ে ল্যাঙচাতে ল্যাঙচাতে এগিয়ে আসছে।

"বাবা! ওটা কিসের আওয়াজ?" আলির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কেঁদে উঠল হাসান। আমাদের জড়িয়ে ধরল আলি। একটা শাদা আলো ঝলসে উঠল, রূপালি আলোয় ভরে তুলল আকাশটাকে। আবার ঝলসে উঠল আলোটা। এরপরই আবার শোনা গেল দ্রুত গুলির আওয়াজ।

"হাঁস শিকার করছে ওরা," কর্কশ কণ্ঠে বলল আলি। "জান তো, রাতের বেলায় ওরা হাঁস শিকার করে। ভয় পেয়ো না।"

দূরে সাইরেন বেজে উঠল। কোথাও কাঁচ ভেঙে পড়ল ঝনঝন করে, চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। রাস্তায় লোকজনের উপস্থিতির আওয়াজ পেলাম। আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে, সম্ভবত এখনও পরনে ঘুমোনোর পোশাক; মাথার চুল অবিন্যস্ত, চোখ ফোলা ফোলা। হাসান কাঁদছিল। আদর করে ওকে বুকে টেনে নিল আলি। পরে নিজেকে বলব, আমি হাসানকে ঈর্ষা করিনি। মোটেই না।

একেবারে ভোর হওয়া পর্যন্ত এভাবে জটলা পাকিয়ে বসে রইলাম আমরা। গোলাগুলি আর বিস্ফোরণ এক ঘণ্টারও কম সময় স্থায়ী হলেও যারপরনাই আতঙ্কিত করে তুলেছিল আমাদের, কারণ আমরা কেউই এর আগে কখনও রাস্তায় গোলাগুলির আওয়াজ শুনিনি। আমাদের কাছে অচেনা শব্দ ছিল তা।

BanglaBook.org

যাদের কান বোমা আর গোলাগুলির আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই চিনবে সেই প্রজন্মটি তখনও জন্ম নেয়নি। ডাইনিং রুমে এক সঙ্গে বসে সূর্য ওঠার অপেক্ষায় থাকার সময় আমাদের কারওই ধারণা ছিল না যে একটা জীবনধারার অবসান ঘটেছে। সমাপ্তিটা, মানে *আনুষ্ঠানিক* সমাপ্তি আসে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে এবং পরে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বরে, যখন রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলো আমি আর হাসান যেখানে খেলতাম সেই একই রাস্তায় গড়িয়ে নেমে এসেছিল। আমার চেনা আফগানিস্তানের মরণ নিয়ে এসেছিল ওগুলো। শুরু করেছিল এখনও অব্যাহত রয়ে যাওয়া এক রক্তপাতের ধারা।

সূর্যোদয়ের ঠিক আগে অগে ড্রাইভওয়েতে এসে ঢুকল বাবার গাড়িটা। দড়াম করে দরজা বন্ধ হল। পায়ের শব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। তারপর দোরগোড়ায় উপস্থিত হল ও। একটা কিছু দেখলাম তার চেহারায়। এমন কিছু যা তখন চট করে বুঝে উঠতে পারিনি, কারণ এমন আর কখনও দেখিনি আমি। "আমির! হাসান!" আমাদের দিকে দৌড়ে আসার সময় চিৎকার করে উঠল বাবা। হাত মেলে দিল। "ওরা সমস্ত রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছে। টেলিফোন কাজ করছে না। খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি!"

আমাদের বুকে টেনে নিতে দিলাম ওকে। এক উন্মাদ মুহূর্তের জন্যে সেরাতে যাই ঘটে থাকুক সেজন্যে খুশি লাগল আমার।

মোটেই রাতের বেলায় হাঁস শিকার করছিল না ওরা। পরে জানা গেছে, আসলে কিছুই শিকার করছিল না ওরা। সেটা ছিল ১৯৭৩ সালের ১৭ই জুলাই এর রাত। পরদিন সকালে কাবুল জেগে উঠে জানতে পারে যে রাজতন্ত্র অতীতের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বাদশাহ জহির শাহ চলে গেছেন ইতালিতে। তাঁর অনুপস্থিতিতে চাচাত ভাই দাউদ খান বাদশাহর চল্লিশ বছর মেয়াদী রজত্বের অবসান ঘটিয়েছেন এক রক্তপাতহীণ অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে।

মনে আছে আমি আর হাসান পরদিন সকালে বাবার স্টাডির বাইরে ঘাপটি মেরে বসেছিলাম। বাবা আর রহিম খান চায়ে চুমুক দিতে দিতে রেডিও কাবুলের ব্রেকিং নিউজ শুনছিল।

"আমির আগা?" ফিসফিস করে বলল হাসান।

"কী?"

"'প্রজাতন্ত্র' কী?"

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। "জানি না।" বাবার রেডিওতে সারাক্ষণ "প্রজাতন্ত্র" কথাটা বলে যাচ্ছিল।

BanglaBook.org

"আমির আগা?"

"কী?"

"প্রজাতন্ত্র মানে কি আমাকে আর বাবাকে চলে যেতে হবে?"

"আমার তা মনে হয় না," পাল্টা ফিসফিস করে বললাম।

একটু ভাবল হাসান। "আমির আগা?"

"কী?"

"ওরা আমাকে আর বাবাকে তাড়িয়ে দিক আমি তা চাই না।"

হাসলাম আমি। "*ব্যস*, গাধা কোথাকার! কেউ তোমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে না।"

"আমির আগা?"

"কী?"

"গাছে উঠবে?"

কঠিন হয়ে এল আমার হাসি। এটা আবার হাসানের অন্য একটা দিক। কখন ঠিক কথাটা বলতে হবে সব সময় জানা ছিল ওর। রেডিওর খবর একেবারে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল। রেডি হওয়ার জন্যে শ্যাকে চলে গেল হাসান। আমি একটা বই নেওয়ার জন্যে দৌড়ে উপরে উঠে এলাম। তারপর কিচেনে গেলাম। মুঠিভর্তি করে কাঠ-বাদাম তুলে নিয়ে পকেটে ঠাসলাম। ছুটে বাইরে এসে দেখলাম হাসান অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। আমরা সদর দরজা গলে ঝড়ের গতিতে বের হয়ে টিলার দিকে পা বাড়ালাম।

আবাসিক রাস্তা পার হয়ে একটা বিরান জমিনের উপর দিয়ে এগাচ্ছিলাম আমরা। টিলার দিকেই গেছে পথটা। হঠাৎ একটা পাথর এসে লাগল হাসানের কাঁধে। পাঁই করে ঘুরলাম আমরা, ধক করে উঠল আমার বুকের ভেতরটা। আসেফ আর তার দুজন বন্ধু ওয়ালি আর কামাল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

আসেফ বাবার এক বন্ধু এয়ারলাইন পাইলট মাহমুদের ছেলে। আমাদের বাড়ির কয়েকটা রাস্তা দক্ষিণে থাকে ওরা। উঁচু দেয়াল আর তাল গাছ ঘেরা একটা আলীশান বাড়ি। কাবুলের ওয়াযির আকবার এলাকার ছেলে হয়ে থাকলে অসেফ আর তার বিখ্যাত ব্রাস নাকলস চিনতেই হবে তোমাকে, তবে আশা করি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে নয়। জার্মান মা আর আফগান বাবার ঘরে জন্ম নেওয়া এই সোনালি চুল আর নীল চোখের ছেলেটা অন্য বাচ্চাদের ছাড়িয়ে যায়। নিষ্ঠুরতার জন্যে তার বদনাম তার আগে আগে ছোটে। অনুগত বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এমনভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় সে যেন কোনও খান তাকে খুশি করতে অধীর সভাষদদের নিয়ে পথ চলছেন। তার কথাই ছিল আইন। আইনের সবকের

BanglaBook.org

প্রয়োজন পড়লে তার ব্রাস নাকলগুলো হয়ে দাঁড়াত উপযুক্ত [illegible]
একবার ওকে কার্তে-চার এলাকার একটা ছেলের উপর ওই [illegible]
দেখেছি। আসেফের নীল চোখজোড়া উন্মাদের মতো যেভাবে [illegible]
কোনওদিন সেটা ভুলব না। হাসছিল সে। ছেলেটাকে মেরে [illegible]
সময় কীভাবে *হাসছিল* সে। ওয়াযির আকবার এলাকার কিছু [illegible]
রেখেছে আসেফ *গোশখোর* মানে "কানখেকো" আসেফ। তবে [illegible]
উচ্চারণ করার সাহস হয়নি ওদের কারওই। যদি না তারা সেই [illegible]
ভাগ্য বরণ করতে চায় যে কিনা একটা ঘুড়ি নিয়ে লড়াই করতে [illegible]
অনিচ্ছায় জন্ম দিয়েছিল এ নামের এবং শেষ হয়েছিল নর্দমা থেকে [illegible]
নেওয়ার ভেতর দিয়ে। অনেক বছর পরে আসেফের মতো [illegible]
ইংরেজি শব্দ শিখেছি আমি যার কোনও পারসি প্রতিশব্দ নেই: "[illegible]"

মহল্লার যেসব ছেলে আলিকে উত্যক্ত করত তাদের [illegible]
নাছোড়বান্দা। আসলে সেই ছিল *বাবালু* টিটকারির হোতা। [illegible]
কাকে খেয়েছ তুমি? অ্যাঁ? এই যে বাবালু, একটু হাসো দেখি! [illegible]
বেশী উৎসাহ বোধ করত সেদিন ঠাট্টাটাকে আরেকটু [illegible]
"অ্যাই, থ্যাবড়া-নাক বাবালু, আজ কাকে খেয়েছো? বলো [illegible]
গাধা কোথাকার!"

এখন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে সে। হাতজোড়া [illegible]
স্নিকারজোড়া সামান্য ধুলো ওড়াচ্ছে।

"সুপ্রভাত, *কুনিরা!*" হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা [illegible]
আরেকটা প্রিয় অপমানকর কথা। তিনটা বয়স্ক ছেলে [illegible]
পেছনে গিয়ে লুকাল হাসান। আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল [illegible]
তিনটা লম্বা ছেলে। সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে আসেফ, বুকের [illegible]
হাত বেঁধে রেখেছে সে। ঠোঁটে বুনো হাসি। এবারই [illegible]
পুরোপুরি সুস্থ নয় বলে মনে হল । আবার একই [illegible]
বাবাকে পিতা হিসাবে পেয়ে আমি কত ভাগ্যবান। [illegible]
আমার ধারণা, আসেফ মূলত আমাকে বেশী জ্বালাতন [illegible]

হাসানের দিকে চিবুক বাঁকাল সে। "অ্যাই, [illegible]
কেমন আছে?"

কিছু বলল না হাসান। আরেক কদম পেছনে [illegible]

"ছেলেরা, আজকের খবর শুনেছ?" বলল [illegible]
হাসি। "বাদশাহ বিদায় নিয়েছে। খুবই ভালো হয়েছে [illegible]

খানকে চেনে বাবা। কথাটা কি তোমার জানা আছে, আমির?"

"আমার বাবাও চেনে," বললাম। আসলে, কথাটা সত্যি কিনা জানতাম না।

"আমার বাবাও চেনে," খিনখিনে গলায় আমাকে ভেঙচাল আসেফ। সমবেত কণ্ঠে হেসে উঠল কামাল আর ওয়ালি। মনে মনে ভাবলাম, বাবা এখন থাকলে হত।

"বেশ, গত বছর আমাদের বাড়িতে ডিনার করেছে দাউদ খান," বলে চলল আসেফ। "এটা কেমন শোনাচ্ছে তোমার কাছে, আমির?"

এই বিরান এলাকায় কেউ আমাদের চিৎকার শুনতে পাবে কিনা বোঝার প্রয়াস পেলাম। বাবার বাসা অন্তত এক কিলোমিটার দূরে। ভাবলাম বাড়িতে থাকলেই ভালো ছিল।

"দাউদ খান আবার আমাদের বাসায় দাওয়াত খেতে এল তাকে কী বলব জানো?" জিজ্ঞেস করল আসেফ। "ওর সঙ্গে আলাপ করব আমি। *মরদে মরদে* আলাপ। মাকে কী বলেছি–হিটলার সম্পর্কে–সেটা জানাব ওকে। এ হচ্ছে নেতা। সত্যিকারের নেতা। মহান নেতা। দূরদর্শী মানুষ। দাউদকে একটা কথা মনে রাখতে বলব, ওরা হিটলারেকে তার শুরু করা কাজটা শেষ করতে দিলে দুনিয়াটা আজ অনেক ভালো একটা জায়গা হতে পারত।"

"বাবা বলেছে হিটলার পাগল ছিল। অনেক নির্দোষ লোককে হত্যার নির্দেশ দিয়েছে সে," মুখের উপর হাত চাপা দেওয়ার আগেই নিজেকে বলতে শুনলাম আমি।

নাক সিঁটকাল আসেফ। "মায়ের কথার মতো শোনাচ্ছে। সে জার্মান ছিল। তার আরও ভালো জানার কথা। কিন্তু ওরা তো চায় এসবই বিশ্বাস করো তোমরা, তাই না? ওরা তোমাকে সত্যি জানতে দিতে চায় না।"

"ওরা" কারা, কিংবা কী সত্যি গোপন করছে, জানতাম না আমি। জানার ইচ্ছেও ছিল না। আমি ভাবছিলাম কিছু না বললেই ভালো ছিল। আমার আবার মনে হল চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি বাবা ঢাল বেয়ে উঠে আসছে কিনা।

"কিন্তু স্কুলে দেওয়া হয় না এমন বই পড়তে হবে তোমাকে," বলল আসেফ। "আমি পড়েছি। আমার চোখ খুলে গেছে। এখন আমার একটা ধারণা আছে। সেটা নতুন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমি। তোমরা জান সেটা কী?"

মাথা নাড়লাম আমি। এমনিতেও বলবে সে। আসেফ সব সময়ই নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দেয়।

হাসানের দিকে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার নীল চোখজোড়া। "আফগানিস্তান পশতুনদের দেশ। তাই ছিল সব সময়। আগামীতেও থাকবে। আমরাই আসল

BanglaBook.org

আফগান। খাঁটি আফগান। এই থ্যাবড়া-নাকঅলারা নয়। ওদের জাতটা আমাদের দেশ, আমাদের *ওয়াতান*কে নষ্ট করেছে। আমাদের রক্ত দূষিত করেছে ওরা।" হাত দিয়ে বিস্তৃত একটা ইঙ্গিত করল সে। "আমি বলি আফগানিস্তান পশতুনদের। এটাই আমার আদর্শ।"

আবার আমার দিকে নজর ফেরাল আসেফ। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল একটা সুখ স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা কেউ। "হিটলারের জন্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে," বলল সে, "কিন্তু আমাদের জন্যে নয়।"

জিন্সের পেছনের পকেট একটা কিছু বের করতে হাত বাড়াল সে। "বাদশাহর যা করার *কুয়াত* ছিল না, সেটাই প্রেসিডেন্টকে করতে বলব আমি। আফগানিস্তানকে নাপাক *কাসীফ* হাযারাদের কবল থেকে উদ্ধার করতে বলব।"

"আমদের যেতে দাও তো, আসেফ, " বললাম আমি, গলা কাঁপছে বলে ঘৃণা হচ্ছিল। "আমরা তোমাকে কোনওরকম বিরক্ত করিনি।"

"আরে, আসলেই বিরক্ত করছ," বলল আসেফ। শঙ্কিত হৃদয়ে ওকে পকেট থেকে জিনিসটা বের করে আনতে দেখলাম। অবশ্যই। সেই স্টেইনলেস ব্রাস নাকলস। রোদের অলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল সেটা। "অনেক জ্বালাচ্ছ তোমরা। আসলে, এই হাযারার চেয়ে অনেক বেশী জ্বালাও তুমি আমাকে। কী করে ওর সঙ্গে কথা বলো, খেল, তোমার গায়ে তাকে হাত দিতে দাও?" বলল সে। বিতৃষ্ণা ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে। সায় জানিয়ে মাথা দোলাল ওয়ালি আর কামাল, ঘোৎ করে উঠল। চোখ কোঁচকাল আসেফ। মাথা নাড়ল। আবার যখন কথা বলল, চেহারার মতোই বিস্মিত মনে হল তাকে। "কীভাবে ওকে 'বন্ধু' বলতে পারছ?"

কিন্তু ও তো আমার বন্ধু না! মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল প্রায়। *আমার চাকর!* সত্যিই কি কথাটা ভেবেছিলাম? অবশ্যই না। ভাবিনি। ওর সঙ্গে ভালো আচরণ করেছি আমি, ওকে বন্ধুর মতো–তারচেয়েও বেশী, অনেকটা ভাইয়ের মতো–দেখেছি। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে বাবার বন্ধুরা যখন তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে আসত কেন আমি হাসানকে আমাদের খেলায় নিইনি? কেন কেবল যখন কেউ থাকত না তখনই হাসানের সঙ্গে খেলেছি?

ব্রাস নাকলস হাতে গলাল আসেফ। শীতল চোখে তাকাল আমার দিকে। "তুমিও সমস্যার একটা অংশ, আমির। তুমি আর তোমার বাবার মতো ইডিয়টরা এদের ঘরে না তুললে এতদিনে ওদের দূর করে দিতে পারতাম আমরা। ওরা সবাই ওদের আসল দেশ হাযারাজাতে পচত। আফগানিস্তানের জন্যে তোমরা একটা বেইজ্জতির ব্যাপার।"

ওর উন্মাদ চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম মন থেকে কথাটা বলেছে সে।

আমাকে *সত্যিই* আঘাত দিতে চায়। হাত তুলে আমার দিকে এগিয়ে এল আসেফ।

আমার পেছনে তড়িৎ নড়াচড়ার শব্দ হল। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম নিচু হয়েই ফের উঠে দাঁড়িয়েছে হাসান। আসেফের দৃষ্টি আমার পেছনে একটা কিছুর দিকে ফিরল। বিস্ময়ে বিস্ফারিত গেল চোখদজোড়া। কামাল আর ওয়ালির চোখেও একই ররকম বিস্ময়ের ছাপ দেখতে পেলাম। ওরাও আমার পেছনে কী ঘটছে দেখার চেষ্টা করছিল।

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। হাসানের গুলতির মুখোমুখি হলাম। ইলাস্টিক ব্যান্ডটা একবারে পেছনে নিয়ে গেছে ও। কাপের ভেতর ওয়ালনাট আকারের একটা পাথর। সোজা আসেফের মুখের দিকে গুলতিটা তাক করে রেখেছে ও। ইলাস্টিক টেনে ধরা হাতটা কাঁপছে। ভুরুর উপর স্বেদবিন্দু জমে উঠেছে।

"প্লিজ, আমাদের একা থাকতে দাও, আগা," নিরস কণ্ঠে বলল হাসান। আসেফকে "আগা" বলে সম্বোধন করেছে ও। আমি মুহূর্তের জন্যে ভেবেছি, ক্ষমতা কাঠামোয় নিজের অবস্থানের ব্যাপারে প্রোথিত ধারণা নিয়ে জীবন কাটানোর মানে কী হতে পারে।

দাঁত বের করে হাসল আসেফ। "ওটা নামাও, মা-হারা হাযারা কোথাকার।"

"প্লিজ, আমাদের ছেড়ে দাও," বলল হাসান।

হাসল আসেফ। "তোমরা হয়ত খেয়াল করোনি, তোমাদের দুজনের বিরুদ্ধে আমরা কিন্তু তিনজন।"

কাঁধ ঝাঁকাল হাসান। অচেনা কারও কাছে ওকে আতঙ্কিত বলে মনে হবে না। কিন্তু হাসানের চেহারা ছিল আমার সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতি। আমি ওর প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি জানতাম। ওখানে খেলে যাওয়া প্রত্যেকটা কাঁপুনি আর ঝিলিক চেনা ছিল আমার। বুঝতে পারছিলাম শঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও। অনেক ভয় পেয়েছিল ও।

"তুমি ঠিকই বলেছ, আগা। কিন্তু তুমিও বোধ হয় খেয়াল করোনি যে একমাত্র আমিই গুলতিটা ধরে রেখেছি। তুমি একটু নড়াচড়া করলেই তোমার খেতাব 'কানখোকো' আসেফ থেকে 'কানা' আসেফ করে দিতে বাধ্য হব। কারণ পাথরটা তোমার বাম চোখে তাক করে রেখেছি আমি।" কথাটা সে এতটাই নিরাসক্তভাবে বলেছিল যে এমনকি আমাকে পর্যন্ত ওর শান্ত স্বরের আড়ালে ভয়ের অস্তিত্ব বুঝতে কান খাড়া করতে হয়েছিল।

আসেফের মুখটা কেঁপে উঠল। অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওয়ালি আর কামাল। কেউ একজন ওদের দেবতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। তাকে বেইজ্জত করেছে। সবচেয়ে খারাপ কথা হল, সেই কেউ একজনটা হল হাড় জিরজিরে হাযারা। পালা করে পাথর আর হাসানের দিকে তাকাতে লাগল আসেফ

BanglaBook.org

নিবিড়ভাবে হাসানের চেহারা পরখ করল সে। ওর চেহারায় সে যা আবিষ্কার করেছিল নিশ্চয়ই সেটা হাসানের ইচ্ছের অটলতা সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল ওকে। কারণ হাত নামিয়ে নিয়েছিল সে।

"আমার সম্পর্কে একটা কথা জানা থাকা উচিত তোমার, হাযারা," গম্ভীর কণ্ঠে বলল আষেফ। "আমি খুবই ধৈর্যশীল লোক। আজই এর শেষ হচ্ছে না। বিশ্বাস করো।" আমার দিকে ফিরল সে। "তোমার জন্যেও এটা শেষ নয়, আমির। একদিন তোমাকে আমার মোকাবিলা করতে বাধ্য করব আমি।" এক কদম পিছিয়ে গেল অসেফ। শিষ্যরা অনুসরণ করল তাকে।

"তোমার হাযারা আজ একটা বিরাট ভুল করেছে, আমির," বলল সে। তারপর ঘুরে চলে গেল। ওকে ঢাল বেয়ে নেমে যেতে দেখলাম। একটা দেয়ালের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একজোড়া কম্পিত হাতে গুলতিটা কব্জিতে প্যাঁচানোর চেষ্টা করছিল হাসান। ওর মুখটা কুকড়ে গিয়ে আশ্বাসের হাসি ফোটানোর প্রয়াস পাচ্ছিল। ট্রাউজার্সের ফিতা বাঁধতে পাঁচ বার চেষ্টা করতে হল ওকে। উত্তেজিতভাবে বাড়ি ফিরে আসার সময় আমরা কেউই তেমন একটা কথা বললাম না। আমরা নিশ্চিত ছিলাম আসেফ আর তার বন্ধুরা মোড় ঘোরার সময় আমাদের জন্যে অ্যাম্বুশ পেতে বসে থাকবে। কিন্তু সেটা তারা করেনি। আমাদের খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পাইনি। একেবারেই না।

পরের দু-এক বছর *অর্থনৈতিক উন্নয়ন* আর *সংস্কার* শব্দ দুটো কাবুলের অনেকের মুখেই খৈ ফোটাল। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। তার স্থান নিয়েছে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র। কিছুদিন এক ধরনের উদ্দীপনা আর লক্ষ্য ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। লোকেরা নারীর অধিকার আর আধুনিক প্রযুক্তির কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিল।

কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই, যদিও একজন নতুন নেতা কাবুলের রাজকীয় প্রাসাদ *আগেই* বাস করছিলেন-আগের মতোই কেটে যেতে লাগল জীবনধারা। লোকে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কাজ করে চলল, আর শুক্রবারে পিকনিক করার জন্যে পার্কে, গারঘা লোকের তীরে, পাঘমান বাগিচায় জমায়েত হতে থাকল। যাত্রীভর্তি বহুরঙা বাস আর লরি কাবুলের সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলল, ওগুলোর ড্রাইভারের অ্যাসিস্ট্যান্টরা বাম্পারের উপর দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসে কাবুলের ভরাট আঞ্চলিক টানে তাদের পথের দিশা বাতলে চলল। ঈদের দিনে-পবিত্র রমযান মাস শেষে তিনদিনের উৎসব-কাবুলিরা তাদের সেরা এবং নতুন পোশাকে সেজে

আত্মীয়দের বাসায় যায়, পরস্পরকে *"ঈদ মোবারক"*–হ্যাপি ঈদ–বলে শুভেচ্ছা জানায়। বাচ্চারা উপহারের বাক্স খোলে। সেদ্ধ করা শুকনো ডিম দিয়ে খেলে।

১৯৭৪ সালের শীতের শুরুতে একদিন উঠোনে আমি আর হাসান তুষারের দুর্গ বানানোর খেলা খেলছিলাম। এমন সময় আলি ডাকল ওকে। "হাসান! আগা সাহিব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়!" সামনের দরজায় দাঁড়িয়েছিল ও। পরনে শাদা পোশাক, হাত বগলতলায় চেপে রাখা। মুখ দিয়ে ভাঁপ বের হচ্ছে।

আমি আর হাসান হাসি বিনিময় করলাম। সারাদিন তার ডাকের অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। সেটা ছিল হাসানের জন্মদিন। "কী ব্যাপার, বাবা? জান তুমি? বলবে আমাদের?" বলল হাসান। ওর চোখজোড়া ঝিলিক মারছিল।

আলি কাঁধ ঝাঁকাল। "আগা সাহিব আমাকে বলেনি কিছু।"

"আহা, আলি, বলো তো," জোর করলাম আমি। "কোনও ড্রয়িং বই? নতুন একটা পিস্তল?"

হাসানের মতো আলিও মিথ্যা বলতে পারত না। প্রত্যেক বছর বাবা আমার বা হাসানের জন্মদিনে কী কিনেছে না জানার ভান করত সে। কিন্তু প্রতি বছরই তার চোখজোড়া তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত। আমরা ওর পেট থেকে কথা বের করে ফেলতাম। এবার কিন্তু সে সত্যি কথাই বলছে বলে মনে হল।

বাবা কখনও হাসানের জন্মদিনের কথা ভুলে যায়নি। একটা সময় পর্যন্ত ও কী চায় সেটা ওকে জিজ্ঞেস করত, কিন্তু পরে বাদ দিয়েছিল, কারণ উপহার চাইবার বেলায় বড্ড ভদ্র ছিল হাসান। তো প্রতি বছর বাবা নিজেই একটা কিছু পছন্দ করত। একবার ওকে একটা জাপানি খেলনা ট্রাক কিনে দিয়েছিল ও, আরেক বার একটা ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ আর ট্রেইন সেট। আগের বছর বাবা ঠিক *দ্য গুড, দ্য ব্যাড অ্যান্ড দ্য আগলিতে* ক্লিন্ট ইস্টউডের পরা হ্যাটের মতো একটা হ্যাট উপহার দিয়ে হাসানকে চমকে দিয়েছিল। এই ছবিটা আমাদের প্রিয় ওয়েস্টার্ন হিসাবে *দ্য ম্যাগনিফিশেন্ট সেভেন*-এর জায়গা দখল করে নিয়েছিল। সেবার গোটা শীত আমি আর হাসান পালা করে ওই টুপিটা মাথায় চাপিয়ে সিনেমার বিখ্যাত বাজনা বাজিয়ে বরফের স্তূপ বেয়ে উঠেছি আর একে অপরকে গুলি করে মেরেছি।

সামনের দরজায় এসে হাতের দস্তানা খুলে ফেললাম আমরা। তুষারে ভারি বুটজোড়াও খুললাম। ফয়েতে পা দিতেই দেখলাম বাবা লাকড়ি জ্বলা কাস্টআয়রন স্টোভের পাশে একজন বেঁটে টেকোমাথা ইন্ডিয়ানের সঙ্গে বসে আছে। লোকটার গায়ে বাদামী স্যুট আর লাল টাই।

"হাসান," অমায়িক হেসে বলল বাবা, "এই যে তোমার জন্মদিনের উপহার।" ফাঁকা দৃষ্টি বিনিময় করলাম আমি আর হাসান। আশপাশে কোনও উপহারের বাক্স

BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছিল না। কোনও ব্যাগ না, কোনও খেলনা না। স্রেফ আলি আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাবা সেই ছোটখাট ইন্ডিয়ানটাকে নিয়ে বসে। লোকটা দেখতে অনেকটা অঙ্কের টিচারের মতো।

বাদামী স্যুট পরা ইন্ডিয়ান লোকটা মৃদু হেসে হাসানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। "আমি ডক্টর কুমার," বলল সে। "তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে খুশ হলাম।" পুরু গড়ানো হিন্দি টানে ফারসিতে কথা বলল সে।

"*সালাম আলাইকুম,*" অনিশ্চিতভাবে বলল হাসান। ভদ্রভাবে মাথাটা একটু নিচু করল সে। কিন্তু ওর চোখজোড়া পেছনে দাঁড়ানো বাবাকে খুঁজছিল। কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল আলি।

হাসানের সতর্ক-এবং বিভ্রান্ত-চোখের দিকে তাকাল বাবা। "ডাক্তার কুমারকে নয়া দিল্লী থেকে ডেকে এনেছি। ডাক্তার কুমার একজন প্লাস্টিক সার্জন।"

"সেটা কি জান?" জিজ্ঞেস করল ইন্ডিয়ান লোকটা-ডাক্তার কুমার।

মাথা নাড়ল হাসান। সাহায্যের আশায় আমার দিকে তাকাল। কিন্তু আমি কাঁধ ঝাঁকালাম। আমি কেবল জানতাম যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলেই সার্জনের কাছে যেতে হয়। এটা জানি কারণ এর আগের বছর আমাদের এক ক্লাসমেট মারা গিয়েছিল, টিচার আমাদের বলেছে সার্জনের কাছে যেতে বেশী দেরি করে ফেলেছিল সে। আমরা দুজনই আলির দিকে তাকালাম। তবে ওর কাছে তো কিছুই আশা করা যায় না। বরাবরের মতোই নিরাসক্ত ছিল তার চেহারা, যদিও চোখে কোমল একটা কিছু গলে যাচ্ছিল।

"বেশ," বলল ডাক্তার কুমার, "আমার কাজ হচ্ছে মানুষের শরীরের জিনিসপত্র-অনেক সময় তাদের চেহারা-ঠিক করা।"

"ওহ্," বলল হাসান। ডাক্তার কুমার থেকে বাবা হয়ে আলির দিকে তাকাল ও। হাত দিয়ে ওপরের ঠোঁট স্পর্শ করল। "ওহ্," আবার বলল।

"জানি এটা একটা অস্বাভাবিক উপহার," বলল বাবা। "হয়ত তুমি যা আশা করেছিলে তেমন কিছু না। কিন্তু এই উপহার সারা জীবন টিকে থাকবে।"

"ওহ্," বলল হাসান। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। গলা পরিষ্কার করে নিল। "আগা সাহিব...এটা কি...এটা কি-"

"কিছুই হবে না," বলল ডাক্তার কুমার। দয়াময় হাসল সে। "একটুও ব্যথা লাগবে না তোমার। আসলে, তোমাকে একটা ওষুধ দেব আমি। তোমার আর কিছুই মনে থাকবে না।"

"ওহ্," বলল হাসান। স্বস্তির সঙ্গে পাল্টা হাসল। যেভাবেই হোক এক ধরনের স্বস্তি। "আমি ভয় পাইনি, আগা সাহিব। খালি... হাসানকে হয়ত বোকা বানানো

BanglaBook.org

গিয়েছিল কিন্তু আমি বোকা বনিনি। আমি জানতাম, ডাক্তাররা যখন বলে কোনও ব্যথা লাগবে না, আসলে ঠিক তখনই বুঝতে হবে বিপদে পড়তে যাচ্ছ তুমি। সভয়ে আগের বছর আমার মুসলমানির কথা মনে করলাম। ঠিক এই একই কথা বলেছিল, ডাক্তার। আমাকে বারবার আশ্বস্ত করেছিল কোনও ব্যথাই লাগবে না। কিন্তু রাতে যখন অলস করার ওষুধের প্রভাব কেটে গেল, আমার মনে হচ্ছিল যেন কেউ বুঝি আমার কুঁচকিতে একটা আগুনরাঙা লোহা ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাবা যে কেন মুসলমানি করানোর আগে আমার দশ বছর বয়স হওয়ার অপেক্ষা করেছিল সেটা আমার বোধের বাইরে। এটাও একটা ব্যাপার যার জন্যে ওকে কখনও ক্ষমা করব না আমি।

আমার মনে হল বাবার সহানুভূতি পাবার জন্যে আমিও কোনওভাবে ভয় পেতাম যদি। এটা ঠিক না। বাবার আদর পাবার মতো কোনও কিছুই করেনি হাসান। তার জন্মই হয়েছে ওই হতচ্ছড়া কাটা ঠোঁট নিয়ে।

সার্জরি ঠিকমতোই হল। ওরা প্রথম ব্যান্ডেজ খোলার পর আমরা সবাইই একটু ধাক্কা খেলাম। কিন্তু ডাক্তার কুমার আমাদের আগেই বলে রেখেছিল বলে মুখে হাসি ধরে রাখলাম আমরা। কাজটা সহজ ছিল না, কারণ হাসানের ওপরের ঠোঁটটা একটা ফোলা দগদগে টিস্যুর অদ্ভুত চেহারা পেয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম নার্স ওকে আয়না দেওয়ার পর হাসান বুঝি কেঁদে উঠবে। ও আয়নার দিকে দীর্ঘক্ষণ চিন্তিত চেহারায় তাকিয়ে থাকার সময় ওর কাঁধে হাত রাখল আলি। কি যেন বিড়বিড় করে বলল, বুঝতে পারলাম না। ওর মুখের কাছে কান নিয়ে গেলাম। আবার ফিসফিস করল ও।

"*তাশাকোর।*" ধন্যবাদ।

তারপর ওর ঠোঁটজোড়া বেঁকে উঠল। তখনই আমি বুঝে গেলাম কি করতে যাচ্ছে ও। হাসছে ও। ঠিক মায়ের পেট থেকে বের হবার সময় যেভাবে হেসেছিল।

ফোলা ভাবটা কমে এল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থান সেরে গেল। অচিরেই ওর ওপরের ঠোঁটে গোলাপি রেখা দেখা দিল আর শীতকাল নাগাদ ক্ষীণ ক্ষতচিহ্নে পরিণত হল সেটা। ব্যাপারটা পরিহাসময়। কারণ সেই শীতেই হাসি বাদ দিয়েছিল হাসান।

ছয়

শীত।

প্রতি বছর তুষারপাতের শুরু হওয়ার প্রথম দিন আমি যা করি সেটা হল: অনেক সকালে পাজামা পরেই ঘরের বাইরে চলে আসি, ঠাণ্ডা ঠেকাতে হাতজোড়া জড়াচড়ি করে রাখি। ড্রাইভওয়ে, বাবার গাড়ি, দেয়াল, গাছপালা, ছাদ আর তুষারের নিচে চাপা পড়া টিলাগুলো খুঁজে বের করি। হাসি। আকাশ নিভাঁজ। নীল। তুষার এত শাদা যে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মুখে টাটকা একমুঠো তুষার ঠেসে দিই আমি। কেবল মাঝে সাঝে কাকের ডাকে খানখান হয়ে যাওয়া অখণ্ড চাপা নীরবতা কান পেতে শুনি। খালি পায়ে সামনের সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসি। হাসানকে বের হয়ে এসে দেখতে বলি।

কাবুলের প্রতিটি বাচ্চার প্রিয় ঋতু ছিল শীতকাল। অন্তত যাদের বাবা ছেলেকে একটা ভালো স্টোভ কিনে দেওয়ার সামর্থ রাখত তাদের বেলায়। কারণটা সহজ: শীতকালে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হত। আমার কাছে শীতকাল ছিল বিরাট বিরাট ভাগ অঙ্ক কষা আর বালগেরিয়ার রাজধানীর নাম লেখার শেষ আর হাসানের সাথে স্টোভের পাশে টানা তিন মাস খেলা, মঙ্গলবার সকালে সিনেমা পার্কে ফ্রি রাশান মুভি দেখা, সকালে তুষারমানব বানানোর পরে দুপুরে ভাতের সঙ্গে মিষ্টি শালগমের কোর্মা খাওয়ার শুরু।

আর ঘুড়ি ওড়ানো তো অবশ্যই। ঘুড়ি ওড়ানো। ওগুলোর পেছনে ছোটা।

অল্প কয়েকজন দুর্ভাগা বাচ্চার বেলায় শীতকাল স্কুলের শেষ ঘোষণা

করত না। তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী শীতকালীন কোর্স ছিল। আমার চেনা কোনও ছেলেকে এইসব কোর্সে স্বেচ্ছায় যেতে দেখিনি। অবশ্যই ওদের বাবা-মাই তাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যেত। আমার সৌভাগ্য বাবা তেমন ছিল না। আহমেদ নামে একটা ছেলের কথা মনে আছে। আমাদের উল্টোদিকে থাকত ওরা। ওর বাবা কিসের যেন ডাক্তার ছিল। আহমদের মৃগীরোগ ছিল। সবসময় উলের ভেস্ট আর পুরু কালো রিমের চশমা পরত সে। আসেফের নিয়মিত শিকারের একজন ছিল ও। রোজ সকালে আমি জানালা দিয়ে দেখতাম ওদের হাযারা চাকর-ছেলেটি কালো ওপেলের জন্যে রাস্তা সাফ করার জন্যে ড্রাইভওয়ে থেকে বরফ সরাচ্ছে। আহমদ আর ওর বাবাকে গাড়িতে উঠতে দেখাটাকে একটা কাজে পরিণত করেছিলাম। উলের ভেস্ট আর শীতের কোট পরা আহমদ, ওর স্কুলব্যাগ বই আর পেন্সিলে বোঝাই। ওরা মোড় ঘুরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম আমি, তারপর আবার ফ্লানেলের পাজামা পরেই বিছানায় ফিরে আসতাম। চিবুক অবধি কম্বল তুলে দিয়ে জানালা দিয়ে তুষারের মুকুটপরা পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকতাম। আবার ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেখতে থাকতাম ওদের।

কাবুলের শীতের মৌসুম ভালো লাগত আমার। রাতে আমার জানালার বুকে কোমল শব্দে ঝরে চলা তুষারের জন্যে, আমার কালো রাবারের জুতোর নিচে মচমচ শব্দে টাটকা তুষারের ভেঙে যাওয়ার জন্যে, রাস্তা আর উঠোনের উপর দিয়ে শীতল হাওয়া ধেয়ে যাওয়ার সময় স্টোভের আঁচের কারণে ভালো লাগত আমার। তবে মূলত গাছপালা জমে গেলে, পথঘাট বরফে ঢেকে যাওয়ায় বাবা আর আমার সম্পর্কের বরফ খানিকটা গলে যেত বলে। তার কারণ ছিল ঘুড়ি। আমি আর বাবা একই বাড়িতে থাকলেও অস্তিত্বের ভিন্ন বলয়ে ছিলাম আমরা। ঘুড়ি ছিল এই দুই বলয়ের মাঝে একটা কাগজের মতো ক্ষীণ সংযোগ।

প্রত্যেক শীতে কাবুলের বিভিন্ন পাড়ায় ঘুড়ির লড়াই অনুষ্ঠিত হত। তুমি কাবুলের ছেলে হলে টুর্নামেন্টের দিনটা সন্দেহাতীতভাবে শীত মৌসুমের উজ্জ্বলতম সময়। টুর্নামেন্টের আগের রাতে আমি কখনও ঘুমাতাম না। এপাশ-ওপাশ করতাম। দেয়ালের গায়ে নানান জানোয়ারের ছায়া আঁকতাম। এমনকি অন্ধকারে কম্বল গায়ে জড়িয়ে বেলকনিতে বসে থাকতাম। কোনও বিরাট যুদ্ধের আগের রাতে যেন বা ট্রেঞ্চে ঘুমানোর প্রয়াসরত সৈনিক বলে মনে হত নিজেকে। খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কাবুলে ঘুড়ির লড়াই ছিল ঠিক যুদ্ধে যাবার মতোই একটা ব্যাপার।

BanglaBook.org

যে কোনও যুদ্ধের মতোই নিজেকে প্রস্তুত করতে হত তোমাকে। কিছুদিন আমি আর হাসান নিজেদের ঘুড়ি নিজেরাই বানিয়েছি। আমরা ফলে পাওয়া আমাদের সাপ্তাহিক হাতখরচার টাকা জমিয়ে হেরাত থেকে বাবার এনে দেওয়া একটা পোর্সেলিনের ঘোড়ায় ফেলতাম। শীতের হাওয়া বইতে শুরু করলে যখন চাকা চাকা তুষার ঝরে পড়ত, আমরা ঘোড়ার পেটের নিচের স্ন্যাপ আলগা করে নিতাম। বাজার থেকে বাঁশ, আঠা, সুতো আর কাগজ কিনে আনতাম। ঘুড়ির মাঝখানে আর কোণে লাগানোর জন্যে বাঁশ ছেঁচে, পাতলা টিস্যু পেপার কেটে সারাদিন পার করে দিতাম, যাতে গোত্তা খেয়ে আবার উঠে আসা সহজ হয়। তারপর আমাদের সুতো বা *তার* আমাদেরকেই বানাতে হত। ঘুড়িগুলো অস্ত্র হয়ে থাকলে *তার*-মানে কাচের প্রলেপ দেওয়া কাটার সুতো-ছিল চেম্বারের বুলেট। উঠোনে গিয়ে আমরা অন্তত পাঁচশো গজ সুতোয় কাঁচের গুঁড়ো আর আঠার একটা প্রলেপ দিতাম। তারপর সুতোগুলো গাছের সঙ্গে বেঁধে শুকোতে দিতাম। পরের দিন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত সুতো একটা কাঠের নাটাইতে পেঁচিয়ে নিতাম। তুষার গলে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করতে করতে কাবুলের প্রত্যেকটা ছেলের হাত সারা শীত লড়াকু ঘুড়ির আড়াআড়ি দাগে ভরে উঠত। আমি আর আমার ক্লাসমেটেরা কেমন করে জটলা পাকাতাম মনে আছে। স্কুলে প্রথম দিন ঘুড়ির লড়াইয়ের তুলনা করতাম আমরা। ক্ষতস্থানগুলোয় জ্বলুনি হত। কয়েক সপ্তাহ লাগত সেরে উঠতে। কিন্তু কিছু মনে করতাম না আমি। ওসব ছিল একটা প্রিয় মৌসুমের স্মারক, অনেক দ্রুত যা হারিয়ে গেছে। তারপর ক্লাস ক্যাপ্টেন বাঁশি বাজাত, আমরা একটা সারি বেঁধে ক্লাসরুমে ঢুকতাম। এরই মধ্যে আবার শীতের জন্যে ব্যাকুলতা শুরু হয়ে যেত। কিন্তু তার বদলে আরেকটা দীর্ঘ স্কুল বর্ষের ভূতের দেখা পেতাম।

কিন্তু এটা অচিরেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে আমি আর হাসান ঘুড়ি বানিয়ের চেয়ে বরং অনেক ভালো ঘুড়ি লড়িয়ে। আমাদের ডিজাইনে কোনও না কোনও ত্রুটি সব সময় বিপর্যয় ডেকে আনত। তো বাবা ঘুড়ি কেনার জন্যে আমাদের সাইফুর কাছে নিয়ে যেতে শুরু করল। সাইফু ছিল প্রায় অন্ধ এক লোক, পেশায় *মুচি*-জুতো মেরামতকারী-হলেও শহরের নামকরা ঘুড়ি নির্মাতাও ছিল সে। কাবুল নদীর কাদাময় তীরের দক্ষিণের জনাকীর্ণ রাস্তা জোদাহ মেওয়ান্দ-এ একটা ছোট বাড়িতে কাজ করত। মনে আছে উবু হয়ে একটা কারাকক্ষের আকারের স্টোরে ঢুকে, তারপর একসারি কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একটা স্যাঁতসেঁতে বেসমেন্টে নামতে হত। এখানে ঈর্ষণীয় ঘুড়িগুলো জমিয়ে রাখত সাইফু। বাবা আমাদের দুজনকেই তিনটা করে হুবহু একই রকম দেখতে ঘুড়ি

BanglaBook.org

আর কাঁচের প্রলেপ দেওয়া সুতোসহ নাটাই কিনে দিত। আমি মত পাল্টালে বা আরও বড় বা সুন্দর ঘুড়ি কিনে দেওয়ার বায়না ধরলে বাবা সেটা কিনে দিত বটে–কিন্তু তখন আবার হাসানের জন্যেও একই রকম একটা কিনত। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে কাজটা ও না করলেই ভালো হত। আমাকেই প্রিয় জিনিসটা দেওয়া উচিত ছিল।

ঘুড়ি লড়াইয়ের টুর্নামেন্ট ছিল আফগানিস্তানের প্রাচীন শীতকালীন ঐতিহ্য। প্রতিযোগিতার দিন খুব ভোরে শুরু হত; তারপর আকাশের বুকে কেবল বিজয়ী ঘুঁড়িটা অবশিষ্ট না থাকা পর্যন্ত চলত। মনে আছে একবার প্রতিযোগিতা দিনের আলোকে হারিয়ে দিয়েছিল। লোকেরা তাদের ছেলেদের পক্ষে চেঁচামেচি করার জন্যে রাস্তায় বা ছাদে ভীড় করে দাঁড়াত। রাস্তাগুলো ভরে উঠত ঘুড়ি লড়িয়েতে, যার যার সুতো ধরে টানাটানি করত। চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে। প্রতিপক্ষের সুতো কেটে দেওয়ার মওকার খোঁজে থাকত তারা। প্রত্যেক ঘুড়ি লড়িয়ের একজন করে সহকারী থাকত। আমার বেলায় সেটা ছিল হাসান–ও নাটাই ধরে রেখে সুতো ছাড়তে থাকত।

একবার ইন্ডিয়ান এক ছোকরা আমাদের বলল তাদের শহরে ঘুড়ি লড়াইয়ের কঠিন নিয়ম কানুন আছে–অল্প দিন আগেই আমাদের মহল্লায় এসেছিল ওদের পরিবার। "একটা চৌকো জায়গায় বাতাসের সঙ্গে সমকোণে দাঁড়াতে হবে তোমাকে," গর্বের সুরে বলল সে। "মাঞ্জা দেওয়া সুতো বানাতে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করতে পারবে না।"

আমি আর হাসান পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি। হিন্দি ছেলেটা অচিরেই জেনে গিয়েছিল শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশরা কী শিখেছিল এবং ১৯৮০ এর দশকের শেষের দিকে রাশানরা কী শিখেছিল। সেটা হচ্ছে: আফগানরা স্বাধীন জাতি। আফগানরা রেওয়াজকে লালন করে কিন্তু নিয়মকে ঘৃণা করে। ঘুড়ির লড়ইয়ের বেলায়ও একই কথা খাটে। নিয়মকানুন একেবারে সহজ: কোনও নিয়ম নেই। তোমার ঘুড়ি ওড়াও। প্রতিপক্ষের ঘুড়ি কেটে দাও। গুড লাক।

কিন্তু এটাই সব ছিল না। ঘুড়ি বোকাট্টা হলেই শুরু হত আসল মজা। এখানেই আগমন ঘটত ঘুড়ি-ধাওয়াকরীদের। এরা বাতাসের ধাক্কায় মহল্লার উপর দিয়ে ভেসে চলা ঘুড়ির পিছু নিত, যতক্ষণ না ওটা কোনও মাঠ বা কারও উঠোন বা কোনও গাছের ডগা বা কোনও বাড়ির ছাদে লুটিয়ে পড়ত। এই ধাওয়া বেশ ভয়ঙ্কর রূপ নিত: ঘুড়ি-ধাওয়াকারীদের বিশাল দল রাস্তাঘাট ভরিয়ে তুলত। একবার ষাঁড়ের লড়াইয়ের পর ষাঁড়ের কবল থেকে বাঁচার জন্যে ছুটে

BanglaBook.org

পালানো স্পেনের লোকদের সম্পর্কে যেমন পড়েছিলাম, ঠিক সেভাবে একজন আরেকজনকে ঠেলে সরিয়ে দিত ওরা। একবার পাড়ার একটা ছেলে ঘুড়ির জন্যে একটা পাইন গাছে উঠে বসেছিল। ডালটা ওর ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে। ছেলেটা পিঠের হাড় ভেঙে যায়। আর কখনও হাঁটতে পারেনি সে। তবে ঘুড়ি হাতেই পড়েছিল ছেলেটা। ঘুড়ির ওপর ধাওয়াকারীর হাত থাকলে আর কেউ সেটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারত না। এটা কোনও নিয়ম ছিল না। এটা রেওয়াজ।

ঘুড়ি-ধাওয়াকারীদের জন্যে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার ছিল শীতের টুর্নামেন্টর সবশেষ কাটা যাওয়া ঘুড়ি। এটা ছিল সম্মানের একটা ট্রফি। অতিথিরা যাতে তারিফ করতে পারে সেজন্যে ম্যান্টেলের উপর সাজিয়ে রাখার মতো জিনিস। আকাশ পুরোপুরি পরিষ্কার হয়ে যাবার পরে যখন কেবল শেষ দুটি ঘুড়ি অবশিষ্ট থাকত, প্রত্যেক ধাওয়াকারী এই পুরস্কারটা হাতিয়ে নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেত। এমন একটা জায়গা বেছে নিত সে, যেটা তার বিচারে সবচেয়ে সেরা বলে মনে হত। টানটান পেশীগুলো পাক খোলার জন্যে তৈরি হয়ে যেত। ঘাড়ের পেশী ফুলে উঠত। কুঁচকে উঠত চোখ। তারপর যখন শেষ ঘুড়িটা বোকাট্টা হত, যেন নরক ভেঙে পড়ার দশা হত।

বছরের পর বছর অনেক ছেলেকে ঘুড়ির পেছনে ছুটতে দেখেছি। কিন্তু হাসান ছিল সবদিক দিয়েই আমার দেখা সেরা ধাওয়াকারী। ঘুড়ি জমিনে লুটিয়ে পড়ার আগেই সেটার সম্ভাব্য পতনের স্থান আঁচ করে নেওয়ার বেলায় ওর ক্ষমতা ছিল প্রায় অপার্থিব। যেন ওর মনের ভেতরে কোনও রকম কম্পাস ছিল।

এক মেঘলা শীতের দিনের কথা মনে আছে আমার। আমি আর হাসান একটা ঘুড়ির পেছনে ছুটছি। মহল্লার ভেতর দিয়ে ওর পিছু ধাওয়া করছিলাম আমি। নর্দমা লাফিয়ে পার হচ্ছি। সংকীর্ণ গলিঘুঁচি ধরে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছি। ওর চেয়ে এক বছরের বড় ছিলাম আমি, কিন্তু আমার চেয়ে দ্রুত ছুটছিল হাসান। ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিলাম আমি।

"হাসান! দাঁড়াও!" চিৎকার করে বললাম আমি, পাগলের মতো হাঁপাচ্ছি।

পাঁই করে ঘুরে হাতের ইশারা করল ও। "এই দিকে।" আরেকটা বাঁক ঘুরে উধাও হওয়ার আগে হাঁক দিল। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি আমরা যে পথে এগোচ্ছি সেটা ঘুড়ি যেদিকে যাচ্ছে তার একেবারেই উল্টো দিক।

"আমরা ওটা হারিয়ে ফেলছি!" পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম।

"আমার উপর আস্থা রাখো!" ওকে সামনে থেকে বলতে শুনলাম। বাঁকে পৌঁছে দেখলাম বুলেটের মতো ছুটছে হাসান। মাথা নিচু করে রেখেছে, এমনকি

BanglaBook.org

আকাশের দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। ওর শার্টের ভেতর থেকে ঘাম চুঁইয়ে বের হয়ে আসছে। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়ে গেলাম আমি। হাসানের চেয়ে শ্লথই ছিলাম না, আনাড়ীও ছিলাম বটে। ওর স্বাভাবিক অ্যাথলিসিজমকে আমি সব সময়ই ঈর্ষা করেছি। কোনওমতে কষ্টেসৃষ্টে পা ঠিক করে নিলাম। রাস্তার আরেকটা বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম হাসানকে। ওর পেছন পেছন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোলাম আমি। আমার ছড়ে যাওয়া হাঁটুতে হাজার হাজার সুঁই ফুটছিল যেন।

দেখলাম ইশতিকবাল মিডল স্কুলের কাছে একটা আবর্জনাময় রাস্তায় এসে পড়েছি আমরা। উল্টোদিকে একটা মাঠ রয়েছে, এখানে গ্রীষ্মকালে লেটুস চাষ করা হয়। অন্য পাশে রয়েছে একসারি টক চেরি গাছ। দেখলাম গাছগুলোর নিচে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে হাসান। মুঠোভর্তি শুকনো মালবেরি খাচ্ছে।

"এখানে কী করছ?" হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম, বমির উদ্বেগে গুলিয়ে উঠছিল আমার পেটের ভেতরটা।

হাসল ও। "আমার সঙ্গে বসো, আমির আগা।"

ওর পাশে একটা তুষারের স্তূপের উপর ধপ করে বসে পড়লাম। হাঁপাচ্ছি। "সময় নষ্ট করছ তুমি। ওটা উল্টোদিকে যাচ্ছে। দেখোনি?"

মুখে একটা মালবেরি পুরল হাসান। "আসছে ওটা," বলল ও। দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। অথচ ওকে এমনকি ক্লান্ত বলেও মনে হচ্ছিল না।

"কী করে জানলে?"

"জানি।"

"কীভাবে?"

আমার দিকে ফিরল সে। চাঁদির উপর কয়েক ফোঁটা স্বেদ বিন্দু জমে উঠেছে। "আমি কি তোমার সঙ্গে কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারি, আমির আগা?"

হঠাৎ ওকে একটু খেলাতে ইচ্ছে হল আমার। "জানি না। বলবে কখনও?"

"আমি বরং তারচেয়ে মাটি গিলে খাব," বিতৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে বলল সে।

"সত্যি? তাই করবে তুমি?"

আমার দিকে বিভ্রান্ত চোখে তাকাল ও। "কী করব?"

"আমি বললে মাটি খাবে," বললাম আমি। জানতাম নিষ্ঠুরতা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন কোনও বড় শব্দের অর্থ না জানলে ওকে খেপাই। কিন্তু সেটা ছিল হাসানকে টিটকারী মারার খানিকটা অসুস্থ হলেও খুবই মাজাদার কায়দা।

BanglaBook.org

অনেকটা আমাদের পোকা-মাকড়ের উপর অত্যাচার চালানোর মতো। কেবল এখন সে পরিণত হয়েছে পিঁপড়েয় আর আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ধরে আছি।

অনেকক্ষণ আমার চেহারায় কি যেন খুঁজল সে। একটা টক চেরি গাছের নিচে বসে ছিলাম আমরা, ছোট দুটি ছেলে, হঠাৎ করে সত্যিকার অর্থেই এক অপরের দিকে চেয়ে ছিলাম। এরপরের ঘটনা এরকম: হাসানের চেহারা বদলে গেল। হয়ত আসলে বদলায়নি, কিন্তু হঠাৎ করে আমার মনে হতে লাগল আমি যেন দুটো চেহারার দিকে চেয়ে আছি। একটা আমার চেনা। আমার প্রথম স্মৃতির চেহারা। অন্যটা দ্বিতীয় একটা চেহারা। ঠিক আগের চেহারার নিচেই উঁকি মারছে। আগেও এমনটা ঘটতে দেখেছি আমি। ব্যাপারটা সবসময়ই আমাকে খানিকটা টলিয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় এই চেহারা আবির্ভূত হল-খণ্ডিত মুহূর্তের জন্যে-আমার মাঝে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি রেখে যাবার মতো যথেষ্ট দীর্ঘ সময়-হয়ত অন্য কোথাও—এই চেহারা দেখেছি। তারপর হাসান চোখ পিটপিট করল, এবং পরক্ষণেই আবার আগের হাসান হয়ে গেল ও। স্রেফ হাসান।

"তুমি বললে, খাব," অবশেষে বলল ও। আমার দিকে চেয়ে রইল। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। আজও হাসানের মতো লোকদের চোখের দিকে সারাসরি তাকাতে পারি না আমি। যারা তাদের প্রত্যেবকটা কথাই সত্যি বলে বোঝায়।

"কিন্তু আমি ভাবছি," আবার যোগ করল ও, "তুমি কি কখনও এমন একটা কাজ করতে বলবে আমাকে, আমির আগা?" ঠিক এভাবেই আমার উদ্দেশে ওর ছোট পরীক্ষাটা ছুড়ে দিয়েছিল ও। আমি ওর বিশ্বস্ততা নিয়ে খেলতে বা চ্যালেঞ্জ করতে গেলে সেও আমার সঙ্গে খেলত, আমার সততার পরীক্ষা নিত।

কথোপকথনটা শুরু না করলেই ভালো ছিল, ভাবলাম আমি। জোর করে হাসলাম। "বোকার মতো কথা বলো না, হাসান। তুমি জানো, সেটা কখনওই বলব না আমি।"

হাসি ফিরিয়ে দিল হাসান। কিন্তু ওর হাসিটা জোর করে ফোটানো ছিল না। যারা তাদের প্রত্যেকটা কথাই অন্তর থেকে বলে তাদের বেলায় এমনই হয়। ওরা ভাবে অন্যরা একই রকম।

"ওই যে আসছে," আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বলল হাসান। উঠে একটু বাম দিকে এগিয়ে গেল ও। উপরে তাকালাম আমি, দেখলাম ঘুড়িটা সবেগে আমাদের দিকে নেমে আসছে। পায়ের আওয়াজ, চিৎকার কানে এল আমার। ঘুড়ি-ধাওয়াকারীদের আগমন। কিন্তু সেটা ছিল সময়ের অপচয় মাত্র, কারণ দুই

BanglaBook.org

হাত মেলে দাঁড়িয়ে ছিল হাসান। হাসি মুখে ঘুড়িটার জন্যে অপেক্ষা করছিল ও। খোদা–মানে যদি তিনি থেকে থাকেন আরকি–ঘুড়িটা সোজা ওর মেলে দেওয়া দুই হাতের উপর গিয়ে পড়ে না থাকলে তিনি যেন আমাকে অন্ধ করে দেন।

১৯৭৫ সালের শীতে শেষবারের মতো হাসানকে ঘুড়ির পিছু ধাওয়া করতে দেখি আমি।

এমনিতে প্রত্যেক মহল্লা যার যার প্রতিযোগিতার যোগাড় যন্ত্র করত। কিন্তু সে বছর টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আমাদের পাড়া ওয়াযির আকবার খানে—আর অন্য কয়েকটি এলাকা–কার্থে-চার, কার্থে-পারওয়ান, মেক্রো-রায়ান এবং কোতেহ্-সাঙ্গি–কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আসন্ন টুর্নামন্টের আলোচনা না শুনে কোথাও যাবার উপায় ছিল না কারও। রটে গিয়েছিল যে পঁচিশ বছরের ভেতর সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট হতে যাচেছ এটা।

সেই শীতের এক রাতে, বিরাট প্রতিযোগিতার আর মাত্র চারদিন বাকি তখন, বাবার স্টাডিতে ফায়ার প্লেসের পাশে পুরু আর্মচেয়ারে বসে আছি আমি আর বাবা। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আলাপ করছিলাম আমরা। আগেই ডিনার পরিবেশন করেছিল আলি–আলু আর ভাতের সঙ্গে ফুল কপির তরকারী–হাসানের সঙ্গে রাতের মতো শুতে চলে গিয়েছিল সে। বাবা পাইপ মোটা করছিল। ওকে আমি সেই গল্পটা বলার জন্যে আবদার করছিলাম, যেবার পাহাড় থেকে নেকড়ের পাল নেমে এসে সবাইকে সপ্তাহ খানেক ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল। একটা দেশলাই জ্বেলে স্বাভাবিক কণ্ঠে বাবা বলল, "আমার মনে হয় এবছর টুর্নামেন্টটা জিতে নিতে পারবে তুমি। তোমার কী মনে হয়?"

কী ভাবব বা কী বলতে হবে বুঝতে পারছিলাম না। এটাই কী দরকার ছিল? আমার হাতে কি একটা চাবি হাতে তুলে দিয়েছিল? আমি ভালো ঘুড়ি-লড়িয়ে ছিলাম। আসলে খুবই ভালো। কয়েকবারই শীতের টুর্নামেন্ট জিতে নেওয়ার অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গেছি–একবার, শেষ তিনজনের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাছাকাছি যাওয়া আর জেতা এক কথা নয়, তাই না? বাবা *কাছাকাছি যায়নি*। জিতেছে, কারণ বিজয়ীরা জেতে। আর বাকি সবাই স্রেফ বাড়ি ফিরে যায়। বাবা জিততে অভ্যস্ত ছিল। যখন যেখানে হাত দিয়েছে সেখানেই জিতেছে। ছেলের কাছে থেকেও সেটাই আশা করার অধিকার কি ওর ছিল না? ভাবো তো, যদি আমি জিতে যাই...

পাইপ টানতে টানতে কথা বলছিল বাবা। শোনার ভান করে চললাম আমি। কিন্তু শুনতে পাচ্ছিলাম না। কারণ বাবার সহজ চালে বলা কথাটা আমার মনে

BanglaBook.org

একটা বীজ বপন করে দিয়েছিল। শীতের টুর্নামেন্টটা আমাকে জিততেই হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলাম। আমাকে জিততে হবে। এর বাইরে আর কোনও কিছু নেই। আমাকে জিততেই হবে। শেষ ঘুড়িটার পিছু ধাওয়া করব আমি। তারপর ওটা বাড়ি এনে দেখাব বাবাকে, দেখিয়ে দেব যে ওর ছেলেটি তাকত রাখে। তাহলে হয়ত এবাড়িতে ভূতের মতো আমার জীবনের অবসান ঘটবে। নিজেকে স্বপ্নে তলিয়ে যেতে দিলাম: রূপোর থালাবাসনের সবিরাম টুংটাং আর ক্ষণিকের *হুম-হাম* শব্দের বদলে ডিনারের সময় কথোপকথন আর হাসির লহর কল্পনা করলাম। কল্পনার চোখে দেখতে পেলাম বাবার গাড়িতে করে পাঘমান যাচ্ছি, যাবার পথে গারঘা লেকে থেমেছি, কিছু রুই মাছ ভাজি আর আলু খাব বলে। সিংহ মারজানকে দেখার জন্যে চিড়িয়েখানায় যাব আমরা। বাবা হয়ত সারাক্ষণ আড়চোখে বার বার ঘড়ির দিকে তাকাবে না। হাই তুলবে না। এমনকি বাবা হয়ত আমার লেখা গল্পগুলো পড়তেও পারে। বাবা একটা গল্প পড়ছে জানতে পেলে ওর জন্যে কয়েক শো গল্প লিখে দেব। হয়ত আমাকে রহিম খানের মতো *আমির জান* বলে ডাকবে ও। হয়ত, হয়ত শেষ পর্যন্ত মাতৃ-হত্যার দায় থেকে মুক্তি পাব আমি।

বাবা বলছিল একবার একই দিনে চৌদ্দটা ঘুড়ি কেটেছিল ও। আমি হেসে মাথা দোলালাম। ঠিক জুৎসই জায়গাগুলোয় মাথা দুলিয়ে গেলাম। কিন্তু আসলে ওর কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম না। এখন আমার একটা লক্ষ্য আছে। বাবাকে নিরাশ করব না। এবার নয়।

টুর্নামেন্টের আগের রাতে প্রবল তুষারপাত হল। বাতাসের ধাক্কায় গাছের ডালপালা এসে জানালায় বাড়ি খাচ্ছিল। আমি আর হাসান *কুরসির* নিচে বসে পানজপার খেলছিলাম। সেদিন আরও আগে আলিকে আমাদের জন্যে *কুরসিটা* বসাতে বলেছিলাম–মূলত এটা হচ্ছে পুরু কুইল্টেড কম্বলে ঢাকা নিচু টেবিলের নিচে বসানো ইলেক্ট্রিক হীটার। টেবিলের চারপাশে ম্যাট্রেস আর কুশন বসিয়ে দিয়েছিল সে। ফলে অন্তত বিশ জন লোক ওখানে বসে ওটার নিচে পা গলিয়ে দিতে পারত। আমি আর হাসান সাধারণত তুষারপাতের দিনগুলো দাবা বা তাস খেলে *কুরসির* নিচে উষ্ণ পরিবেশে কাটিয়ে দিতাম। তবে বেশীরভাগ পানজপারই খেলতাম।

হাসানের ডায়মন্ডের দশকে হারিয়ে দিলাম আমি, দুটো গোলাম আর ছয় গছিয়ে দিলাম ওকে। পাশের ঘরে, মানে বাবার স্টাডিতে বাবা আর রহিম খান আরও দুজন লোকের সঙ্গে ব্যবসায়িক আলাপে মশগুল ছিল।

BanglaBook.org

ওদের একজনকে আসেফের বাবা বলে চিনতে পেরেছিলাম। দেয়াল ভেদ করে রেডিও কাবুলের খবরের ছাড়াছাড়া আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম।

হাসান ছয়টাকে হারিয়ে দিয়ে গোলামগুলো তুলে নিল। রেডিওতে দাউদ খান বিদেশী বিনিয়োগ সম্পর্কে কি যেন বলছিলেন।

"সে বলছে একদিন কাবুলে আমাদেরও টেলিভিশন হবে," বললাম আমি।

"কে?"

"দাউদ খান, গাধা কোথাকার, প্রেসিডেন্ট।"

খিলখিল করে হেসে উঠল হাসান। "শুনেছি ইরানে এরই মধ্যে টেলিভিশন এসে গেছে," বলল ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। "এই ইরানিরা..." অনেক হাযারার কাছে ইরান ছিল অনেকটা স্যাঙ্কচুয়ারির মতো–আমার ধারণা, হাযারাদের মতো ইরানিরাও শি'য়া মুসলিম বলে। কিন্তু ইরানিদের সম্পর্কে সেই গ্রীষ্মে টিচারের বলা কথা মনে পড়ে গেল। ওরা আসলে হাসি মুখে ভালো ভালো কথা বলবে, একহাতে তোমার পিঠ চাপড়ে দেবে, কিন্তু আরেক হাতে তোমার পকেট খালি করে ফেলবে। বাবাকে কথাটা বলেছিলাম। বাবা বলেছে ওই টিচার আসলে হিংসুক আফগানদেরই একজন। হিংসা করার কারণ ইরান হচ্ছে এশিয়ার এক উদীয়মান শক্তি। দুনিয়ার বেশীর ভাগ লোক ম্যাপে আফগানিস্তানকে খুঁজেই পায় না। "কথাটা বলত খারাপ লাগে," বলে কাঁধ ঝাঁকিয়েছে বাবা। "কিন্তু মিথ্যে কথায় সান্ত্বনা পাওয়ার চেয়ে সত্যি কথায় আঘাত পাওয়া ভালো।"

"একদিন তোমাকে একটা কিনে দেব," বললাম আমি।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসানের চেহারা। "টেলিভিশন? সত্যি?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু শাদাকালো নয়। ততদিনে আমরা হয়ত বড় হয়ে যাব। আমদের জন্যে দুটো সেট কিনব আমি। একটা তোমার জন্যে আর একটা আমার জন্যে।"

"ওটা আমার টেবিলে রাখব আমি। যেখানে আমার ড্রয়িংগুলো রাখি," বলল হাসান।

ওর এ কথায় আমার কেন যেন খারাপ লাগল। হাসান যেমন এবং ও যেখানে থাকে তার জন্যে খারাপ লাগল। কারণ ও এটা মেনে নিয়েছে যে উঠোনের ওই মাটির ঘরেই বেড়ে উঠবে, ওর বাবা যেভাবে বেড়ে উঠেছে। শেষ কার্ডটা ওঠালাম আমি। ওকে একজোড়া রানি আর একটা দশ দিলাম।

রানি তুলে নিল হাসান। "কি জান, আমার মনে হয় আগা সাহিবকে আগামীকাল গর্বিত করে তুলবে তুমি।"

BanglaBook.org

"তোমার তাই মনে হচ্ছে?"

"*ইনশাল্লাহ,*" বলল ও।

"*ইনশাল্লাহ,*" প্রতিধ্বনি তুললাম আমি। যদিও "আল্লাহ চাইলে" শর্তটা আমার ঠোঁট থেকে ঠিক ততটা আন্তরিক সুরে বেরিয়ে এল না। হাসানের বেলায় এটাই ছিল আসল ব্যাপার। ও ছিল যারপরনাই খাঁটি। ওর আশপাশে নিজেকে তোমার সব সময়ই মেকি বলে মনে হবে।

ওর রাজাকে হারিয়ে দিয়ে শেষ কার্ডটা-টেক্কার তুরুপ-খেললাম আমি। ওটা তুলে নেওয়া ছাড়া গতি ছিল না ওর। জিতে গেলাম আমি। কিন্তু আমি যখন পরের দানের জন্যে কার্ড শাফল করছি, কেন যেন আমার মনে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল: হাসান হয়ত ইচ্ছে করে জিতিয়ে *দিয়েছে* আমাকে।

"আমির আগা?"

"কী?"

"তুমি জান...আমি আমার থাকার জায়গাটা পছন্দ করি।" সব সময়ই আমার মনের কথা পড়ে ফেলত ও। "এটাই আমার বাড়ি।"

"যাহোক," বললাম আমি, "আবার হারার জন্যে রেডি হও।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সাত

পরদিন সকালে নাশতার জন্যে কালো চা বানানোর সময় হাসান বলল ও একটা স্বপ্ন দেখেছে। "ঘারগা লেকে গেছি আমরা, আমি, তুমি, বাবা, আগা সাহিব আর হাজার হাজার লোক," বলল সে। "রোদেলা উষ্ণ পরিবেশ। লেক আয়নার মতো টলটল করছে। কিন্তু কেউ সাঁতার কাটছে না, কারণ লোকে বলছে লেকে নাকি একটা দানো দেখা গেছে। একেবারে তলায় ওত পেতে অপেক্ষা করছে ওটা।"

আমার জন্যে এক কাপ চা ঢালল ও, চিনি মিশিয়ে বার কয়েক ফুঁ দিল; তারপর নামিয়ে রাখল সামনে। "তো সবাই ভয় পাচ্ছিল পানিতে নামতে। তারপর হঠাৎ তুমি পা থেকে জুতো খুলে ফেললে, আমির আগা, গায়ের শার্টও খুললে। 'দানো বলে কিছু নেই,' বললে তুমি, 'তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।' তারপর কেউ থামানোর আগেই ঝাপিয়ে পড়লে পানিতে। আমি তোমার পিছু নিলাম। তারপর একসঙ্গে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম আমরা।"

"কিন্তু তুমি তো সাঁতার জানো না।"

হাসল হাসান। "এটা একটা স্বপ্ন, আমির আগা। স্বপ্নে যাইচ্ছে করতে পারো তুমি। সে যাক, সবাই চেঁচামেচি জুড়ে দিল। 'উঠে এসো! উঠে এসো!' কিন্তু তুমি ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতার কেটে চললে। লেকের মাঝখানে চলে এলাম আমরা। থামলাম। তারপর ঘুরে পারে দাঁড়ানো লোকজনের দিকে তাকালাম। পিঁপড়ের মতো এতটুকু দেখাচ্ছিল ওদের। কিন্তু ওদের চিল্লাচিল্লি কানে আসছিল। এবার ওরা বুঝতে পারল দানো বলে কিছু নেই, স্রেফ

পানি। এর পরে ওরা লেকটার নাম বদলে রাখল ওরা। 'কাবুলের সুলতান আমির আর হাসানের লেক' বলে ডাকতে শুরু করল। তারপর আমরা ওখানে সাঁতার কাটার জন্যে লোকজনের কাছ থেকে পয়সা আদায় শুরু করলাম।"

"তো এর মানে কী?" জানতে চাইলাম।

আমার *নানে* মার্মালেড মাখাল ও। প্লেটের উপর রাখল। "জানি না: ভেবেছিলাম তুমি বলতে পারবে।"

"বেশ, এটা একটা ভুয়া স্বপ্ন। এখানে কিছুই ঘটে না।"

"বাবা তো বলে স্বপ্নের একটা মানে থাকেই।"

চায়ে চুমুক দিলাম। "ও যখন এত লায়েক তো ওকেই জিজ্ঞেস করো না কেন?" বললাম আমি। যেমনটা চেয়েছিলাম তার চেয়ে রূঢ় শোনাল আমার কণ্ঠস্বর। সারারাত ঘুমাতে পারিনি আমি। আমার ঘাড় আর পিঠ দোমড়ানো স্পঞ্জের মতো মনে হচ্ছিল। তারপরেও হাসানের প্রতি রূঢ় আচরণ করেছি। ক্ষমা চাইতে গিয়েও শেষে মত পাল্টালাম। হাসান বুঝতে পারছিল নার্ভাস ছিলাম আমি। আমাকে সব সময়ই বুঝতে পারত হাসান।

উপর তলায় বাবার বাথরুমে পানি ঝরার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলম।

টাটকা তুষারের আস্তরণে ঝিলিক মারছিল পথঘাট। আকাশটা যেন নিস্পাপ নীল হয়ে আছে। সবগুলো ছাদ ঢেকে ফেলেছে তুষারের আস্তরণ। আমাদের রাস্তার দুপাশে দাঁড়ানো বেঁটে মালবেরি গাছের ডালগুলোর উপর জমে হেলিয়ে দিয়েছে ওগুলোকে। প্রত্যেকটা খানা-খন্দে ঢুকে পড়েছে তুষার। আমি আর হাসান রট আয়রন গেইট গলে বেরুনোর সময় চোখ কুঁচকে চোখ ধাঁধানো শাদা বিস্তারের দিকে তাকলাম। আমাদের পেছনে গেইট বন্ধ করে দিল আলি। চাপা স্বরে তাকে দোয়াদরূদ পড়তে শুনলাম। আমরা ওকে বাড়িতে রেখে বাইরে গেলেই দোয়া পড়ত সে।

এর আগে আমাদের রাস্তায় এত লোক কখনও দেখিনি। ছেলেরা বরফের গোল্লা ছোঁড়াছুড়ি করছে, মারপিট করছে, হাসতে হাসতে একে অন্যকে ধাওয়া করছে। নাটাই এর বাক্স নিয়ে জটলা পাকাচ্ছে ঘুড়ি লড়িয়েরা। শেষ মুহূতের্র প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে। পাশের রাস্তা থকে ভেসে আসা হাসি আর কথাবার্তার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে ছাদের চেয়ারগুলো দর্শকে ভরে গেছে। লন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে তারা। থার্মো থেকে গরম চায়ের ভাঁপ বের হচ্ছে। ক্যাসেট-প্লেয়ারে সজোরে বাজছে আহমেদ যাহিরের গান। দারুণ জনপ্রিয় আহমদ যাহির আফগান গানে

BanglaBook.org

বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। প্রচলিত তবলা আর হারমোনিয়োমের জায়গায় ইলেক্ট্রিক গিটার, ড্রামস আর হর্ন যোগ করে শুদ্ধবাদীদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছে। স্টেজ আর পার্টিতে প্রবীন গায়কদের এড়িয়ে চলে সে। আসলে গান গাইবার সময় হাসে—অনেক সময় এমনকি মেয়েদের উদ্দেশেও। আমাদের ছাদের দিকে নজর ফেরালাম আমি। একটা বেঞ্চে বসে আছে বাবা আর রহিম খান। দুজনের গায়েই উলের পোশাক। চায়ে চুমুক দিচ্ছে। হাত নাড়ল বাবা। আমার দিকে নাকি হাসানের দিকে, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

"আমাদের শুরু করা উচিত," বলল হাসান। ওর পায়ে কালো রাবারের স্নো বুট। পুরু স্যোয়েটারের উপর উজ্জ্বল সবুজ *চাপান* চড়িয়েছে, পরনে রঙ-জ্বলা কর্ডুরয় প্যান্ট। ওর চেহারায় রোদের আলো খেলা করছে। সেই আলোয় ওর ঠোঁটের গোলাপি ক্ষতটা কতখানি সেরে গেছে দেখতে পেলাম।

হঠাৎ হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল আমার। সব কিছু গুছিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে মন চাইল। কী ভাবছিলাম আমি? কেন এসবের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি? আগে থেকেই যেখানে জবাবটা জানা আছে আমার? ছাদের উপর থেকে আমার দিকে খেয়াল রাখছিল বাবা। ওর দৃষ্টি যেন আমার কাছে প্রখর রোদের অলো বলে মনে হচ্ছিল। এমনকি আমার পক্ষেও এক ব্যাপক মাত্রার বিপর্যয় হতে যাচ্ছে এটা।

"আজ ঘুড়ি ওড়াতে ইচ্ছে করছে কিনা বুঝতে পারছি না," বললাম।

"দারুণ একটা দিন আজ," বলল হাসান।

পায়ের উপর শরীরে ভর বদল করলাম আমি। ছাদের উপর থেকে নজর সরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। "জানি না। আমাদের বোধ হয় ঘরে ফিরে যাওয়া উচিত।"

এবার আমার সামনে চলে এল ও, তারপর নিচু কণ্ঠে এমন একটা কথা বলল, খানিকটা ভয় পেয়ে গেলাম। "মনে রেখ, আমির আগা। দানো বলে কিছু নেই। স্রেফ একটা সুন্দর দিন।" কেমন করে ওর চোখে সব সময় খোলা বইয়ের পাতার মতো ছিলাম আমি, যেখানে বেশীরভাগ সময়ই ওর মাথায় কী ভাবনা চলছে কোনও ধারণাই করতে পারিনি আমি? আমিই স্কুলে পড়তে গিয়েছি, আমি লিখতে পড়তে জানি। আমি ছিলাম বুদ্ধিমান। হাসান একটা ফার্স্ট গ্রেড টেক্সট-বুকও পড়তে পারত না। কিন্তু আমাকে বেশ ভালোই পড়ে ফেলত। এটা খানিকটা অস্বস্তিকরই ছিল বটে। আবার কেউ একজন সব সময় তোমার প্রয়োজনের ব্যাপারটা জানে, এটা জানা থাকাটাও স্বস্তিকর ছিল।

"দানো বলে কিছু নেই," একটু ভালো বোধ করে বললাম আমি।

BanglaBook.org

নিজেই একটু অবাক হলাম।

হাসল ও। "কোনও দানো নেই।"

"তুমি নিশ্চিত?"

চোখ বন্ধ করল ও। মাথা দোলাল।

রাস্তায় ছুটে চলা ছেলেদের দিকে তাকালাম। তুষারের গোল্লা নিয়ে ছোড়াছুড়ি করছে। "খুব সুন্দর একটা দিন, তাই না?"

"চল ওড়াই," বলল ও।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল হাসানই হয়ত স্বপ্নটা বানিয়েছে। তাকি সম্ভব? মনে হয় না, ভাবলাম আমি। অত চালাক হাসান নয়। *আমিও* অতখানি চালাক ছিলাম না। তা বানোয়াট হোক বা না হোক, হাস্যকর স্বপ্নটা আমার উদ্বেগ খানিকটা হলেও কমিয়ে দিয়েছিল। হয়ত আমার গায়ের শার্ট খুলে লেকে সাঁতার কাটাই *উচিত*। কেন নয়?

"চলো শুরু করা যাক।"

উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসানের চেহারা। "বেশ," বলল ও। আমাদের লাল-হলদে কিনারাঅলা ঘুড়িটা উঁচু করল ও। মাঝেখানের আর দুপাশের বাঁশ দুটো যেখানে মিলেছে ঠিক সেখানে রয়েছে সাইফুর ভ্রান্তির অতীত সিগনেচার। আঙুল জিভে ভিজিয়ে বাতাসের দিকে ধরল ও। বাতাসের ভাব বুঝল। তারপর হাওয়ার অনুকূলে ছুটে গেল। বিরল ক্ষেত্রে আমরা গরমকালে ঘুড়ি ওড়ানোর সময় হাওয়ার গতি বোঝার জন্যে ধূলি ওড়াত ও। হাসান না থামা পর্যন্ত আমার হাতে নাটাইটা ঘুরতে থাকল। আনুমানিক পঞ্চাশ ফুট দূরে গিয়ে থামল ও। মাথার উপর তুলে ধরল ঘুড়িটা, ঠিক কোনও অলিম্পিক অ্যাথলিট যেভাবে তার গোল্ডমেডাল দেখায়। দুবার সুতো ধরে টান মারলাম। আমাদের সাধারণ সঙ্কেত। ঘুড়িটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিল হাসান।

বাবা আর স্কুলের মোল্লাদের মাঝখানে আটকা পড়ে আমি তখনও খোদার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। কিন্তু যখন দিনিয়াত ক্লাসে শেখা কোরানের কোনও আয়াত আমার ঠোঁটে উঠে এল, বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগলাম। লম্বা একটা দম নিয়ে ছাড়লাম। টান লাগালাম সুতোয়। মিনিটখানেকের মধ্যেই সবেগে আকাশের দিকে উঠে গেল আমার ঘুড়িটা। কাগজের পাখির ডানা ঝাপ্টানোর মতো করে আওয়াজ করতে লাগল ওটা। হাততালি দিল হাসান। শিস বাজিয়ে আমার দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। ওর হাতে নাটাই তুলে দিলাম। আলগা সুতো বটে ফেলার জন্যে দ্রুত ওটা ঘোরাতে শুরু করল ও।

এরই মধ্যে অন্তত দুই ডযেন ঘুড়ি উড়তে শুরু করেছে আকাশে। যেন শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাগজের হাঙর। এক ঘন্টার ভেতর সংখ্যাটা দ্বিগুন হয়ে গেল। আকাশের গায়ে পাক খেয়ে চলল অসংখ্য লাল, নীল আর হলদে ঘুড়ি। ঠাণ্ডা একটা বাতাস বয়ে গেল আমার চুলের ভেতর দিয়ে। ঘুড়ি ওড়ানোর পক্ষে সম্পূর্ণ জুৎসই হাওয়া বইছে। ওপরে তোলার জন্যে বেগটা ঠিক আছে। ফলে গোত্তা খাওয়ানো অনেক সহজ হয়ে গেছে। আমার পাশে নাটাই ধরে আছে হাসান। এরই মধ্যে সুতোর ঘায়ে রক্তাক্ত হয়ে গেছে ওর হাত।

অচিরেই কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। পরাজিত ঘুড়ির প্রথম সারিটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। উল্কার মতো উজ্জ্বল ঢেউ-তোলা লেজ নিয়ে আকাশের বুক থেকে নেমে আসতে লাগল ওগুলো। নিচের মহল্লার উপর ঘুড়ি-ধাওয়াকারীদের জন্যে পুরস্কারের বৃষ্টি ঝরাতে লাগল। রাস্তার দিয়ে চিৎকার ছেড়ে ছুটে চলা ধাওয়াকারীদের গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। কে যেন চিৎকার করে দুই রাস্তা উজানে মারপিট শুরু হওয়ার খবর দিল।

চোরা-চোখে ছাদের উপর রহিম খানের সঙ্গে বসা বাবার দিকে চাইছিলাম। বাবা কী ভাবছে বোঝার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। আমার পক্ষে উল্লাস করছে? নাকি ওর একটা অংশ আমার ব্যর্থতা উপভোগ করছে? ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারটাই এমন: তোমার মন ঘুড়ির সঙ্গে উড়ে যায়।

এখন সর্বত্র নেমে আসতে শুরু করেছে ঘুড়িগুলো। আমি এখনও ওড়াচ্ছি। বারবার বাবার দিকে চলে যাচ্ছে আমার চোখ। উলের স্যোয়েটার পরে আছে ও। আমি এতক্ষণ টিকে থাকায় ও কি অবাক হয়েছে? *আকাশের দিকে চোখ না রাখলে বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না।* ঝট করে আকাশের দিকে নজর ফেলালাম। একটা লাল ঘুড়ি আমারটার দিকে এগিয়ে আসছে। ঠিক সময় মতোই ধরতে পেরেছিলাম। ওটার সঙ্গে খানিকক্ষণ লড়াই করলাম, সে অধৈর্য হয়ে উঠে আমাকে নিচের দিক থেকে কাটার চেষ্টা করতেই বোকাট্টা হয়ে গেল।

রাস্তার এমাথায় ওমাথায় ঘুড়ি-ধাওয়াকারীরা বিজয়ীর বেশে ফিরে আসছে। দখল পাওয়া ঘুড়ি মাথার উপর উঁচু করে ধরে রেখেছে। বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধবদের দেখাচ্ছে। কিন্তু ওরা সবাই জানত সেরাটি আসতে এখনও বাকি আছে। সবচেয়ে বড় পুরস্কারটা এখনও আকাশে ভাসছে। কুণ্ডলী পাকানো শাদা লেজঅলা একটা উজ্জ্বল হলদে ঘুড়ি বোকাট্টা করে দিলাম আমি। ফলে তর্জনীতে আরেকটা ক্ষত সৃষ্টি হল। হাতের তালু বেয়ে রক্তের

BanglaBook.org

ধারা নামতে শুরু করল। হাসানের হাতে সুতো তুলে দিয়ে রক্তটুকু শুষে নিলাম। জিন্সে মুছে ফেললাম হাতটা।

আরও এক ঘন্টার মধ্যে টিকে থাকা ঘুড়ির সংখ্যা আনুমানিক পঞ্চাশ থেকে এক ডযেনের ভেতর নেমে এল। আমিও তাদের ভেতর একজন। শেষ এক ডযেনের একজন হব আমি। জানতাম টুর্নামেন্টের এই অংশটুকু একটু দীর্ঘস্থায়ী হবে। কারণ এপর্যন্ত যারা টিকে গেছে তারা বেশ চালু। এরা হাসানের প্রিয় পুরোনো 'উপরে উঠে ডাইভ দাও'-এর মতো কৌশলের কাছে ধরা দেবে না।

সেদিন বিকেল তিনটা নাগাদ টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে এল। সূর্য মুখ লুকাল সেগুলোর আড়ালে। বড় হয়ে উঠল ছায়ারা। ছাদের উপরের দর্শকরা স্কার্ফ আর পুরু কোটে নিজেদের জড়িয়ে নিল। আমাদের সংখ্যা আধা ডযেনে নেমে এসেছে। আমি তখনও ওড়াচ্ছি। আমার পা ব্যথা করছিল। ঘাড় অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু প্রত্যেকটা ঘুড়ি হেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর আশা যেন চাগা দিয়ে উঠছিল—দেয়ালে একেকবার জমা হওয়া বরফের পল্লার মতো।

গত এক ঘন্টা ধরে নরক গুলজার করে চলা নীল ঘুড়িটার দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল আমার।

"কটা কেটেছে ওটা?" জিজ্ঞেস করলাম।

"এগারটা গুনেছি আমি," বলল হাসান।

"কার হতে পারে জান?"

জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে চিবুক উঁচু করল হাসান। এটা হাসানের একটা চিরপরিচিত ভঙ্গি। যার মানে ওর কোনও ধারণা নেই। নীল ঘুড়িটা একটা বিশাল পিঙ্গল ঘুড়িকে কেটে দুবার দীর্ঘ বৃত্তাকরে ঘুরল। দশ মিনিট পর আরও দুটো ঘুড়ি কেটে ধাওয়াকারীদের পঠিযে দিল ওগুলোর পেছনে।

আরও আধ ঘন্টাক পরে মাত্র চারটে ঘুড়ি অবশিষ্ট রইল। তখনও ওড়াচ্ছি আমি। মনে হচ্ছিল যেন আমার পক্ষে ভুল চাল দেওয়া বেশ কঠিন। যেন বাতাসের প্রত্যেকটা ঝাপ্টা আমার পক্ষে বইছিল। কখনও নিজেকে এভাবে পুরোপুরি নেতৃত্বে আছি বলে মনে হয়নি। এতটা ভাগ্যবান মনে হয়নি। নেশার মতো মনে হচ্ছিল। ছাদের দিকে তাকচ্ছিলাম না আর। আকাশের দিক থেকে চোখ সরানোর সাহস হচ্ছিল না। আমাকে মনোযোগ দিতে হবে। বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। আরও পনের মিনিট পার হয়ে গেল: এতক্ষণ যাকে হাস্যকর স্বপ্ন বলে হচ্ছিল সেটাই যেন এবার সেদিন সকালে বাস্তবে পরিণত হল। আমি আর

BanglaBoi.org

অন্য লোকটা— নীল ঘুড়িটা ছাড়া আর কেউ রইল না।

পরিবেশে উত্তেজনার ছাপ আমার হাতে ধরা রক্ত-রাঙা সুতোর মতোই টানটান। লোকেরা পা ঠুকছে, হাততালি দিচ্ছে, শিস বাজাচ্ছে, চিৎকার করে বলছে, *"বোবোরেশ! বোবোরেশ!"* কাটো ব্যাটাকে! কাটো ব্যাটাকে! বাবার কণ্ঠস্বর এতে আছে কিনা ভাবলাম আমি। জোরাল হয়ে উঠল গান। ছাদ আর খোলা দরজা পথে ধূমায়িত *মান্তু* আর *পাকোরার* সুবাস ভেসে আসছিল।

কিন্তু আমি কেবল শুনতে পাচ্ছিলাম–শুনতে বাধ্য করছিলাম–আমার মাথার ভেতরের রক্তের দুপদ্‌পানি। কেবল নীল ঘুড়িটাই দেখতে পাচ্ছিলাম। কেবল বিজয়ের গন্ধ পাচ্ছিলাম। মুক্তি। নিস্কৃতি। বাবার কথা যদি ভুল হয়, স্কুলের ওদের বলা কথা অনুযায়ী খোদা যদি সত্যিই থাকেন, তাহলে তিনি আমাকে জিতিয়ে দেবেন। জানতাম না অন্য লোকটা কিসের জন্যে খেলছিল। হয়ত স্রেফ নিজের অধিকার ফলাচ্ছিল। কিন্তু এটা ছিল আমার এমন একজনে পরিণত হবার একমাত্র সুযোগ যার দিকে তাকানো হলেও কেউ লক্ষ করেনি: যার কথা শোনা হলেও কান দেওয়া হয়নি। যদি খোদা বলে কেউ থাকেন, তিনি হাওয়াকে নির্দেশ দেবেন, আমার দিকে পাঠাবেন যাতে সুতোর একটা টানেই আমি আমার বেদনা থেকে মুক্তি পাব, আমার আকাঙ্ক্ষা দূর হবে। অনেক সহ্য করেছি। অনেক পূরণ এসেছি। তারপর সহসা আশা যেন স্থির বিশ্বাসে পরিণত হল। আমি জিতব। এটা কেবল সময়ের ব্যাপার।

তবে অনেক আগেই ঘটে গেল সেটা। বাতাসের একটা দমক আমার ঘুড়িটাকে ওপরে তুলে দিল। সুযোগটা নিলাম আমি। সুতো ছেড়ে টান দিলাম। নীল ঘুড়িটার মাথার উপর দিয়ে একটা চক্কর খাওয়ালাম। নিজের অবস্থান ধরে রাখলাম। নীল ঘুড়িটা বুঝে গিয়েছিল বিপদে পড়েছে। প্যাঁচ থেকে বের হয়ে যাবার মরিয়া প্রয়াস পাচ্ছিল ওটা। কিন্তু আমি ওটাকে ছাড়লাম না।

অবস্থান ধরে রাখলাম আমি। জনতা টের পেয়ে গেল যে সমাপ্তি এসে পড়েছে। 'ব্যাটাকে কাটো! ব্যাটাকে কাটো!' কোরাসের আওয়াজ আরও জোরাল হয়ে উঠেছে, যেন রোমানরা গ্লেডিয়েটরকে হত্যা করার জন্যে শ্লোগান দিচ্ছে, 'মারো!'

"আমির আগা, প্রায় হয়ে গেছে আমির! প্রায় হয়ে গেছে!" হাঁপাচ্ছিল হাসান।

তারপর এল সেই মুহূর্ত। চোখ বন্ধ করে সুতোয় ঢিল দিলাম আমি। বাতাসের ধাক্কায় সুতো সরে যেতেই আবার আঙুল কেটে গেল। এবং

BanglaBook.org

তারপর...জনতার চিৎকার করে ওঠার শব্দ শোনার প্রয়োজন ছিল না আমার, দেখারও কোনও প্রয়োজন ছিল না। চিৎকার করছিল হাসান। আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল ওর হাতজোড়া।

"সাবাস! সাবাস, আমির আগা!"

চোখ খুলে দেখলাম ঘুড়িটা দ্রুতবেগে ছুটন্ত গাড়ির খুলে পড়া চাকার মতো ভয়ঙ্করভাবে পাক খেয়ে নিচে নেমে আসছে। চোখ পিট পিট করে একটা কিছু বলার চেষ্টা করলাম। কিছুই বেরিয়ে এল না মুখ দিয়ে। সহসা যেন আকাশে ভেসে গেলাম আমি, আকাশ থেকে নিজের দিকে চেয়ে রইলাম। কালো চামড়ার কোট, লাল স্কার্ফ, রঙ-জ্বলা জিন্স। শীর্ণ ছোট একটা ছেলে, বার বছর বয়সের পক্ষে এক মাথা খাট। ওর কাঁধজোড়া সংকীর্ণ, ম্লান হ্যাযেল চোখের চারপাশে গাঢ় বৃত্তের চাপ। ওর বাদামী চুল এলামেলো করে দিচ্ছে হালকা বাতাস। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমরা।

তারপর চিৎকার শুরু করে দিলাম। সব কিছু রঙিন আর সরব হয়ে উঠল। সবকিছু সজীব, অনেক ভালো। মুক্ত হাতটা হাসানের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। প্রবল বেগে লাফালাফি করছিলাম আমরা। হাসছি। কাঁদছি। "তুমি জিতেছ, আমির আগা! তুমি জিতেছ!"

"আমরা জিতেছি! আমরা জিতেছি!" কেবল এটুকুই বলতে পারছিলাম আমি। এটা আসলে ঘটছে না। একটু পরেই চোখ পিট পিট করে উঠবে আমার। একটা চমৎকার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠব। বিছানা থেকে নেমে আসব। নিচের কিচেনে এসে নাশতা করব, হাসান ছাড়া আর কেউ থাকবে না কথা বলার সঙ্গী। পোশাক পরব। বাবার অপেক্ষায় থাকব। হাল ছেড়ে দেব। আবার পুরোনো জীবনে ফিরে যাব। তারপর বাবাকে ছাদের উপর দেখতে পেলাম। একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে দুহাতে তালি বাজাচ্ছে। হৈ হৈ করে চিৎকার করছে। আর সেটাই ছিল আমার বার বছরের জীবনে শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। ছাদর উপর বাবাকে দেখা। অবশেষে আমাকে নিয়ে গর্বিত।

কিন্তু এখন একটা কিছু করছে ও। তাগিদ দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত দিয়ে ইশারা করছে। অবশেষে বুঝতে পারলাম। "হাসান, আমরা–"

"জানি," বলল ও। আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হল। "*ইনশাল্লাহ*, পরে উৎসব করব আমরা। এখনই ঘুড়িটা তোমাকে এনে দিতে যাচ্ছি আমি," বলল ও। নাটাইটা নামিয়ে রেখে ছুট লাগাল। ওর সবুজ *চাপানের* হেম পেছনে গাড়াগড়ি খেতে লাগল।

"হাসান!" চিৎকার করে ডাকলাম ওকে। "ওটা নিয়েই ফিরে এসো!"

রাস্তার বাঁক ঘুরছিল ও, ওর পায়ের রাবারের বুটের ঘায়ে তুষার উড়ছে। একটু থেমে ঘুরে দাঁড়াল ও, হাতজোড়া মুখের কাছে চোঙের মতো করে ধরে বলে উঠল, "তোমার জন্যে হাজার বার!" তারপর হাসান সুলভ একটা হাসি দিয়ে হারিয়ে গেল বাঁকের ওপাশে। শেষ বার ওকে এমন নির্মল হাসি দিতে দেখেছিলাম বিশ বছর পরে একটা ম্লান হয়ে আসা পোলারয়েড ফটোগ্রাফে।

লোকজন অভিনন্দন জানাতে ছুটে আসতে লাগল। আমি আমার ঘুড়িটা টেনে কাছে নিয়ে আসতে শুরু করলাম। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ধন্যবাদ জানালাম। আমি তখন নায়ক। অনেকগুলো হাত আমার পিঠে চাপড় মারছে, মাথার চুল এলামেলো করে দিচ্ছে। সুতো টানতে টানতে সবার হাসির উত্তর দিতে লাগলাম। কিন্তু আমার মন তখন পড়ে আছে সেই নীল ঘুড়িটার দিকে।

অবশেষে নিজের ঘুড়িটা হাতে এলো। আমার পায়ের কাছে নাটাইয়ের চারপাশে জমা হওয়া সুতো পেঁচিয়ে ফেললাম। আরও কয়েক জনের সাথে হাত মেলালাম। বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম তারপর। রট আয়রন গেইটের কাছে পৌঁছে দেখলাম অন্যপাশে অপেক্ষা করে আছে আলি। গরাদের ওপাশ থেকে হাত বাড়িয়ে দিল ও। "অভিনন্দন," বলল।

ওকে আমার ঘুড়ি আর নাটাই দিয়ে হাত মেলালাম। "*তাশাকোর*, অলি জান।"

"সারাক্ষণ তোমার জন্যে দোয়া করছিলাম।"

"দোয়া চালিয়ে যাও তবে। এখনও আমাদের শেষ হয়নি।"

জলদি করে ফের রাস্তায় ফিরে এলাম আমি। বাবার কথা আলিকে জিজ্ঞেস করিনি। এখনই ওকে দেখতে চাইছি না। মাথার ভেতর সবকিছু ঠিক করে রেখেছি আমি: জাঁকাল নায়কোচিত অবির্ভাব হবে আমার। আমার রক্তাক্ত হাতে থাকবে বিজয়ীর ট্রফি। সবার মাথা ঘুরে যাবে। জমে যাবে সবার দৃষ্টি। রুস্তম আর সোহরাব একে অপরকে জরিপ করছে। নীরবতার একটা নাটকীয় মুহূর্ত। তারপর বুড়ো যোদ্ধা তরুণের দিকে এগিয়ে যাবে, তার তাকতের তারিফ করবে। প্রতিশোধ, মুক্তি, নিষ্কৃতি। কিন্তু তারপর? বেশ...অবশ্যই এরপরে অবিরত সুখ। এছাড়া আর কী?

ওয়াযির আকবার খানের রাস্তাগুলো নাম্বার দেওয়া। গরাদের মতো একটা অন্যটার সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত। তখন একটা নতুন মহল্লা ছিল এটা। অনেকগুলো খালি জায়গা পড়েছিল। আর আটফুট উঁচু দেয়াল ঘেরা চৌহদ্দীর ভেতর ছিল অসংখ্য অসমাপ্ত বাড়ি। প্রত্যেকটা রাস্তার এমাথা থেকে

BanglaBook.org

ওমাথা পর্যন্ত দৌড়ালাম আমি। হাসানকে খুঁজতে লাগলাম। সব জায়গায় লোকজন চেয়ার গোটাতে ব্যস্ত। সারাদিনের পার্টি শেষে খাবার আর থালাবাসন গোছাচ্ছে। কেউ কেউ তখনও ছাদে বসে, চিৎকার করে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

আমাদের রাস্তার নাম্বার ছিল চার। ওমরকে দেখতে পেলাম আমি। বাবার এক বন্ধু এক এঞ্জিনিয়ারের ছেলে। নিজেদের বাসার সামনে ভাইয়ের সঙ্গে একটা রাবারে বল নিয়ে খেলছিল। ওমর বেশ ভালো ছেলে ছিল। ফোর্থ গ্রেডে আমরা ক্লাসমেট ছিলাম। একবার আমাকে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়েছিল ও। এসব কলম কার্ট্রিজ দিয়ে রিফিল করতে হয়।

"শুনলাম তুমি জিতেছ, আমির," বলল সে, "অভিনন্দন।"

"ধন্যবাদ। হাসানকে দেখেছ?"

"তোমাদের হাযারা?"

মাথা দোলালাম।

বলটা ভাইয়ের হাতে দিল ওমর। "শুনেছি সে নাকি দারুণ ঘুড়ি-ধাওয়াকারী।" ভাই ওকে আবার বল ফিরিয়ে দিল। ওটা লুফে নিল ওমর। লোফালুফি করতে লাগল। "যদিও, সব সময় আমি ভেবেছি কীভাবে সামাল দেয় সে। মানে ওর চোখজোড়া এত ছোট, দেখতে পায় কীভাবে?"

হেসে উঠল ওর ভাই। ছোট অট্টহাসি। তারপর বলটা চাইল। ওমর উপেক্ষা করল তাকে।

"তুমি ওকে দেখেছ?"

কাঁধের উপর দিয়ে একটা আঙুল দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইঙ্গিত করল ওমর। "খানিকক্ষণ আগে ওদিকে যেতে দেখেছি ওকে।"

"ধন্যবাদ।" বলেই সরে এলাম আমি।

আমি যখন বাজার এলাকায় পৌঁছলাম, ততক্ষণে সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে, গোধূলির রঙে আকাশ গোলাপি আর পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করেছে। কয়েক ব্লক দূরে, হাজি ইয়াগুব মসজিদে মোল্লা *আযান* দিতে শুরু করল। বিশ্বাসীদের জায়নামাজ বিছিয়ে মাথা নোয়ানোর আহবান। হাসান কখনও কোনও *নামাজ* বাদ দেয় না। এমনকি আমরা খেলার সময়ও নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেত ও। উঠোনের কুয়ো থেকে পানি তুলে কুঁড়ে ঘরে অদৃশ্য হয়ে যেত। কয়েক মিনিট পর হাসিমুখে আবার উদয় হত, আমাকে দেয়ালে হেলান দেওয়া বা কোনও গাছে বসে থাকা অবস্থায় আবিষ্কার করত। আজ রাতে *নামায* খোয়াতে যাচ্ছে ও। তবে সেটা আমার জন্যে।

BanglaBook.org

দ্রুত ফাঁকা হয়ে আসছিল বাজার। বণিকের দল দিনের মতো তাদের দর কষাকষিতে ক্ষান্ত দিচ্ছে। ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ানো খুপরিগুলোর মাঝখান দিয়ে দৌড়ে গেলাম আমি। এখানে জবাই-করা টাটকা মুরগী যেমন পাওয়া যায় তেমনি পাশের দোকান থেকে অনায়াসে একটা ক্যালকুলেটরও কেনা যাবে। পাতলা হয়ে আসা ভীড়ের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগলাম আমি। অসংখ্য তালি দেওয়া জামাকাপড় পরা খোঁড়া ভিখেরির দল; কাঁধের উপর ফেলে রাখা চাদর নিয়ে ফেরিঅলার দল। কাপড়ের বিক্রেতা আর কসাইরা দিনের মতো দোকানের ঝাঁপি নামাচ্ছে। হাসানের কোনও চিহ্ন দেখলাম না।

একটা শুকনো ফলের দোকানের সামনে থামলাম আমি। বুড়ো দোকানির কাছে হাসানের বর্ণনা দিলাম। লোকটা খচ্চরের পিঠে পাইনের বীজ আর রেইজিন তুলছিল।

জবাব দেওয়ার আগে দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল সে। "হয়ত দেখেছি।"

"কোন দিকে গেছে ও?"

আমার আপাদমস্তক মাপল সে। "তোমার মতো একটা ছেলে দিনের এমন একটা সময় একটা হাযারাকে খুঁজছ কেন?" আমার চামড়ার কোট আর জিন্সের উপর সমীহের দৃষ্টিতে চোখ বোলাল সে। *কাউবয় প্যান্ট*-বলতাম আমরা। আফগানিস্তানে সেকেন্ড হ্যান্ড না হলে আমেরিকান কোনও কিছুর মালিকানা থাকার অর্থ ছিল প্রাচুর্যের চিহ্ন।

"ওকে আমার খুঁজে বের করা দরকার, আগা।"

"সে তোমার কী হয়?" জিজ্ঞেস করল সে। প্রশ্নটার মানে ধরতে পারলাম না। কিন্তু নিজেকে বারবার বোঝাতে লাগলাম, অধৈর্য হয়ে ওকে দিয়ে কিছু বলানো যাবে না।

"আমাদের কাজের লোক ও," বললাম।

বুড়ো লোকটা মরিচের মতো ধূসর একজোড়া ভুরু নাচাল। "তাই? ভাগ্যবান হাযারা। মনিব তার জন্যে ভাবে। ওর বাবার উচিত তোমদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা। চোখের ভুরু দিয়ে ময়লা ঝাড়ু দেওয়া।"

"তুমি আমাকে জবাব দেবে কি দেবে না?"

খচ্চরের পিঠে একটা হাত তুলে দিল সে। দক্ষিণে ইঙ্গিত করল। "মনে হয় তোমার বর্ণনা দেওয়া ছেলেটাকে ওই দিকে দৌড়ে যেতে দেখেছি। ওর হাতে একটা ঘুড়ি ছিল। একটা নীল ঘুড়ি?"

"ও পেরেছে?" বলে উঠলাম আমি। *তোমার জন্যে হাজার বার*, কথা

BanglaBook.org

দিয়েছিল ও। সাচ্চা ছেলে হাসান। সাচ্চা, বিশ্বস্ত হাসান। কথা রেখেছে ও। শেষ ঘুড়িটা আমাকে এনে দিয়েছে।

"অবশ্য, এতক্ষণে বোধ হয় ওকে ওরা ধরে ফেলেছে," বলল বুড়ো বণিক। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে আরেক বাক্স মাল তুলে দিল তার খচ্চরের পিঠে।

"কারা?"

"অন্য ছেলেরা," বলল সে, "ওকে ধাওয়া করছিল যারা। তোমার মতো জামাকাপড় ছিল ওদের পরনে।" আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। "নাও, এবার ভাগো। আমার *নামাযে* দেরি করিয়ে দিচ্ছ।"

কিন্তু ততক্ষণে গলিপথ দিয়ে ছুটতে শুরু করেছি আমি।

পরের কয়েকটা মিনিট বাজার এলাকা খামোকাই চষে বেড়ালাম। হয়ত বুড়ো সওদাগরের চোখ তার সঙ্গে বেঈমানি করে থাকবে। হয়ত খালি নীল ঘুড়িটাই দেখেছে সে। ওই ঘুড়িটা হাতে পাবার চিন্তায়...প্রত্যেকটা গলিতে, প্রত্যেকটা দোকানে নজর চালাচ্ছি আমি। হাসানের কোনও চিহ্ন নেই।

হাসানের খোঁজ পাবার আগেই আঁধার ঘনিয়ে আসবে বলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে শুরু করেছিলাম আমি। এমন সময় সামনে গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটা নির্জন কাদাময় রাস্তায় পৌঁছলাম আমি। বাজারকে দুভাগ করে মূল রাস্তার সমান্তরালে চলে গেছে রাস্তাটা। একটা আবর্জনাভরা পথে উঠে এসে কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে আগে বাড়লাম। প্রতি পায়ে কাদায় শব্দ তুলছে আমার বুট। আমার সামনে শাদা কুয়াশার মতো কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। নিঃশ্বাস। সংকীর্ণ পথটা একপাশে একটা তুষারভরা নালা সমান্তরালে চলে গেছে। বসন্তকালে হয়ত এই নালা দিয়ে পানি বয়ে যায়। আমার অন্যপাশে তুষারের ভারে ন্যুজ সাইপ্রেস গাছের সারি, চ্যাপ্টা ছাদের মাটির ঘরের মাঝে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে-বেশীর ভাগই কাদার ঘর-বিভিন্ন সংকীর্ণ গলিপথের কারণে বিচ্ছিন্ন।

আবার গলার আওয়াজ কানে এল। একটা গলি থেকে আসছে। গলির মুখের কাছে থামলাম আমি। দম আটকে রেখেছি। কোণ দিয়ে উঁকি দিলাম।

বেপরোয়া একটা ভঙ্গিতে কানা গলির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে হাসান। হাতের মুঠি পাকানো, পাজোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে। ওর পেছনে আবর্জনা আর ময়লার স্তূপের উপর পড়ে আছে নীল ঘুড়িটা। বাবার হৃদয়ের কাছে পৌঁছানোর চাবিকাঠি।

গলি থেকে হাসানের বেরুনোর পথ আগলে রেখেছে তিনটা ছেলে।

banglabook.org

দাউদ খানের অভ্যুত্থানের পর সেইদিন টিলার উপরে দেখা সেই তিনজনই। সেদিন হাসান ওর গুলতি দিয়ে আমাদের রক্ষা করেছিল। একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়ালি। আরেক পাশে কামাল। মাঝখানে আসেফ। মনে হল আমার গোটা শরীর যেন কুকড়ে গেছে। আমার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। আসেফকে সহজ, আত্মবিশ্বাসী বলে মনে হলো। ব্রাস নাকলস ঘোরাচ্ছিল সে। বাকি দুজন আসেফ আর হাসানের দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বারবার এক পায়ের উপর থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভার বদল করছিল। যেন ওরা এমন কোনও জানোয়ারকে কোণঠাসা করেছে একমাত্র আসেফই যেটাকে পোষ মানাতে পারবে।

"তোমার গুলতিটা কই, হাযারা?" হাতের উপর ব্রাস নাকলস ঘোরাতে ঘোরোতে জিজ্ঞেস করল আসেফ। "কী বলেছিলে তুমি? ওরা আমাকে কানা আসেফ ডাকবে। খুবই চালাকী দেখিয়েছ। সত্যিই ভালো চালাকি। সঙ্গে লুকানো অস্ত্র থাকলে অবশ্য চালাকি করা খুবই সহজ।"

বুঝতে পারলাম আমি তখনও শ্বাস ফেলিনি। আস্তে করে দম ফেললাম। নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে। নিজেকে অসাড় মনে হচ্ছিল। আমি যার সঙ্গে বেড়ে উঠেছি, যার বিকৃত চেহারা ছিল আমার প্রথম স্মৃতি সেই ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম ওদের।

"কিন্তু আজকের দিনটা তোমার জন্যে ভালো, হাযারা," বলল আসেফ। আমার দিকে পেছন ফিরে আছে সে। কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি হাসছে। "আমি মাফ করে দেওয়ার মুডে আছি। তোমরা কী বলো, ছেলেরা?"

"এ তো বিরাট দয়ার ব্যাপার," হড়বড়িয়ে বলে উঠল কামাল। "বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে সেদিন যেমন খারাপ ব্যবহার করেছে সে।" আসেফের মতো ভঙ্গি করার প্রয়াস পাচ্ছিল সে, কিন্তু তার কণ্ঠে কম্পন টের পাওয়া যাচ্ছিল। তারপর বুঝতে পারলাম: আসলে হাসানকে ভয় পাচ্ছে না সে। মোটেই না। ভয় পাচ্ছে কারণ আসেফ কী করতে যাচ্ছে তার কোনও ধারণাই ছিল না তার।

হাত দিয়ে নাকচ করার ভঙ্গি করল আসেফ। "*বাকশিদা।* মাফ করে দিলাম। বাত খালাস।"

একটু নিচু হল তার কণ্ঠস্বর। "অবশ্য জগতে মাগনা বলে কিছু নেই। আমার মাফও একটা কিছুর বিনিময়ে মিলবে।"

"খুবই ন্যায্য কথা," বলল কামাল।

"মাগনা বলে কিছু নেই,' যোগ করল ওয়ালি।

BanglaBook.org

"তুমি আসলেই ভাগ্যবান হাযারা," বলল আসেফ। হাসানের দিকে এক পা এগিয়ে গেল সে। "কারণ আজ খালি নীল ঘুড়িটা খোয়াতে হবে তোমাকে। ন্যায্য বিচার, কী বলো, ছেলেরা?"

"তার চেয়েও বেশী," বলল কামাল।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এমনকি সেখান থেকেও হাসানের চোখে ফুটে ওঠা আতঙ্ক টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু মাথা নাড়ল ও। "আমির আগা টুর্নামেন্ট জিতেছে। আমি ওকে এই ঘুড়িটা এনে দিতে দৌড়েছি। আমি ঠিকমতোই দৌড়েছি। এটা ওর ঘুড়ি।"

"পোষ মানা হাযারা। কুকুরের মতো অনুগত," বলল আসেফ।

"কিন্তু নিজেকে ওর জন্যে কোরবানি করার আগে একথাটা একটু ভেবে দেখ: সেও কি তোমার জন্যে একই কাজ করবে? কখনও কি ভেবে দেখেছ কেন বাড়িতে মেহমান থাকলে সে তোমাকে খেলায় নেয় না? কেন কেবল আশপাশে কেউ না থাকলেই খেলে? আমি কারণটা বলছি তোমাকে, হাযারা। কারণ ওর কাছে তুমি একটা কুৎসিত পোষা জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নও। যখন ক্লান্ত বোধ করে তখন খেলার মতো একটা কিছু। রাগ হলে যাতে লাথি হাঁকাতে পারে এমন কিছু। নিজেকে খামোকো চোখ ঠাউরিয়ো না। বিশেষ কিছু মনে করে বসো না নিজেকে।"

"আমি আর আমির আগা বন্ধু," হাসান বলল। লাল হয়ে উঠেছিল ওর চেহারা।

"বন্ধু?" হাসতে হাসতে বলল আসেফ। "অরে বোকারাম, কোনও একদিন এই কল্পনা থেকে বের হয়ে আসবে তুমি, বুঝবে কেমন ভালো বন্ধু সে। এবার, *ব্যস!* বাজে আলাপ অনেক হয়েছে। ঘুড়িটা আমাদের দিয়ে দাও।"

সামনে উবু হয়ে একটা পাথর তুলে নিল হাসান।

কুকড়ে গেল আসেফ। একপা পিছিয়ে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। "শেষ সুযোগ দিচ্ছি, হাযারা।"

জবাবে পাথর ধরে রাখা হাতটা প্রস্তুত করে ফেলল হাসান।

"তোমার যেমন ইচ্ছে।" শীতের কোট খুলে ফেলল আসেফ। আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ভাঁজ করল ওটা। দেয়ালের উপর রাখল।

মুখ খুলে একটা কিছু বলে ফেলেছিলাম প্রায়। প্রায়। বললে হয়ত আমার বাকি জীবন অন্য দিকে বাঁক নিতে পারত। কিন্তু বলিনি। স্রেফ তাকিয়ে থেকেছি। অসাড়।

BanglaBook.org

হাতের ইশারা করল আসেফ। বাকি দুই ছেলে আলাদা হয়ে গেল। একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করল ওরা। গলিপথে ফাঁদে ফেলে দিল হাসানকে।

"মত বদলেছি আমি," বলল আসেফ। "ঘুড়িটা তোমাকে রাখতে দিচ্ছি, হাযারা। ওটা তোমাকে রাখতে দেব যাতে আমি যা করতে যাচ্ছি সেটা সারা জীবন তোমার মনে থাকে।"

পরক্ষণেই দৌড়ে গেল সে। পাথরটা ছুড়ে মারল হাসান। আসেফের কপালে লাগল ওটা। আর্তনাদ ছেড়ে হাসানের উপর ঝাপিয়ে পড়ল আসেফ। মাটিতে ফেলে দিল ওকে। ওয়ালি আর কামাল তাকে অনুসরণ করল।

নিজের হাতের উপর আঘাত করলাম আমি। চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

একটা স্মৃতি:

তুমি জানো হাসান আর তুমি একই মায়ের বুকের দুধ খেয়েছ? জান, আমির আগা? ওর নাম ছিল সাকিনা। ও ছিল বামিয়ান থেকে আসা ফর্শা নীল চোখের এক হাযারা মহিলা। তোমাকে পুরোনো দিনের বিয়ের গান গেয়ে শোনাত সে। লোকে বলে যারা একই মায়ের দুধ খায় তাদের মধ্যে এক ধরনের ভাইসুলভ সম্পর্ক তৈরি হয়। সেটা কি জানতে তুমি?

একটা স্মৃতি:

"এক বাচ্চার জন্যে এক *রুপিয়া*। মাত্র এক *রুপিয়া* করে। তাহলেই আমি সত্যির পর্দা তুলে ধরব।" *একটা কাদার দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে আছে বুড়ো লোকটা। গভীর জোড়া জ্বালামুখে বসানো গলিত রুপার মতো লাগছে তার দৃষ্টিহীন চোখজোড়া। ছড়ির উপর ভর দিয়ে চুপসানো গালের অমসৃণ চামড়ার উপর একটা গ্রন্থিল হাত বোলাল গণক লোকটা। তারপর আমাদের সামনে পেয়ালার মতো ধরল।* "সত্যি কথা বলার জন্যে এক রুপিয়া, নিশ্চয়ই খুব বেশী চাইনি?" *ত্বক সর্বস্ব হাতে একটা কয়েন ফেলল হাসান। আমিও আমারটা ফেললাম।* "পরম করুণাময় আল্লাহর নামে, যিনি সবচেয়ে দয়াময়, করুণাময়," *ফিসফিস করে বলল বুড়ো গণক। আগে হাসানের হাত ধরল সে। শিঙের মতো একটা নখ দিয়ে তালুর উপর আঁচড় কাটল। বৃত্তাকারে, বারবার। তারপর আঙুলগুলো হাসানের মুখের কাছে তুলে এনে একধরনের শুকনো শব্দ তুলে ওর গাল, কানের দুপাশের বাঁকে বোলাতে শুরু করল। তার আঙুলের কড়া পড়া ডগাগুলো হাসানের চোখের উপর বুলিয়ে যাচ্ছে। ওখানে থামল হাতটা। একটু ক্ষণ অপেক্ষা করল। বুড়োর চেহারায় একটা ছায়া ঘনিয়ে এল। চোখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর*

BanglaBook.org

হাসান। হাসানের হাত তুলে নিয়ে ওর তালুর উপর টাকাটা ফিরিয়ে দিল বুড়ো। আমার দিকে ফিরল সে। "তোমার কী অবস্থা, ছোট বন্ধু?" *বলল সে। দেয়ালের অপর পাশে একটা মোরগ ডেকে উঠল। বুড়ো আমার হাতের দিকে হাত বাড়াল, কিন্তু হাত সরিয়ে নিলাম আমি।*

একটা স্বপ্ন:

তুষার ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছি আমি। হাওয়া মাতম তুলছে। তুষারের কুচি ছুঁড়ে মারছে আমার চোখে। টলমল শাদা আস্তরণের উপর দিয়ে এলোমেলো পায়ে এগিয়ে চলেছি আমি। সাহায্য চেয়ে কাঁদছি, কিন্তু বাতাস আমার চিৎকার চাপা দিয়ে দিচ্ছে। তুষারের উপর লুটিয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলাম আমি। শাদা বিস্তারে হারিয়ে গেছি। কানের ভেতর বিলাপ করছে হাওয়া। এখন একটা ভূত হয়ে গেছি, ভাবছি, পায়ের ছাপবিহীন ভূত। *আবার চিৎকার করে উঠলাম আমি। পায়ের ছাপের মতোই মিলিয়ে যাচ্ছে সব আশা। কিন্তু এবার একটা চাপা জবাব কানে এল। চোখের উপর হাতের আড়াল টেনে উঠে বসলাম। তুষারের দোলায়মান পর্দার ওপাশে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল আমার চোখে। রঙের একটা ঝলক। পরিচিত একটা অবয়ব চেহারা পেল। আমার দিকে এগিয়ে এল একটা হাত। তালুর উপর গভীর সমান্তরাল ক্ষতচিহ্ন দেখতে পেলাম। রক্ত ঝরে পড়ছে। রাঙিয়ে তুলছে তুষার। হাতটা ধরলাম। হঠাৎ সব তুষার হারিয়ে গেল। আপেলের মতো সবুজ ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। আমাদের মাথার উপর দিয়ে পেঁজা তুলার মতো মেঘ ভেসে যাচ্ছে। উপরে তাকিয়ে দেখলাম পরিষ্কার আকাশ ঘুড়িতে ভরে আছে। হলুদ, সবুজ, লাল, কমলা। বিকেলের আলোয় ঝলমল করছে।*

পরিত্যক্ত জিনিস আর আর্বজনায় ভরে আছে গলিপথ। পুরোনো বাইসাইকেল, লেবেল খসে পড়া বোতল, ছেঁড়াফাঁটা ম্যাগাজিন, হলদে হয়ে আসা নিউজ পেপার, ইত্যকার নানা জিনিস ইঁট আর সিমেন্টের স্ল্যাবের স্তূপে ছড়িয়ে আছে। একপাশে বিরাট একটা ফুটো নিয়ে একটা কাস্ট আয়রন স্টোভ দেয়ালের উপর ঠেস দেওয়া অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু আবর্জনার উপর পড়ে থাকা দুটো জিনিসের উপর থেকে নজর সরাতে পারছিলাম না আমি: একটা হল দেয়ালের গায়ে কাস্ট আয়রন স্টোভের পাশে পড়ে থাকা নীল ঘুড়ি আর অন্যটা হল ক্ষয়ে যাওয়া ইঁটের স্তূপে পড়ে থাকা হাসানের বাদামী কর্ড্যুরয় প্যান্ট।

"আমি জানি না," বলছিল ওয়ালি, 'বাবা বলে এটা নাকি গুনাহর

BanglaBook.org

কাজ," অনিশ্চিত, উত্তেজিত শোনাল তার কণ্ঠস্বর, পাশাপাশি শঙ্কিতও। জমিনে বুক লেপ্টে শুয়ে আছে হাসান। ওয়ালি আর কামাল ওর একটা করে হাত চেপে ধরে রেখেছে। কনুইয়ের কাছে বাঁকানো, ফলে হাসানের হাতজোড়া ওর পিঠের উপর লেপ্টে আছে। ওর উপর দাঁড়িয়ে আছে আসেফ। তার স্নোবুটের গোড়ালি হাসানের পিঠের উপর পিষছে।

"তোমার বাবা টেরই পাবে না," বলল আসেফ। "আর অসভ্য গাধাদের শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে গুনাহর কিছু নেই।"

"জানি না," বিড়বিড় করে বলল ওয়ালি।

"তোমার যা ইচ্ছে ভাবো," বলল আসেফ। কামালের দিকে ফিরল সে। "তোমার কী মত?"

"আ..আমি..মানে..."

"এটাতো একটা হাযারা মাত্র," বলল আসেফ। "আমি খালি চাইছি তোমরা দুই ড়রপুক ওকে শক্ত করে চেপে ধরে রাখো। এটা তো অন্তত পারবে নাকি?"

মাথা দোলাল ওয়ালি আর কামাল। স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল ওদের চেহারায়।

হাসানের পাশে বসে ওর কোমরে হাত রাখল আসেফ। ওর নগ্ন পাছাটা উঁচু করে ধরল। হাসানের পিঠের উপর একটা হাত রেখে আরেক হাতে বেল্ট বাকল খুলে ফেলল। জিন্সের যিপ খুলল। টেনে আন্ডাওয়্যার নামাল। হাসানের পেছনে অবস্থান নিল সে। হাসানের চেহারায় হালছাড়া একটা অনুভূতির ছাপ দেখতে পেলাম। আগেও এই অভিব্যক্তি দেখেছি। এটা একটা ভেড়ার অভিব্যক্তি।

আগামীকাল মুসলিম ক্যালেন্ডারের শেষ মাস জুল-হাজ্জ্ব মাসের দশম দিন। *ঈদ-উল-আযহা বা তিন দিন ব্যাপী কোরবানীর ঈদের প্রথম দিন। আফগানরা এনামেই ডাকে। পয়গম্বর ইব্রহিম কীভাবে খোদার নামে নিজের ছেলেকে প্রায় উৎসর্গ করে বসেছিলেন সেই দিনের স্মরণে এই দিন উদযাপিত হয়ে। বাবা এবছর আবার নিজে ভেড়া পছন্দ করেছে। বাঁকানো কালো কানঅলা একটা পাউডারের মতো শাদা জানোয়ার।*

আমরা সবাই পেছনের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি: হাসান, আলি, বাবা আর আমি। মোল্লাহ দোয়া পড়ে দাড়িতে হাত বোলাল। বিড়বিড় করে চাপা কণ্ঠে বাবা বলল, শেষ করো। মাংস হালাল করার আচারের অন্তহীন দোয়াদরূদ

BanglaBook.org

পড়তে দেখে বিরক্ত বোধ করছিল সে। এই ঈদের পেছনের কাহিনী নিয়ে বাবা টিটকারি মারে। যেমন ধর্মীয় সব কিছু নিয়েই তার মশকরা। তবে ঈদ-ই-কোরবানীর ঐতিহ্যকে সে শ্রদ্ধা করে। রেওয়াজ হচ্ছে মাংসকে তিন ভাগ করা। একভাগ পরিবারের জন্যে, এক ভাগ বন্ধুবান্ধবদের জন্যে আর বাকি একভাগ গরীবদের জন্যে। প্রতি বছর বাবা পুরো মাংসই গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়। বড়লোকরা এমনিতেই আনেক মোটা হয়ে গেছে, বলে সে।

দোয়া পাঠ শেষ করল মোল্লাহ। আমীন। লম্বাফলা অলা কিচেন নাইফটা তুলে নিল সে। রেওয়াজ হচ্ছে ভেড়াটা যেন ছুরি দেখতে না পায়। জানোয়ারটাকে একটা চিনির দলা খাওয়াচ্ছে সে। এটা আরেকটা রেওয়াজ–মৃত্যুকে মধুর করে তোলার। ভেড়াটা পা ছোঁড়াছুঁড়ি করলেও তেমন একটা বাড়াবাড়ি করল না। সে ভেড়াটার গলা দক্ষ হাতের একটা পোঁচে দুভাগ করার ঠিক আগ মুহূর্তে ওটার চোখজোড়া দেখতে পেলাম। সেখানে এমন এক দৃষ্টি ছিল আমাকে যা পরের কয়েক সপ্তাহ স্বপ্নের ভেতর তাড়া করে ফিরেছে। জানি না কেন এই বার্ষিক আচার আমাদের পেছনের উঠোনে দেখি আমি। আমার দুঃস্বপ্ন ঘাসের উপর থেকে রক্তের দাগ মুছে যাবার অনেক পড়েও অব্যহত থাকে। কিন্তু সব সময়ই দেখি আমি। জানোয়ারের চোখের ওই মেনে নেওয়ার দৃষ্টি দেখার জন্যে চেয়ে থাকি। অদ্ভুতভাবে আমার মনে হয় পশুটা যেন বুঝতে পারে। মনে হয় জানোয়ারটা যেন কোনও উচ্চমার্গীয় কারণে প্রাণ খোয়ানোর আসন্নতা বুঝতে পারে। এটাই সেই অভিব্যক্তি...

আর তাকালাম না আমি। গলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। আমার কব্জি বেয়ে উষ্ণ কি যেন গড়িয়ে পড়ছিল। জোখ পিটপিট করে তাকালাম। দেখি তখনও নিজের হাত কামড়াচ্ছি। এত জোরে যে ব্রাস নাকল হলেও রক্ত বের হয়ে আসত। ভিন্ন একটা কিছু বুঝতে পারলাম আমি। আমি কাঁদছি। মোড়ের ঠিক ওপাশ থেকে আসেফের দ্রুত ছন্দোময় গোঙানি শুনতে পাচ্ছিলাম।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার শেষ একটা সুযোগ ছিল আমার জন্যে। আমি কী হতে যাচ্ছি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত একটা সুযোগ। আমি ওই গলিপথে ঢুকে হাসানের পক্ষে দাঁড়াতে পারতাম–অতীতের সেই সময়গুলোতে যেভাবে আমার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল ও। আমার যাই হোক না কেন সেটা মাথা পেতে নিতে পারতাম। অথবা পালাতে পারতাম।

শেষমেষ পালালাম আমি।

কাপুরুষ বলেই আমি পালিয়েছি। আসেফকে ভয় পেয়েছি। ভয় পেয়েছি

BanglaBook.org

সে আমার ক্ষতি করতে পারে ভেবে। আমি আঘাত পাবার ভয় পেয়েছি। গলি থেকে, হাসানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার সময় ঠিক এই কথাই নিজেকে বুঝিয়েছি। আসলে কাপুরুষ হতে চেয়েছি আমি; কারণ বিকল্প, আমার পালানোর আসল কারণ ছিল: আসফের কথাই ঠিক: এই জগতে কোনও কিছু বিনে পয়সায় মেলে না। হয়ত হাসানই ছিল আমার মেটানো দাম। বাবার মন জয় করার জন্যে আমার উৎসর্গের প্রয়োজনীয় ভেড়া। সেটা কী ন্যায্য মূল্য ছিল? আমি সেটা দূর করে দিতে পারার আগেই জবাবটা আমার চেতন মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল: ও একটা হাযারা বই তো নয়?

যে পথে এসেছিলাম সেপথেই দৌড়ে চলে এলাম। এক দৌড়ে জনশূন্য বাজারে ছুটে এলাম। একটা খুপরির উপর ঝাপিয়ে পড়ে তালা ঝোলানো দরজার উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম, ঘেমে নেয়ে উঠেছি। ভাবছিলাম সবকিছু যদি অন্য ভাবে শেষ হত।

আনুমানিক মিনিট পনের পরে কণ্ঠস্বর আর ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ কানে এল আমার। খুপরির আড়ালে গা ঢাকা দিলাম। দেখলাম আসেফ আর তার দুই স্যাঙাৎ দৌড়ে যাচ্ছে। বিরান পথে যাবার সময় হাসছে । আরও কয়েকটা মিনিট জোর করে অপেক্ষা করলাম। তারপর তুষারভরা নালার পাশের আবর্জনাময় পথ ধরে আগে বাড়লাম। ক্ষীণ হয়ে আসা আলোয় চোখ কুঁচকে হাসানকে আমার দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে দেখলাম। নালার কিনারায় একটা পাতাহীন গাছের পাশে ওর সঙ্গে মিলিত হলাম।

ওর হাতে নীল ঘুড়িটা ধরা। ওটাই সবার অগে চোখে পড়ল। এখন আমি কিরে খেয়ে এ কথা বলতে পারব না যে আমার চোখ ওটার গায়ে কোনও ছেঁড়া দাগ আছে কিনা দেখার জন্যে নজর বোলায়নি। ওর *চাপানের* সামনের দিকে ময়লা লেগেছিল। কলারের ঠিক নিচে ছেঁড়া ছিল ওর গায়ের শার্ট। থামল ও। যেন লুটিয়ে পড়বে, এমনভাবে দুলছিল। নিজেকে সামলে নিল ও। ঘুড়িটা তুলে দিল আমার হাতে।

"কোথায় ছিলে? তোমাকে অনেক খুঁজেছি," বললাম আমি। এসব কথা বলা ছিল পাথর চিবুনোর মতো।

হাতা দিয়ে ময়লা আর চোখের পানি মুছল হাসান। ও কিছু বলার অপেক্ষা করলাম আমি। কিন্তু অপসৃয়মান আলোয় স্রেফ নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ও। হাসানের মুখের উপর এসে পড়া সন্ধ্যার ছায়া আর আমাকে আড়াল করে ফেলা ছায়ার জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম আমি। ওর চোখের দিকে তাকাতে হচ্ছে না বলে শোকর করলাম। আমি যে জানি তা কি ও জানে?

BanglaBook.org

জানলে আমার চোখের দিকে তাকালে তখন কী দেখতে পাব আমি? অভিযোগ? দোষারোপ? নাকি, খোদা মাফ করুন, আমি যার ভয় পাচ্ছিলাম: নির্দোষ আনুগত্য? সবার উপরে সেটা আমি সহ্য করতে পারতাম না।

একটা কিছু বলতে গেল ও, কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর ভেঙে এল। মুখ বন্ধ করে আবার খুলল। তারপর আবার বন্ধ করে ফেলল। এক পা পিছিয়ে গেল। মুখ মুছল। এবং এটাই ছিল গলিপথের ঘটনা নিয়ে আমার আর হাসানের কথা বলার সবচেয়ে কাছাকছি যাওয়া। আমি ভেবেছিলাম কান্নায় ভেঙে পড়বে, কিন্তু আমাকে স্বস্তি দিয়ে কাঁদল না ও। আর আমি ভান করলাম ওর প্যান্টের পেছনটায় গাঢ় দাগ চোখে পড়েনি আমার। কিংবা ওর দুপায়ের মাঝখান দিয়ে ঝরে পড়া ফোঁটা ফোঁটা রক্তে নিচের তুষার ভিজে ওঠাও দেখিনি।

"আগা সাহিব চিন্তা করবে," এই টুকুই বলল সে। আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে আগে বাড়ল।

ঠিক যেমন ভেবেছিলাম ঠিক সেভাবেই ঘটেছে ঘটনাটা। দরজা খুলে স্টাডিতে পা রাখলাম আমি। বাবা আর রহিম খান চা খাচ্ছিল। রেডিওর করকর আওয়াজ শুনছিল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দুজন। বাবার ঠোঁটে হাসির একটা রেখা ফুটে উঠল। হাত বাড়িয়ে দিল ও। ঘুড়ি নামিয়ে রেখে ওর বাড়ানো রোমশ মোটা হাতেজোড়ার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ওর বুকের উষ্ণতায় মুখ লুকিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে রাখল বাবা। সামনে পেছনে দোলাতে লাগল। ওর আলিঙ্গনে কী করেছি ভুলে গেলাম। সেটা খুবই ভালো ছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আট

একটা সপ্তাহ হাসানের সঙ্গে বলতে গেলেই দেখাই হল না। ঘুম থেকে উঠে টোস্ট করা রুটি, বানানো চা, সেদ্ধ ডিম আগে থেকেই নাশতার টেবিলে তৈরি অবস্থায় পেতে লাগলাম। আমার দিনের পোশাক-আশাক ইস্ত্রি করে ভাঁজ করা অবস্থায় ফয়ের একটা বেতের কর্নার টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হত। এখানেই ইস্ত্রির কাজটা করত হাসান। এমনিতে ইস্ত্রি শুরুর আগে আমার সঙ্গে খাবারের টেবিলে বসত ও-এভাবে আমরা কথা বলতে পারতাম। ইস্ত্রির হিসহিস শব্দ ছাপিয়ে গান গাইত ও। টিউলিপ বাগান নিয়ে পুরোনো দিনের হাযারা গান। এখন কেবল ভাঁজ করা কাপড়গুলোই আমাকে সম্ভাষণ জানায়; আর নাশতা, যেটা আর শেষ করে উঠতে পারি না আমি।

এক মেঘলা সকালে আমি যখন প্লেটের উপর সেদ্ধ ডিম ঠেলাঠেলি করছি, এক গোছা লাকড়ি কোলে করে ঘরে ঢুকল আলি। ওকে জিজ্ঞেস করলাম হাসান কোথায়।

"আবার ঘুমিয়ে পড়েছে," স্টোভের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলল আলি। একটা ছোট চৌকো দরজা খুলল সে।

"আজ কি হাসান খেলতে পারবে?"

হাতে একটা লাকড়ি নিয়ে থামল আলি। উদ্বেগের একটা ছাপ খেলে গেল ওর চেহারায়। "ইদানীং দেখা যাচ্ছে খালি ঘুমাতে চাইছে ও। কাজ কর্ম করছে বটে-সেদিকে খেয়াল রাখছি আমি-কিন্তু তারপরেই স্রেফ আবার কম্বলের নিচে গিয়ে ঢুকে পড়ছে। তোমাক একটা কথা জিজ্ঞেস করতে

BanglaBook.org

পারি?"

"করতে চাইলে করো।"

"সেই ঘুড়ি ওড়ানোর টুর্নামেন্টের পর একটু রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে আসে ও। ওর শার্টটাও ছেড়া ছিল। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও শুধু বলেছে, কিছু না। ঘুড়ি নিয়ে অন্য ছেলেদের সঙ্গে একটু মারপিট হয়েছে ওর।"

আমি কিছু বললাম না। স্রেফ প্লেটের চারপাশে ডিমটা নিয়ে খেলে চললাম।

"ওর কি কিছু হয়েছে, আমির আগা? এমন কিছু আমাকে যা বলছে না?"

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। "আমি কীভাবে জানব?"

"জানলে আমাকে বলতে, তাই না? *ইনশাল্লাহ*, কিছু ঘটে থাকলে আমাকে ঠিকই বলতে তুমি?"

"যেমন বললাম, ওর কী হয়েছে সেটা আমি কী করে বলব?" ধমকে উঠলাম। "হয়ত ওর শরীর খারাপ। মানুষের শরীর খারাপ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। আলি, এখন কি আমি ঠাণ্ডায় জমে মরব নাকি দয়া করে স্টোভটা জ্বালাবে?"

সেরাতে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম শুক্রবার দিন জালালাবাদ যেতে পারব কিনা। ডেস্কের পেছনে চামড়ার গদিমোড়া সুইভেল চেয়ালে দোল খেতে খেতে একটা পত্রিকা পড়ছিল ও। কাগজ নামিয়ে রেখে চোখ থেকে চশমা খুলল। ওই চশমা আমার যারপরনাই অপছন্দ। বাবা বুড়িয়ে যায়নি– একেবারেই না। এখনও অনেক দিন আয়ু আছে ওর। তাহলে কেন ওকে বোকার মতো চশমা পরতে হবে?

"কেন নয়?" বলল সে। ইদানীং আমার সব কথাতেই রাজি হচ্ছিল বাবা। কেবল তাই না, মাত্র দুই রাত আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল সিনেমা আরিয়ানায় চার্লটন হেস্টন অভিনীত *এল সিদ* দেখতে চাই কিনা। "জালালাবাদে তোমার সঙ্গে হাসানকেও নিতে চাও?"

বাবা কেন এভাবে ব্যাপারটাকে বরবাদ করে দিতে চাইছে? "ও এখন *মারিয,*" বললাম আমি। তেমন একটা ভালো বোধ করলাম না।

"তাই?" চেয়ারে দোল খাওয়া থামাল বাবা। "ওর আবার কী হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফায়ার প্লেসের পাশের একটা সোফায় গা এলিয়ে

BanglaBook.org

দিলাম। "মনে হয় ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লেগেছে। আলি বলছে সারাক্ষণ নাকি ঘুমিয়ে থাকে ও।"

"গত কয়েক দিন হাসানকে তেমন একটা দেখিনি আমি," বলল বাবা। "তাহলে ব্যাপারটা এই, স্রেফ ঠাণ্ডা লেগেছে?" উদ্বেগে যেভাবে ওর ভ্রূজোড়া কুঁচকে উঠেছিল সেটা আমার ঠিক ভালো লাগেনি।

"স্রেফ ঠাণ্ডা। তাহলে শুক্রবার দিন আমরা যাচ্ছি, বাবা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," ডেস্ক থেকে সরে যাবার সময় বলল বাবা। "হাসানের কপালটা খুব খারাপ। আমি মনে করেছিলাম ও গেলে আরও বেশী মজা করতে পারতে তুমি।"

"বেশ, আমরা দুজনও মজা করতে পারি," আমি বললাম। বাবা হাসল। চোখ টিপল। "গরম কাপড় পরে নিয়ো," বলল।

শুধু আমরা দুজন হওয়া উচিত ছিল–সেটাই চেয়েছিলাম আমি–কিন্তু বুধবার রাত নাগাদ আরও দুই ডযেন লোক যোগাড় করে ফেলল বাবা। চাচাত ভাই হুমায়ূনকে–আসলে বাবার সেকেন্ড কাজিন–ফোন করল–তাকে জানাল শুক্রবার দিন জালালাবাদে যাচ্ছে ও। হুমায়ূন ফ্রান্সে পড়াশোনা করা এঞ্জিনিয়ার, জালালাবাদে বাড়ি করেছে, বলল সবাইকে পেলে সে খুবই খুশি হবে। নিজের বাচ্চা আর দুই স্ত্রীকে নিয়ে আসবে। সে যখন এই কাজ করছে তখন চাচাত বোন শফিকা আর তার পরিবার হেরাত থেকে বেড়াতে এসেছিল। তাকেও সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। সে যেহেতু কাবুলে চাচাত ভাই নাদেরের ওখানে ছিল, তার পরিবাবরেকও দাওয়াত করা যেতে পারে, যদিও নাদের আর হুমায়ূনের মধ্যে এক ধরনের ঝগড়া চলছে। নাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হলে তার ভাই ফারুককেও অবশ্যই দাওয়াত দিতে হয়, নইলে তার মনে আঘাত লাগবে। সে তাহলে পরের মাসে তার মেয়ের বিয়েতে ওদের দাওয়াত নাও করতে পারে। আর...

তিনটা ভ্যান ভরে ফেললাম আমরা। বাবা, রহিম খান, হুমায়ূন কাকা–খুব কম বয়সেই বাবা আমাকে যে কোনও বড় পুরুষকে কাকা বা আঙ্কল ডাকতে শিখিয়েছে–আর যেকোনও নারীকে খালা বা আন্ট। হুমায়ূন কাকার দুই স্ত্রীও আমাদের সঙ্গে চলল। বিষণ্ণ চেহারার প্রথমজনের হাতময় খালি কড়া। আর দ্বিতীয়জনের গা থেকে সব সময় সৌরভ ভেসে আসছে। চোখ বন্ধ করে নাচে সে। হুমায়ূন কাকার মেয়ে দুটিও তাই। পেছনের সারিতে বসেছি আমি। গাড়িতে চড়ে বমি বমি লাগছে। ঝিমুচ্ছি। সাত বছর

BanglaBook.org

বয়সী যমজ বোনদের মাঝখানে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা অবস্থা। আমার গায়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে বারবার একে অপরকে চড় মারার চেষ্টা করছে ওরা। একটা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে খাড়া ঢাল বেয়ে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা রাস্তায় দুই ঘণ্টার পথ জালালাবাদ। প্রত্যেকটা চুলের কাঁটার মতো বাঁকা বাঁকে পৌঁছেই আমার পেট গুলিয়ে উঠছে। ভ্যানের সবাই কথা বলছে। জোরে জোরে। এক সঙ্গে। বলতে গেলে চিৎকার করছে, এটাই আফগানদের স্বভাব। যমযদের একজনকে—ফাযিলা বা কারিমা হবে, কোনটা যে কে কখনই বুঝতে পারি না—সে আমার সঙ্গে জানালার পাশের সীট বদলা বদলি করবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে কার-সিকনেস দূর করতে টাটাকা হাওয়া খতে পারব আমি। জিভ বের করে ভেংচি কাটল সে, কিছু বলল না। আমি বললাম, ঠিকাছে, তবে আমি ওর নতুন জামায় বমি করে দিলে যেন দোষ না দেয়। এক মিনিট বাদে জানালার গায়ে ঠেস দিয়ে বসলাম আমি। গর্তভরা রাস্তার গাড়ির ওঠানামা দেখতে লাগলাম, পাহাড়ের ওপাশে লেজ রেখে আসছে। ঝড়ের বেগে চলে যাওয়া বহু রঙা টাকগুলো গুনে চললাম, ওগুলোতে লোকেরা হাঁটু গেড়ে বসে আছে। চোখ বন্ধ করার প্রয়াস পেলাম। গালের উপর হাওয়ার আঘাত লাগার সুযোগ করে দিলাম। টাটকা বাতাস গিলে নেওয়ার জন্যে মুখ খুললাম। তারপরেও ভালো লাগছিল না। আমার পাশে একটা আঙুল খোঁচা লাগাল। ফাযিলা/কারিমা।

"কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"সবাইকে টুর্নামেন্টর কথা বলছিলাম," হুইলের পেছন থেকে বলল বাবা। মাঝের সারির সীটে বসা হুমায়ূন কাকা আর তার স্ত্রীরা আমার দিকে চেয়ে হাসছিল।

"সেদিন নিশ্চয়ই আকাশে অন্তত একশোটা ঘুড়ি ছিল?" বাবা বলল, "তাই না, আমির?"

"মনে হয়," বিড়বিড় করে বললাম।

"একশোটা ঘুড়ি, হুমায়ূন জান। হাসির কথা নয়। দিনের শেষে কেবল আমিরের ঘুড়িটাই ছিল আকাশে। শেষ ঘুড়িটা ঘরে নিয়ে এসেছে ও। দারুণ একটা নীল ঘুড়ি। হাসান আর আমির একসঙ্গে দৌড়েছে।"

"অভিনন্দন," বলল হুমায়ূন কাকার প্রথম স্ত্রী, হাতে কড়া অলাজন, হাত তালি দিয়ে উঠল। "*বাহ, বাহ,* আমির জান। আমরা তোমার জন্যে অনেক গর্বিত!" বলল সে। তরুণীও স্ত্রীও যোগ দিল। তারপর সবাই একসঙ্গে হাততালি দিতে লেগে গেল। চেঁচিয়ে তারিফ করছে। বলছে আমি

BanglaBOOK.org

ওদের কত গর্বিত করে তুলেছি। কেবল বাবার পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা রহিম খান নীরব। অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল সে।

"বাবা, একটু গাড়িটা থামাও," বললাম আমি।

"কী?"

"খারাপ লাগছে," সীটের উপর এলিয়ে পড়ে বিড়বিড় করে বললাম আমি। হুমায়ূন কাকার মেয়েদের উপর এলিয়ে পড়লাম।

ফাযিলা/কামিলার মুখ বেঁকে গেল। "গাড়ি থামাও, কাকা! ওর চেহারা হলুদ হয়ে গেছে! আমার নতুন জামায় সে বমি করুক, চাই না!" চিৎকার জুড়ে দিল সে।

গাড়ি থামাতে শুরু করল বাবা। কিন্তু আমি সামলে রাখতে পারলাম না। কয়েকমিনিট বাদে, রাস্তার পাশে একটা পাথরের উপর বসে আছি আমি, ওরা ভ্যান পরিষ্কার করছে। হুমায়ূন কাকার সঙ্গে ধূমপান করছে বাবা। ফাযিলা/কারিমাকে কাঁদতে নিষেধ করছে কাকা। জালারাবাদ পৌঁছে ওদের নতুন কাপড় কিনে দেবে সে। চোখ বুজলাম আমি। সূর্যের দিকে মুখ ফেরালাম। আমার চোখের পাতার ওপাশে ছোটছোট কাঠামো রূপ পেল। যেন দেয়ালের উপর ছায়া তৈরি করছে কতগুলো হাত। এঁকেবেঁকে মিলে গিয়ে একটা মাত্র ছবি খাড়া করল ওগুলো: একটা গলির পুরোনো ইঁটের স্তূপের উপর পড়ে আছে হাসানের বাদামী কর্ডুরয় প্যান্টটা।

জালালাবাদে হুমায়ূন কাকার শাদা রঙের দোতলা বাড়িতে বিশাল আপেল আর খেজুর গাছের দেয়ালঘেরা একটা বাগানে খোলা একটা বেলকনি ছিল। অনেক ঝোপঝাড়ও ছিল, গ্রীষ্মকালে মালিরা ওগুলোকে ছেঁটে নানা রকম জানোয়ারের চেহারা দিত। এমারেল্ড রঙা টাইলস বসানো একটা সুইমিং পুলও ছিল। পুলের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে ছিলাম আমি। একেবারে তলায় পড়ে থাকা ঘোলাটে কিছু তুষার ছাড়া খালিই ছিল ওটা। হুমায়ূন কাকার মেয়েরা উঠোনের অন্যপাশে লুকোচুরি খেলছিল। মহিলারা রান্নায় ব্যস্ত। আমি এরই মধ্যে পেঁয়াজ ভাজির গন্ধ পাচ্ছিলাম, প্রেশার কুকারের *পফফট-পফফট* শব্দ, গান, হাসির হররা কানে আসছিল। বেলকনিতে বসে ধূমপান করছিল বাবা, রহিম খান, হুমায়ূন কাকা আর নাদের কাকা। হুমায়ূন কাকা ওদের ফ্রান্সে পড়াশোনার স্লাইড দেখানোর জন্যে সঙ্গে করে প্রজেক্টর নিয়ে এসেছে। প্যারিস থেকে আসার পর দশ বছর ধরে সে এইসব নির্বোধ স্লাইড দেখিয়ে চলেছে সে।

BanglaBook.org

আমার এমন মনে হওয়া উচিত ছিল না। আমি আর বাবা শেষমেষ বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। কয়েকদিন আগে আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। সিংহ মারজানকে দেখেছি। কেউ যখন দেখছিল না তখন ভালুকের দিকে একটা পাথর ছুড়ে মেরেছি। এর পরে সিনেমা পার্কের উল্টোদিকে দাদখোদার কাবাব হাউসে গেছি আমরা। *তন্দুরে* সদ্য বানানো *নান* দিয়ে ভেড়ার *কাবাব* খেয়েছি। বাবা ওর রাশিয়া আর ইন্ডিয়ায় বেড়াতে যাবার গল্প শুনিয়েছে আমাকে। ওখানে দেখা হওয়া লোকজনের কথা বলেছে; যেমন বোম্বের পা-বিহীন এক দম্পতির কথা: চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এগারটা ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছে ওরা। বাবার সঙ্গে এভাবে একটা দিন কাটাতে পারা, এইসব গল্প শোনা, মজাদার হওয়া উচিত ছিল। এতগুলো বছর ধরে যা চেয়েছি তা হাতের কাছে পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন হাতে পাওয়ার পর নিজেকে যেন এই অযত্নে পড়ে থাকা শূন্য পুলের মতো মনে হচ্ছে, যার ভেতরে পা নামিয়ে বসে আছি আমি।

সূর্যাস্তের সময় স্ত্রী আর মেয়েরা ডিনার পরিবেশন করল–ভাত, *কোফতা*, আর মুরগির *কোর্মা*। রেওয়াজ মাফিক রুমের চারপাশে গদির উপর বসে ডিনার সারলাম আমরা। মেঝের উপর টেবিল ক্লথ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাত দিয়ে একটা প্লেট থেকেই চারপাঁচজনের একটা দল একসঙ্গে খাচ্ছি। আমার ক্ষুধা না থাকলেও বাবা, ফারুক কাকা আর হুমায়ূন কাকার দুই ছেলের সঙ্গে খেতে বসে ছিলাম। ডিনারের আগেই গ্লাস দুই স্কচ খেয়েছিল বাবা, এখনও সেই ঘুড়ি প্রতিযোগিতা নিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। আমি কীভাবে সবাইকে হারিয়ে দিয়েছি, কীভাবে শেষ ঘুড়িটা হাতে নিয়ে ফিরে এসেছি, এইসব। ওর গমগমে কণ্ঠস্বর সারা ঘর ভরে রেখেছিল। লোকেরা প্লেট থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল আমাকে। ফারুক কাকা পরিষ্কার হাতে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। আমার মনে হল বুঝি চোখের ভেতর একটা ঘুড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরে, মাঝরাত পেরিয়ে যাবারও বেশ পরে, বাবা আর ওর কাজিনদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পোকার খেলার শেষে আমরা যে রুমে খেয়েছি সেখানেই পাশাপশি বিছানো ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে পড়ল লোকেরা। মেয়েরা চলে গেল উপরে। এক ঘণ্টা পরেও ঘুম এল না আমার। আমার আত্মীয়রা ঘুমের ভেতর নাক ডেকে চলল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করল, আর আমি এপাশ-ওপাশ করে চললাম। উঠে বসলাম আমি। জানালা গলে চাঁদের আলোর একটা টুকরো ঘরে ঢুকে পড়েছে।

BanglaBook.org

ওদের কত গর্বিত করে তুলেছি। কেবল বাবার পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে বসে থাকা রহিম খান নীরব। অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল সে।

"বাবা, একটু গাড়িটা থামাও," বললাম আমি।

"কী?"

"খারাপ লাগছে," সীটের উপর এলিয়ে পড়ে বিড়বিড় করে বললাম আমি। হুমায়ূন কাকার মেয়েদের উপর এলিয়ে পড়লাম।

ফাযিলা/কামিলার মুখ বেঁকে গেল। "গাড়ি থামাও, কাকা! ওর চেহারা হলুদ হয়ে গেছে! আমার নতুন জামায় সে বমি করুক, চাই না!" চিৎকার জুড়ে দিল সে।

গাড়ি থামাতে শুরু করল বাবা। কিন্তু আমি সামলে রাখতে পারলাম না। কয়েকমিনিট বাদে, রাস্তার পাশে একটা পাথরের উপর বসে আছি আমি, ওরা ভ্যান পরিষ্কার করছে। হুমায়ূন কাকার সঙ্গে ধূমপান করছে বাবা। ফাযিলা/কারিমাকে কাঁদতে নিষেধ করছে কাকা। জালারাবাদ পৌঁছে ওদের নতুন কাপড় কিনে দেবে সে। চোখ বুজলাম আমি। সূর্যের দিকে মুখ ফেরালাম। আমার চোখের পাতার ওপাশে ছোটছোট কাঠামো রূপ পেল। যেন দেয়ালের উপর ছায়া তৈরি করছে কতগুলো হাত। এঁকেবেঁকে মিলে গিয়ে একটা মাত্র ছবি খাড়া করল ওগুলো: একটা গলির পুরোনো ইঁটের স্তূপের উপর পড়ে আছে হাসানের বাদামী কর্ডুরয় প্যান্টটা।

জালালাবাদে হুমায়ূন কাকার শাদা রঙের দোতলা বাড়িতে বিশাল আপেল আর খেজুর গাছের দেয়ালঘেরা একটা বাগানে খোলা একটা বেলকনি ছিল। অনেক ঝোপঝাড়ও ছিল, গ্রীষ্মকালে মালিরা ওগুলোকে ছেঁটে নানা রকম জানোয়ারের চেহারা দিত। এমারেল্ড রঙা টাইলস বসানো একটা সুইমিং পুলও ছিল। পুলের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে ছিলাম আমি। একেবার তলায় পড়ে থাকা ঘোলাটে কিছু তুষার ছাড়া খালিই ছিল ওটা। হুমায়ূন কাকার মেয়েরা উঠোনের অন্যপাশে লুকোচুরি খেলছিল। মহিলারা রান্নায় ব্যস্ত। আমি এরই মধ্যে পেঁয়াজ ভাজির গন্ধ পাচ্ছিলাম। প্রেশার কুকারের *পফফট-পফফট* শব্দ, গান, হাসির হররা কানে আসছিল। বেলকনিতে বসে ধূমপান করছিল বাবা, রহিম খান, হুমায়ূন কাকা আর নাদের কাকা। হুমায়ূন কাকা ওদের ফ্রান্সে পড়াশোনার স্লাইড দেখানোর জন্যে সঙ্গে করে প্রজেক্টর নিয়ে এসেছে। প্যারিস থেকে আসার পর দশ বছর ধরে সে এইসব নির্বোধ স্লাইড দেখিয়ে চলেছে সে।

BanglaBook.org

আমার এমন মনে হওয়া উচিত ছিল না। আমি আর বাবা শেষমেষ বন্ধু হয়ে উঠেছিলাম। কয়েকদিন আগে আমরা চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম। সিংহ মারজানকে দেখেছি। কেউ যখন দেখছিল না তখন ভালূকের দিকে একটা পাথর ছুড়ে মেরেছি। এর পরে সিনেমা পার্কের উল্টোদিকে দাদখোদার কাবাব হাউসে গেছি আমরা। *তন্দুরে* সদ্য বানানো *নান* দিয়ে ভেড়ার *কাবাব* খেয়েছি। বাবা ওর রাশিয়া আর ইন্ডিয়ায় বেড়াতে যাবার গল্প শুনিয়েছে আমাকে। ওখানে দেখা হওয়া লোকজনের কথা বলেছে; যেমন বোম্বের পা-বিহীন এক দম্পতির কথা: চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে এগারটা ছেলেমেয়েকে মানুষ করেছে ওরা। বাবার সঙ্গে এভাবে একটা দিন কাটাতে পারা, এইসব গল্প শোনা, মজাদার হওয়া উচিত ছিল। এতগুলো বছর ধরে যা চেয়েছি তা হাতের কাছে পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন হাতে পাওয়ার পর নিজেকে যেন এই অযত্নে পড়ে থাকা শূন্য পুলের মতো মনে হচ্ছে, যার ভেতরে পা নামিয়ে বসে আছি আমি।

সূর্যাস্তের সময় স্ত্রী আর মেয়েরা ডিনার পরিবেশন করল–ভাত, *কোফতা*, আর মুরগির *কোর্মা*। রেওয়াজ মাফিক রুমের চারপাশে গদির উপর বসে ডিনার সারলাম আমরা। মেঝের উপর টেবিল ক্লথ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাত দিয়ে একটা প্লেট থেকেই চারপাঁচজনের একটা দল একসঙ্গে খাচ্ছি। আমার ক্ষুধা না থাকলেও বাবা, ফারুক কাকা আর হুমায়ূন কাকার দুই ছেলের সঙ্গে খেতে বসে ছিলাম। ডিনারের আগেই গ্লাস দুই স্কচ খেয়েছিল বাবা, এখনও সেই ঘুড়ি প্রতিযোগিতা নিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। আমি কীভাবে সবাইকে হারিয়ে দিয়েছি, কীভাবে শেষ ঘুড়িটা হাতে নিয়ে ফিরে এসেছি, এইসব। ওর গমগমে কণ্ঠস্বর সারা ঘর ভরে রেখেছিল। লোকেরা প্লেট থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছিল আমাকে। ফারুক কাকা পরিষ্কার হাতে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। আমার মনে হল বুঝি চোখের ভেতর একটা ঘুড়ি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরে, মাঝরাত পেরিয়ে যাবারও বেশ পরে, বাবা আর ওর কাজিনদের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা পোকার খেলার শেষে আমরা যে রুমে খেয়েছি সেখানেই পাশাপশি বিছানো ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে পড়ল লোকেরা। মেয়েরা চলে গেল উপরে। এক ঘন্টা পরেও ঘুম এল না আমার। আমার আত্মীয়রা ঘুমের ভেতর নাক ডেকে চলল, ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করল, আর আমি এপাশ-ওপাশ করে চললাম। উঠে বসলাম আমি। জানালা গলে চাঁদের আলোর একটা টুকরো ঘরে ঢুকে পড়েছে।

BanglaBook.org

"হাসানকে ধর্ষিত হতে দেখেছি আমি," শূন্যতার উদ্দেশে বললাম। ঘুমের ভেতর নড়ে উঠল বাবা। শব্দ করে উঠল হুমায়ূন কাকা। আমার একটা অংশ খুব করে চাইছিল কেউ একজন জেগে উঠে আমার কথা শুনুক। তাহলে আর আমাকে এই মিথ্যা বয়ে বেড়াতে হবে না। কিন্তু কেউ জাগল না। পরবর্তী নীরবতার ভেতর আমি বুঝে গেলাম আমার নতুন জীবন ধারা: আমাকে এটাই বয়ে চলতে হবে।

হাসানের স্বপ্নের কথা ভাবলাম। লেকে সাঁতার কাটার সেই স্বপ্নটা। *দানো বলে কিছু নেই*, বলেছিল ও, *কেবল পানি।* কিন্তু ভুল হয়েছিল ওর। লেকে একটা দানো ছিল। হাসানের গোড়ালি চেপে ধরেছে ওটা। ওকে কাদাময় তলে নিয়ে গেছে। আমিই সেই দানো।

সেই রাতেই আমি ইনসোম্যানিয়াকে পরিণত হয়েছিলাম।

পরের সপ্তাহর মাঝামাঝি সময়ের আগে আর হাসানের সঙ্গে আর কথা বলিনি আমি। কেবল আমার দুপুরের খাবার অর্ধেকের মতো শেষ করেছি, হাসান থালাবাসন ধুচ্ছিল। আমি ওপরে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছিলাম, এই সময় হাসান জানতে চাইল আমি পাহাড় বাইতে চাই কিনা। আমি বললাম আমি এখন ক্লান্ত। হাসানকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ওজন হারিয়েছে ও, ওর ফোলা ফোলা চোখের নিচে ধূসর পট্টি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আবার যখন সে জিজ্ঞেস করল, অনীহার সঙ্গে সায় দিলাম।

আমরা পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। আমাদের বুট কাদাময় তুষারে মচমচ শব্দ তুলছে। কেউই কোনও কথা বলছি না। ডালিম গাছটার নিচে বসলাম আমরা, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম ভুল করে ফেলেছি। পাহাড়ে উঠে আসা উচিত হয়নি আমার। গাছের কাণ্ডে আলির কিচেন নাইফ দিয়ে খোদাই করেছিলাম আমি কথাগুলো: *কাবুলের সুলতান দুই আমির আর হাসান...*এখন আর ওই কথাগুলোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

আমাকে ও *শাহনামা* থেকে পড়ে শোনাতে বলল। বললাম আমি মত পাল্টেছি। বললাম আমি স্রেফ আমার ঘরে ফিরে যেতে চাই। অন্য দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাকাল সে। যে-পথে এসেছিলাম অবার সে-পথেই নেমে এলাম আমরা: নীরবে। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি আর বসন্তের অপেক্ষা করতে পারছিলাম না।

১৯৭৫ সালের সেই শীতের বাকি দিনগুলোর স্মৃতি বেশ ঝাপসা আমার

BanglaBook.org

গাছে। মনে আছে বাবা বাড়ি থাকার সময় অনেক ভালো লাগত আমার। আমরা এক সঙ্গে বসতাম, সিনেমা দেখতে যেতাম, হুমায়ূন কাকা আর ফারুক কাকার ওখানে বেড়াতে যেতাম। অনেক সময় রহিম খান আসত, বাবা তখন আমাকে ওর স্টাডিতে বসতে দিত। ওদের মাঝখানে বসে চায়ে চুমুক দিতাম আমি। এমনকি আমাকে আমার লেখা কিছু গল্প পড়ে শোনাতেও দিত সে। খুবই ভালো ছিল সময়টা। আমি ভেবেছিলাম এভাবেই কেটে যাবে। বাবাও তাই ভেবেছিল বলে মনে হয়। কিন্তু আমাদের দুজনেরই আরও বুদ্ধিমান হওয়া উচিত ছিল। ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতার অন্তত কয়েক মাস পরেও আমি আর বাবা একটা মিষ্টি মোহে আটকা পড়ে ছিলাম। আগে দেখিনি এমনভাবে পরস্পরকে দেখছিলাম আমরা। আমরা আসলে নিজেদের একথা বিশ্বাস করতে প্রতারণা করেছি যে টিস্যু পেপার, আঠা আর বাঁশ আমাদের মাঝের গহ্বর বন্ধ করে দিতে পারবে।

কিন্তু বাবা যখন বাইরে থাকত–অনেক সময়ই বাইরে কাটাত ও–নিজেকে নিজের ঘরে বন্দী করে রাখতাম আমি। দুই দিনে একটা করে বই শেষ করতাম, কিছু গল্প লিখতাম, ঘোড়া আঁকা শিখতাম। সকালে কিচেনে হাসানের চলাফেরার আওয়াজ পেতাম আমি। থালাবাসনের টুংটাং কানে আসত। চায়ের পটের শিসের শব্দ পেতাম। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজের অপেক্ষা করতাম আমি। এবং কেবল তারপরেই খাওয়ার জন্যে নিচে নেমে আসতাম। ক্যালেন্ডারের উপর ক্লাস শুরুর তারিখের উপর একটা গোল দাগ এঁকে রাখতাম, তারপর শুরু হত অপেক্ষার পালা।

আমাকে ভীত করে হাসান আমাদের সম্পর্ক আবার চাঙা করে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রাখল। শেষবারের কথা আমার মনে আছে। নিজের ঘরে ছিলাম আমি। *আইভানহো*র একটা সংক্ষিপ্ত ফারসি অনুবাদে পড়ছিলাম। আমার ঘরের দরজায় টোকা দিল ও।

"কে?"

"*নান* কিনতে রুটির দোকানে যাচ্ছি আমি," অন্যপাশ থেকে বলল ও। "ভাবছিলাম তুমি...তুমিও যেতে চাইবে কিনা।"

"আমি পড়ব বলে ভাবছি," কপাল ডলে বললাম। ইদানীং হাসান আশপাশে থাকলেই আমার মাথাব্যথা শুরু হয়ে যাচ্ছিল।

"আজ রোদ ছিল," বলল ও।

"সেটা দেখতেই পাচ্ছি।"

"হাঁটতে গেলে হয়ত মজাই লাগবে।"

BanglaBook.org

"তুমি যাও।"

"তুমিও আসলে ভালো হত," বলল ও। একটু থামল। কবাটের উপর কি যেন আঘাত করল। হয়ত তার কপাল। "আমি কী করেছি, জানি না, আমির আগা। তুমি বললে ভালো হত। আমি জানি না কেন আর আমার সঙ্গে খেল না তুমি।"

"তুমি কিছুই করনি, হাসান। স্রেফ চলে যাও।"

"তুমি আমাকে বলতে পারো। তাহলে আর এমন করব না আমি।"

কোলে মাথা লুকালাম আমি। দুই হাঁটু দিয়ে মাথা চেপে ধরলাম। "কোন কাজটা আর করতে হবে না, বলছি তোমাকে," জোর করে চোখ বন্ধ করে বললাম আমি।

"যেকোনও কিছু।"

"আমি চাই আমাকে আর জ্বালাবে না তুমি। আমি চাই তুমি দূর হয়ে যাও," ধমকে উঠলাম। আমি ভেবেছিলাম আমাকে পাল্টা জবাব দেবে ও, দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে আমাকে ধমক দেবে–তাহলে সব কিছু অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু তেমন কিছু করল না ও। কয়েক মিনিট পরে যখন দরজা খুললাম, দেখা গেল নেই ও। বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লাম আমি। বালিশের নিচে মাথা লুকিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

এর পর থেকে আমার জীবনের সীমানায় ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল হাসান। আমাদের চলাফেরার পথ যাতে যতদূর সম্ভব কম মেলে সেটা নিশ্চিত করলাম আমি। দিনের কাজ কর্ম সেভাবেই সাজিয়ে নিয়েছিলাম। ও আশপাশে থাকলে ঘরের সমস্ত অক্সিজেন যেন ফুরিয়ে যেত। আড়ষ্ট হয়ে উঠত আমার বুক. শ্বাস নিতে পারতাম না। নিজের হাওয়াহীন বুদ্বুদের ভেতর দাঁড়িয়ে বাতাসের জন্যে আঁইটাঁই করতে থাকতাম। কিন্তু এমনকি ও যখন আশপাশে থাকত না, তখনও ওর অস্তিত্ব রয়ে যেত। বেতের চেয়ারের রাখা হাতে ধোয়া, ইস্ত্রি করা কাপড়ে ওর অস্তিত্ব থাকত। আমার ঘরের দরজার বাইরে ফেলে রাখা চপ্পলে ছিল ওর অস্তিত্ব। আমি নাশতা খেতে নিচে নেমে আসার আগেই স্টোভে জ্বলতে থাকা লাকড়িতে ওর অস্তিত্ব থাকত। আমি যেদিকেই তাকাতাম, সেদিকেই ওর বিশ্বস্ততার চিহ্ন দেখতে পেতাম, হতচ্ছাড়া অটল আনুগত্য।

সেবার বসন্তের গোড়ার দিকে নতুন ক্লাস শুরুর অল্প কয়েক দিন আগে বাবা আর আমি বাগানে টিউলিপ-বীজ বুনছিলাম। বেশীরভাগ বরফই তখন

BanglaBook.org

গলে গেছে। উত্তরের পাহাড়গুলোর গায়ে ইতিমধ্যে সবুজের ছোপ লেগেছে। ঠাণ্ডা, ধূসর সকাল। আমার পাশেই হাঁটু গেড়ে বসেছিল বাবা। গর্ত খুঁড়ে মামারে বাড়িয়ে দেওয়া বীজ লাগাচ্ছিল। আমাকে বলছিল যে বেশীরভাগ লোকই মনে করে ফলেই টিউলিপ লাগানো ভালো, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ঠিক এমনি একটা সময়ে আমি হুট করে বলে বসলাম, "বাবা, তুমি কখনও নতুন কাজের লোক রাখার কথা ভেবেছ?"

টিউলিপের কন্দটা ফেলে ট্রাওয়েলটা মাটিতে গাঁথল ও। বাগান করার দস্তানাটা খুলে ফেলল। ওকে চমকে দিয়েছি। "*কি? কী বললে?*"

"এমনি ভাবছিলাম আরকি।"

"কেন আমি ওমন কিছু ভাবতে যাব?" কাটাকাটা স্বরে বলল বাবা।

"আমার তা মনেও হয় না। এমনি একটা প্রশ্ন ছিল আরকি," বললাম, আমার কণ্ঠস্বর প্রায় বিড়বিড়ানিতে পরিণত হয়েছে। কথাটা বলেছি বলে এরই মধ্যে প্রমাদ গুনতে শুরু করেছিলাম।

"এটা হাসান আর তোমার কোনও ব্যাপার? জানি, তোমাদের ভেতর একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু সেটা যাই হোক, তোমাকেই তার সামাল দিতে হবে, আমি নই। এর মধ্যে নেই আমি।"

"দুঃখিত, বাবা।"

আবার গ্লাভস পরল ও। "আমি আলির সাথে বড় হয়েছি," দাঁতে দাঁত চেপে বলল। "বাবা ওকে ঘরে তুলে এনেছিল। আলিকে নিজের ছেলের মতো ভলোবেসেছিল। আজ চল্লিশ বছর ধরে আলি আমার পরিবারে আছে। চল্লিশটা বছর। আর তুমি ভেবেছ, আমি ওকে স্রেফ দূর করে দেব?" এবার আমার দিকে ফিরে তাকাল ও। চেহারা টিউলিপের মতোই লাল হয়ে আছে। "তোমার গায়ে কখনও হাত তুলিনি আমি, আমির। কিন্তু ফের যদি একথা বলো..." মাথা নেড়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল ও। "আমাকে লজ্জা দিয়েছ তুমি। আর হাসান...হাসান কোথাও যাচ্ছে না। বুঝতে পেরেছ?"

আমি মাথা নিচু করে নিলাম। ঠাণ্ডা এক দলা মাটি হাতে তুলে নিলাম। আঙুলের ফাঁক গলে ঝরে পড়তে দিলাম ওগুলোকে।

"জিজ্ঞেস করছি, আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছ কিনা?" গর্জে উঠল বাবা।

আমি কুঁকড়ে গেলাম। "হ্যাঁ, বাবা।"

"হাসান কোথাও যাচ্ছে না," ধমকে উঠল বাবা। ট্রাওয়েল দিয়ে নতুন একটা গর্ত খুঁড়ল। প্রয়োজনের চেয়ে জোরে আঘাত হানছে মাটিতে।

BanglaBook.org

"এখানে, আমাদের সঙ্গেই থাকছে ও, যেখানে ওর বাড়ি। এটা ওর ঘর। আমরা ওর পরিবার। আমাকে আর কখনও এই প্রশ্ন করবে না!"

"ঠিকাছে, বাবা। আমি দুঃখিত।"

ব্যাকি টিউলিপগুলো নীরবে রোপন করে গেলাম আমরা।

পরের সপ্তাহে স্কুল শুরু হলে স্বস্তি বোধ করলাম। নতুন নোটবই, শার্প-করা পেন্সিল হাতে উঠোনে জটলা বেঁধে গল্প করছে ছাত্ররা, ক্লাস ক্যাপ্টেন কখন হুইসল বাজাবে তার অপেক্ষা করছে। বাবা গেইটের দিকে চলে যাওয়া মাটির রাস্তা ধরে গাড়ি নিয়ে আগে বাড়ল। স্কুলটা ভাঙা জানালা আর আধা অন্ধকার কোবল স্টোনের হলওয়েঅলা একটা পুরোনো দোতালা দালান। ঝরে পড়া আস্তরণের নিচে এখনও ওটার আদি ম্লান হলদে রঙের আভাস মেলে। বেশীর ভাগ ছেলেই হেঁটে স্কুলে আসে। বাবার কালো মাস্টাংটা তাই অনেকেরই ঈর্ষাভরা নজর কাড়ে। আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবার সময় গর্বে আমার জলজল করা উচিত ছিল। আগের সেই আমি হলে হয়ত তাই হত। কিন্তু মৃদু বিব্রত ভাব ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারলাম না। আর শূন্যতা। বাবা বিদায় না জানিয়েই চলে গেল।

আমি ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতার রেওয়াজ মাফিক কাটা-ঘায়ের চিহ্ন তুলনা এড়িয়ে লাইনে এসে দাঁড়ালাম। বেল বেজে উঠল। মার্চ করে যার যার ক্লাসে চলে এলাম আমরা। জোড়ায় জোড়ায় ভেতেরে ঢুকলাম। এখন পেছন দিকে বসি আমি। ফারসি টিচার টেক্সট বই হাতে তুলে দিল। কঠিন হোমওঅর্কের জন্যে দোয়া করতে লাগলাম আমি।

স্কুল দীর্ঘ সময় ধরে ঘরে থাকার একটা অজুহাত যোগাচ্ছে আমাকে। কিছুক্ষণের জন্যে সেই শীতে আমি যা ঘটতে দিয়েছি সেটা থেকে আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। হাসান আর ওর কী হয়েছে সে ভাবনা বাদ দিয়ে কয়েক সপ্তাহর জন্যে মধ্যাকর্ষণ আর মোমেন্টাম, অ্যাটম আর সেল, অ্যাঙলো-আফগান যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত রইলাম। কিন্তু বারবার আমার মন সেই গলি পথেই ফিরে যেতে লাগল। ইটের উপর পড়ে থাকা হাসানের কর্ডুরয় প্যান্টের কথা, তুষারকে লাল, প্রায় কালো করে তোলা রক্তের ফোঁটার কথা মনে করিয়ে দিতে লাগল।

সেই গ্রীষ্মের গোড়ার দিকে এক ধোঁয়াসা সকালে হাসানকে বললাম আমার লেখা একটা নতুন গল্প পড়ে শোনাতে চাই ওকে। উঠোনে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল ও। তাড়হুড়ো করে কাজটা শেষ করার ভেতর ওর আগ্রহ টের পেলাম।

BanglaBook.org

টুকটাক কথাবার্তা বলতে বলতে ঢাল বেয়ে উঠে এলাম আমরা। স্কুলের কথা জানতে চাইল ও। জানতে চাইল আমি কী শিখছি। আমি টিচারদের খাতা, বিশেষ করে বজ্জাত অঙ্ক টিচারের গল্প বললাম। বাচাল ছেলেদের হাতের দুআঙুলের মাঝখানে লোহার কাঠি রেখে তারপর জোরে চাপ দিয়ে শাস্তি দেয় এই টিচার। একথা শুনে কুকড়ে গেল হাসান। বলল আমি যেন কখনওই এই শাস্তির মুখোমুখি না হই এটাই আশা করে ও। বললাম, এতদিন কপাল জোরে বেঁচে গেছি। যদিও জানতাম এর সঙ্গে কপালের কোনও সম্পর্ক নেই। আমিও ক্লাসে যথারীতি কথা বলি। কিন্তু আমার বাবা বড়লোক মানুষ, ওকে সবাই চেনে। সেই জন্যেই আমাকে ধাতব রডের শাস্তি থেকে রেহাই দেওয়া হয়।

ডালিম গাছের ছায়ায় নিচু দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম আমরা। আর এক বা দুই মাসের ভেতর রোদে পোড়া হলদে আগাছার চাদর পাহাড়ের শরীর ঢেকে ফেলবে। কিন্তু সেবছর বসন্তের বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়েছে তা, ফলে ঘাস এখনও সবুজ রয়ে গেছে। এখানে ওখানে বুনো ফুলের ছোপ। আমাদের নিচে ওয়াযির আকবার খানের শাদা দেয়াল আর চ্যাপ্টা ছাদের বাড়িগুলো রোদ লেগে ঝিলিক মারছে। উঠোনে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলো প্রজাপতির মতো হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

গাছ থেকে ডযেনখানেক ডালিম পেড়ে নিয়েছিলাম আমরা। সঙ্গে করে আনা গল্পটা খুলে ধরলাম আমি। তারপর নামিয়ে রাখলাম আবার। উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে ঝরে পড়া একটা বেশী পাকা ডালিম তুলে নিলাম।

"এটা দিয়ে তোমাকে মারলে কী করবে?" ফলটা ওপর-নিচে লোফালুফি করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম।

হাসানের হাসি মুছে গেল। ওকে আমার চেনা হাসানের চেয়ে বুড়ো দেখাল। *বুড়ো?* সেটা কী সম্ভব? বলীরেখা ওর রোদে পোড়া চেহারায় আঁচড় কটেছে, ফ্রেমবন্দী করেছে ওর চোখ-মুখ। আমিই হয়ত একটা ছুরি দিয়ে ওই রেখাগুলো খোদাই করে থাকতে পারি।

"কী করবে তুমি?" আবার জিজ্ঞেস করলাম।

ওর চেহারা থেকে রঙ উবে গেছে। ওর পাশে যে গল্পটা পড়ব বলে কথা দিয়েছিলাম সেটার স্টেপল করা পাতাগুলো মৃদু হাওয়ায় উড়ছে। ডালিমটা ছুড়ে মারলাম ওর দিকে। বুকে লাগল ওর। লাল রসে বিস্ফোরিত হল ওটা। হাসানের চোখে বিস্ময় আর বেদনার ছাপ।

BanglaBook.org

"পাল্টা মারো আমাকে!" ধমকে উঠলাম। বুকের দাগ থেকে আমার মুখের দিকে তাকাল হাসান।

"উঠে দাড়াও! আমাকে মার!" বললাম আমি। উঠে দাঁড়াল হাসান। কিন্তু স্রেফ দাঁড়িয়েই রইল। ওকে দেখে জলোচ্ছ্বাসের টানে সাগরে ভেসে যাওয়া কোনও লোকের মতো লাগছে। অথচ একটু আগেও সৈকতে বেশ চমৎকার ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে।

আরেকটা ডালিম দিয়ে ওকে মারলাম। রসে ভরে গেল ওর মুখ। "আমাকে পাল্টা মারো!" বলে থুতু ফেললাম আমি। "আমাকে পাল্টা আগাত করো! নিকুচি করি তোমার!" আঘাত করলে ভালো হত। আমার খানিকটা হলেও সাজা হত। তাহলে হয়ত ঠিকমতো ঘুমাতে পারতাম; হয়ত আমাদের ভেতরের সম্পর্ক আবার আগের মতো হয়ে উঠত। কিন্তু আমি বারবার আঘাত করা সত্ত্বেও কিছুই করল না হাসান। "তুমি একটা ভীতুর ডিম!" বললাম আমি। "একটা ডরপুক ছাড়া আর কিছুই না!"

জানি না কতবার ওকে মেরেছিলাম। শুধু জানি শেষ পর্যন্ত যখন থেমেছিলাম, ক্লান্ত, হাঁপাচ্ছিলাম, একেবারে লালে লাল হয়ে গিয়েছিল হাসান, যেন কোনও ফায়ারিং স্কোয়াড গুলি করেছে ওকে। ক্লান্ত অবসন্ন হতাশ হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম।

তারপর একটা ডালিম তুলে নিল *বটে* হাসান। আমার দিকে এগিয়ে এল ও। ওটা ভেঙে আমার কপালে পিষে দিল। "ধরো," কর্কশ কণ্ঠে বলল, "এবার সন্তুষ্ট? এখন একটু ভালো লাগছে?" ঘুরে দাঁড়াল ও, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল।

চোখের পানি ছেড়ে দিলাম আমি, হাঁটুতে ভর দাঁড়িয়ে এপাশ ওপাশ দুলছি। "তোমাকে নিয়ে আমি কী করব, হাসান? কী করব আমি তোমাকে নিয়ে?" কিন্তু চোখের পানি শুকিয়ে আসার পর আমি যখন ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছি, তখন প্রশ্নটার জাবাব জানা হয়ে গেছে আমার।

১৯৭৬ সালের সেই গ্রীষ্মে তের বছর বয়সে পড়লাম আমি। আফগানিস্তানের শান্তি আর ভ্রাতৃত্বের শেষ বছরের আগের বছর। বাবা আর আমার মাঝের অবস্থা আবার শীতল রূপ নিতে শুরু করেছে। আমার মনে হয় টিউলিপ লাগানোর সময় তোলা সেই নির্বোধ প্রশ্নটাই–নতুন কাজের লোক নেওয়ার সেই প্রশ্নটা–এর সূচনা ঘটিয়েছিল। এখন কথাটা বলেছি বলে অনুশোচন হচ্ছে। সত্যিই তাই। কিন্তু আমার ধারণা, কথাটা না বললেও আমাদে

BanglaBook.org

সুখের সংক্ষিপ্ত পর্বের সমাপ্তি ঘটতই; হয়ত এতটা দ্রুত নয়; তবে শেষ হত। গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ প্লেটের উপর চামচ আর ফর্কের ঘঁষাঘষি জায়গা দখল করেছিল খাবারের সময় কথোপকথনের। বাবা সাপারের পর আবার স্টাডিতে ফিরে যাওয়া শুরু করেছিল। আমি দরজা বন্ধ করে নখ খুটে খুটে হাফিজ বা খৈয়ামের পাতা ওল্টাতে শুরু করেছিলাম। গল্প লিখতাম। খাটের নিচে গল্পগুলো জমিয়ে রাখতাম। যদি কখনও, যদিও আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল, বাবা আবার পড়ে শোনাতে বলে।

পার্টি আয়োজন করা সম্পর্কে বাবার লক্ষ্য ছিল এরকম: গোটা দুনিয়াকে যদি দাওয়াত করতে না পারলে তো সেটা কোনও পার্টিই হল না। আমার জন্মদিনের পার্টির সপ্তাহখানেক আগে নিমন্ত্রিতদের তালিকায় নজর বোলানোর সময় আমার চারশোরও বেশী কাকা আর খালার চারভাগের তিনভাগকেই চিনতে পারলাম না। এরা আমি তের বছর পর্যন্ত বেঁচে আছি দেখে আমাকে অভিনন্দন জানাতে আর উপহার দিতে আসবে। তারপরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আসলে আমার জন্যে আসছে না ওরা। আমার জন্মদিন ছিল বটে, কিন্তু আমি জেনে গিয়েছিলাম কে ছিল অনুষ্ঠানের আসল নায়ক।

বেশ কয়েকদিন ধরে গোটা বাড়ি বাবার ভাড়া করা কাজের লোকে গমগম করতে লাগল। ছিল কসাই সালাউদ্দিন, একটা বাছুর আর দুটো ভেড়া দড়িতে বেঁধে হাজির হয়েছিল সে। উঠোনে একটা পপলার গাছের পাশে নিজের হাতে জানোয়ারগুলো জবাই করল সে। "রক্ত গাছের জন্যে উপকারী," পপলার গাছের চারপাশের ঘাস রক্তে ভিজে লাল হয়ে ওঠার সময় একথা বলেছিল সে, মনে আছে। আমার অচেনা লোকজনকে দেখেলাম ছোটছোট তারের কুণ্ডলী, ছোট বাল্ব আর এক্সটেনশন কর্ডের স্পুল হাতে ওক গাছের ডাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে। বাকিরা উঠোনে ডযেন ডযেন চেয়ার টেবিল পাতছে। প্রত্যেকটা টেবিলের উপর বিছিয়ে দিচ্ছে টেবিল ক্লথ। পার্টির আগের রাতে বাবার বন্ধু শের-ই-না অ-এর কাবাব দোকানের মালিক দেল-মুহাম্মদ ব্যাগ ভর্তি মসলাপাতি নিয়ে হাজির হল। কসাইয়ের মতো দেল-মুহাম্মদও-কিংবা বাবা যেমন তাকে দেলু বলে ডাকত-সেবার বিনিমিয়ে টাকা নিতে অস্বীকার গেল। বলল বাবা তার পরিবারের জন্যে অনেক কিছু করেছে। দেলু মাংস সিরকায় ভেজানোর সময় রহিম খান ফিসফিস করে আমাকে বলেছিল যে রেস্তঁরা খোলার জন্যে দেলুকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিল বাবা। দেলু একদিন মর্সিডিস বেঞ্জ হাঁকিয়ে আমাদের ড্রাইভওয়েতে

BanglaBook.org

এসে বাবা টাকা না নেওয়া পর্যন্ত ফিরে যাবে না গোঁ ধরার আগে ওই টাকা ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়নি বাবা।

আমার ধারণা, সচরাচর যেভাবে পার্টিগুলোকে বিচার করা হয়ে থাকে, সেইহিসাবে আমার জন্মদিনের পার্টি বিরাট একটা সাফল্য ছিল। বাড়িটাকে এমন গমগমে অবস্থায় আর কখনও দেখিনি। ড্রিঙ্ক হাতে মেহমানরা হলওয়েতে গল্প করছে, সিঁড়িতে ধূমপান করছে। দরজার পাল্লার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানেই জায়গা পেয়েছে বসে পড়েছে ওরা: কিচেন কাউন্টার, ফয়ে, এমনকি স্টেয়ার ওয়েলে নিচে। গাছে ঝোলানো লাল-নীল বাতির নিচে বসেছে ওরা। সবজায়গায় লাগানো কেরোসিনের মশালের আলোয় জলজল করছিল ওদের চেহারা। বাগানের মুখোমমুখি বেলকনিতে একটা স্টেজ বানানোর ব্যবস্থা করেছিল বাবা। সারা উঠোন স্পীকার লাগিয়েছিল। নাচতে থাকা লোকদের মাথার উপর স্টেজে একটা অ্যাকোর্ডিয়ান বাজিয়ে গান গাইছিল আহমেদ যহির।

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটা মেহমানকে স্বাগত জানাতে হয়েছে আমাকে–বাবা এটা নিশ্চিত করেছে; পরের দিন কেউ যেন এই নালিশ করতে না পারে যে ছেলেকে আদবকায়দা না শিখিয়ে মানুষ করেছে ও। গালে শতশত চুমু খেলাম, একেবারে অচেনালোকদের সঙ্গে কোলাকুলি করলাম, উপহারের জন্যে ধন্যবাদ জনালাম তাদের। মেকি হাসি ফুটিয়ে রাখতে গিয়ে গাল ব্যথা হয়ে গেল।

বাবার সঙ্গে বারের কাছে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় কেউ একজন বলে উঠল, " হ্যাপি বার্থ-ডে, আমির।" বাবা মায়ের সঙ্গে আসেফ। আসেফের বাবা মাহমুদ বেঁটেখাট, লিকলিকে গড়নের মানুষ। গায়ের রঙ ময়লা। চেহারা সরু। ওর মা তানিয়া ছোটখাট ভীতু টাইপের মহিলা। সারাক্ষণ হাসছে আর চেখ পিটপিট করছে। ওদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আসেফ, হাসছে, দুজনেরই মাথা ছাড়িয়ে গেছে সে, ওদের কাঁধের উপর হাত ফেলে রেখেছে। ওদের আমাদের দিকে নিয়ে এল সে। যেন *সে-ই ওদের* এখানে নিয়ে এসেছে। যেন সে-ই ওদের অভিভাবক, আর ওরা ওর ছেলেমেয়ে। আমার ভেতর একটা ঝিমঝিম ভাব জেগে উঠল। আসার জন্যে ওদের ধন্যবাদ দিল বাবা।

"নিজের হাতে প্রজেন্ট বাছাই করেছি আমি," বলল আসেফ। তানিয়ার চেহারা কুঁচকে গেল। পালা করে আমার আর আসেফের দিকে তাকাতে লাগল সে। অবিশ্বাসের সঙ্গে হেসে চোখ পিটপিট করে উঠল। বাবা খেয়াল

BanglaBook.org

করেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলাম।

"এখনও সকার খেল নাকি, আসেফ জান?" জিজ্ঞেস করল বাবা। আমি যেন আসেফের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি, সব সময় এটাই চাইত বাবা।

হাসল আসেফ। কীভাবে যে এমন নিখুঁত হাসি দিয়েছিল সে, সত্যিই ভীতিকর। "নিশ্চয়ই, কাকা জান।"

"রাইট উইংয়ে না?"

"আসলে এ বছর সেন্টার ফরওয়ার্ডে চলে গেছি আমি," বলল আসেফ। "তাতে করে অনেক বেশী স্কোর করা যায়। আগামী সপ্তায় মেক্রো-রায়ান দলের সঙ্গে খেলতে যাচ্ছি আমরা। ভালো খেলা হওয়ার কথা। ওদের কয়েক জন ভালো খেলোয়াড় আছে।"

মাথা দোলাল বাবা। "কি জান, অল্প বয়সে আমিও সেন্টার ফরওয়ার্ড পজিশনে খেলেছি।"

"বাজি ধরে বলতে পারি চাইলে এখনও খেলতে পারো তুমি," বলল আসেফ। চমৎকার করে চোখ টিপে বাবাকে খুশী করে দিল সে।

বাবাও পাল্টা চোখ টিপল। "দেখা যাচ্ছে তোমার বাবা তোমাকে তার বিখ্যাত তোশামুদি স্বভাব ভালোই শিক্ষা দিয়েছে।" আসেফের বাবাকে কনুইয়ের গুঁতো দিল বাবা। ছোট মানুষটাকে আরেকটু হলে ফেলে দিচ্ছিল। মাহমুদের হাসিও তানিয়ার হাসির মতোই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল। আমি ভাবলাম কোনওভাবে কোথাও ছেলেটি ওদেরও ভীত করে তুলেছে কিনা। মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু মুখের দুপাশে একটু বাঁকা করে তোলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলাম না। বাবাকে আসেফের সঙ্গে খাতির করতে দেখে আমার পেটের ভেতরটা গোলাতে শুরু করেছিল।

আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল আসেফ। "ওয়ালি আর কামালও এসেছে। ওরা কিছুতেই তোমার জন্মদিনের অনুষ্ঠান মিস করতে চাইল না।" বলল আসেফ। অট্টহাসি খেলা করছে তার চেহারার আড়ালে। নীরবে মাথা দোলালাম আমি।

"আমাদের বাড়িতে একটা ভলিবল খেলার আয়োজন করার কথা ভাবছি আমরা," বলল আসেফ। "তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারো। চাইলে হাসানকেও আনতে পারো।"

"এতো বেশ ভালোই শোনাচ্ছে," উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাবার চেহারা। "তুমি কি বলো, আমির?"

"আমার আসলে ভলিবল ভালো লাগে না," বিড়বিড় করে বললাম।

BanglaBoi.org

বাবার চোখের মৃদু পলক পড়তে দেখলাম আমি। তারপর বিব্রতকর একটা নীরবতা নেমে এল।

"দুঃখিত, আসেফ জান," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল বাবা। আমার হয়ে ওর ক্ষমা চাওয়াটা বেশ লেগেছিল।

"থাক, এতে কোনও ক্ষতি নেই," বলল আসেফ। "তবে তোমার জন্যে দরজা খোলা রইল, আমির জান। যাক গে, শুনেছি তুমি নাকি পড়তে ভালোবাসো, তাই তোমার জন্যে একটা বই নিয়ে এসেছি। আমার প্রিয় বইগুলোর একটা।" আমার দিকে একটা কাগজে মোড়ানো জন্মদিনের উপহার বাড়িয়ে ধরল সে। "হ্যাপি বার্থ-ডে।"

সুতি শার্ট আর নীল স্ল্যাকস ছিল ওর পরনে। একটা লাল টাই, চকচকে কালো লোফার। গা থেকে কোলনের গন্ধ আসছিল। সোনালি চুল নিখুঁতভাবে ব্যাকব্রাশ করা। উপরে উপরে সে ছিল প্রতিটি বাবামায়ের স্বপ্নের প্রতিমূর্তি। শক্তিশালী, দীর্ঘদেহী, ভালো পোশাক পরা অমায়িক একটা ছেলে যার বুদ্ধি আর আকর্ষণীয় চেহারা আছে। বড়দের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার কথা বাদই থাকল। কিন্তু আমার কাছে তার চোখগুলো সব ফাঁস করে দিচ্ছিল। ওর চোখের দিকে যখন তাকাই, উপরের ভাবটা মিলিয়ে যায়, পেছনে লুকিয়ে থাকা উন্মাদনার ভাবটা বেরিয়ে আসে।

"নেবে না এটা, আমির," বলছিল বাবা।

"কী?"

"তোমার উপহার," তীর্যক কণ্ঠে বলল ও। "আসেফ জান তোমার জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছে।"

"ওহ," বললাম আমি। আসেফের হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে চোখ নামালাম। নিজের ঘরে চলে যেতে পারলে হত, ভাবলাম। এই লোকগুলোর কাছ থেকে দূরে, আমার বইয়ের কাছে।

"তো?" বলল বাবা।

"কী?"

নিচু গলায় কথা বলল বাবা। লোকজনের সামনে তাকে বিব্রত করলে এভাবেই কথা বলত সে। "আসেফ জানকে ধন্যবাদ দেবে না? ও তো অনেক ভালো একটা কাজ করেছে।"

বাবা ওকে আর এনামে না ডাকলেই ভালো, ভাবলাম। আমাকে কতবার "আমির জান" ডেকেছে ও? "ধন্যবাদ," বললাম আমি। আমার দিকে এমনভাবে তাকাল আসেফের মা যেন একটা কিছু বলতে চায়। কিন্তু বলল না

BanglaBook.org

কিছু। খেয়াল করলাম আসেফের বাবা-মায়ের কেউ একটা কথাও বলেনি। নিজেকে আর বাবাকে আর বিব্রত না করতে-এবং বিশেষ করে আসেফের কাছ থেকে সরে যাবার গরজেই-এক কদম পিছিয়ে এলাম আমি। "আসার জন্যে ধন্যবাদ," বললাম।

মেহমানদের ভীড় ঠেলে কোনওমতে আগে বাড়লাম আমি। রট আয়রন গেইটের ফাঁক গলে বেরিয়ে এলাম। আমাদের বাড়ির দুটো বাড়ি পরে একটা ফাকা বড় আবর্জনার লট ছিল। রহিম খানের কাছে বাবাকে বলতে শুনেছি এক জাজ সাহেব নাকি জায়গাটা কিনেছে। এখন এক আর্কিটেক্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করাচ্ছে। আকর্জনা, নুড়ি পাথর আর আগাছার কথা বাদ দিলে আপাতত জায়গাটা খালি পড়ে আছে।

আসেফের উপহারের মোড়াক খুলে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিলাম। তারপর চাঁদের আলোয় বইটার মলাট উল্টে ধরলাম। হিটলারের জীবনী। আগাছার একটা স্তূপে ছুড়ে ফেলে দিলাম ওটাও।

পড়শীর দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর পিছলে জমিনে নেমে এলাম। স্রেফ অন্ধকারে বসে রইলাম খানিক্ষণ। হাঁটুজোড়া বুকের সঙ্গে লাগানো, তাকিয়ে আছি তারাভরা আকাশের দিকে, রাত ফুরোনার অপেক্ষা ।

"তোমার না এখন মেহমানদের স্বাগত জানানোর কথা?" বলে উঠল একটা চেনা কণ্ঠস্বর। দেয়াল বরাবর আমার দিকে এগিয়ে আসছে রহিম খান।

"আমাকে কোনও দরকার নেই ওদের। জান না, বাবা আছে ওখানে?" বললাম। আমার পাশে এসে বসার সময় রহিম খানের হুইস্কির বরফ টুংটাং শব্দ তুলল। "তুমি মদ খাও, জানতাম না।"

"অনেক সময় খাই," বলল সে। ঠাট্টাচ্ছলে কনুই দিয়ে খোঁচা দিল আমাকে। "তবে কেবল গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে।"

আমি হাসলাম। "ধন্যবাদ।"

আমার দিকে ড্রিঙ্ক একটু কাত করল, চুমুক দিল। একটা সিগারেট ধরাল। বাবা আর সে সব সময় এই ফিল্টারবিহীন পাকিস্তানি সিগারেটটা খায়। "তোমাকে কি বলেছি যে আমি একবার প্রায় বিয়ে করেই বসেছিলাম?"

"তাই?" রহিম খানও বিয়ে করতে পারে-একথা ভেবে একটু হেসে বললাম আমি। বরাবর ওকে বাবার নীরব অল্টার ইগো, আমার লেখার মন্ত্রণাদাতা, বন্ধু ভেবে এসেছি। বিদেশ থেকে ফিরে আসার সময় আমার

BanglaBook.org

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

"আমি দুঃখিত," বললাম।

"তবে সেটাই ভালো হয়েছিল," [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। আমার পরিবার [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] যেতে দিত না। তুমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরের [illegible] তাকে [illegible] বলে ভাবতে না।" আমার দিকে তাকাল সে। "কিন্তু তাহলে, আমাকে যেকোনও [illegible] করতে পারো, তুমি, [illegible] [illegible] যেকোনও সময়।"

"আমি," [illegible] কণ্ঠে বললাম আমি। [illegible] [illegible] দিকে চেয়ে [illegible] সে, যেন অপেক্ষা করছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] গোপন কথার আভাস দিচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] বলে [illegible] [illegible] কিন্তু তাহলে আমার সম্পর্কে কী ভাববে সে? আমাকে ঘৃণা করবে। [illegible]

"যাও," বলে কি যেন আমার হাতে তুলে দিল সে। "তুমি [illegible] [illegible] [illegible]-কে?" [illegible] [illegible] একটা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপর [illegible] [illegible]। [illegible] পর [illegible] "তোমার [illegible] দেখার জন্যে," বলল সে। [illegible] [illegible] দিকে [illegible], [illegible] [illegible] কি যেন [illegible] হল, [illegible] দিল [illegible] [illegible]

"[illegible]!"

[illegible] বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। [illegible] [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] হয়ে উঠছে [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মতো [illegible] পড়ছে আর [illegible] [illegible] [illegible] করে [illegible] করে উঠছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] আর [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে উঠছে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এমন কিছু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিন [illegible] না। একটি [illegible] [illegible] করে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিকে [illegible] [illegible] একটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এল

নয়

পরদিন সকালে আমার রুমের মঝখানে বসে একটার পর একটা উপহারের বাক্স খুলছিলাম আমি। জানি না কেন ও নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়েছি। কারণ আমি স্রেফ ওগুলোর দিকে নিরাসক্ত চোখে দেখে রুমের একটা কোণে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিলাম। ওখানে একটা স্তূপ জমে উঠছিল: একটা পোলারয়েড ক্যামেরা, একটা ট্রান্সিসটর রেডিও, একটা বিরাট ইলেট্রিক ট্রেইন সেট-আর নগদ টাকা ভর্তি বেশ কয়েকটা খাম। জানতাম আমি কখনওই ওই টাকা খরচ করব না বা রেডিও শুনব না। আর ওই ইলেট্রিক ট্রেইনটা কখনও আমার ঘরে ট্র্যাকের উপর দিয়ে চলবে না। এর কোনও কিছুই চাইনি আমি। এসবই রক্তের বিনিময়ে পাওয়া। আমি টুর্নামেন্ট না জিতলে বাবা কখনওই ওই পার্টির আয়োজন করত না।

আমাকে দুটো উপহার দিয়েছিল বাবা। একটা পাড়ার প্রতিটি ছেলের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হতে বাধ্য এমন একটা জিনিস: একটা আনকোরা নতুন শউইন স্টিংরে-বাইসাইকলের রাজা। গোটা কাবুলে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা ছেলের কাছে নতুন স্টিংরে ছিল, আমি ছিলাম তাদের একজন। উঁচু হ্যান্ডলবার আর কালো র‍্যাবার গ্রিপস ছিল ওটার, আর বিখ্যাত বানানা সীট। স্পোকগুলো ছিল সোনালি রঙের। ক্যান্ডি আপেলের মতো-কিংবা রক্ত-লাল স্টিল ফ্রেমের বডি। অন্য কোনও ছেলে হলে পলকে বাইকটা নিয়ে নাচানাচি শুরু করত, সারা ব্লক ঘুরে আসত ওটা নিয়ে। কয়েক মাস আগে হলে আমিও হয়ত তাই করতাম।

"ওটা তোমার পছন্দ হয়েছে?" আমার রুমের দরজায় ঠেস দিয়ে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে জানতে চাইল বাবা। আমি অপ্রতিভভাবে ওর দিকে তাকিয়ে চট করে বললাম, "ধন্যবাদ।" ভাবলাম আরও অনেক খুশীর ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারলে ভালো হত।

"আমরা বেড়াতে যেতে পারি," বলল বাবা। আমন্ত্রণ বটে, কিন্তু তেমন আন্তরিক নয়।

"গেলেও পরে। আমি এখন একটু ক্লান্ত," বললাম।

"নিশ্চয়ই," বলল বাবা।

"বাবা?"

"কী?"

"আতশবাজির জন্যে ধন্যবাদ," বললাম আমি। ধন্যবাদ বটে, তবে সেটাও আন্তরিক নয়।

"একটু বিশ্রাম নাও," বলল বাবা, নিজের রুমের দিকে এগিয়ে গেল ও।

বাবার দেওয়া আরেকটা উপহার ছিল–এটা খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি ও–একটা রিস্ট ওঅচ। বজ্রপাতের মতো সোনালী রেখার আদলের কাঁটাসহ নীল রঙের ডায়াল ছিল ওটার। ওটা পরার চেষ্টাও করিনি। কোণের খেলনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এক মাত্র যে খেলনাটা ছুড়ে ফেলিনি সেটা হল রহিম খানের দেওয়া চামড়ায় মোড়ানো সেই নোট বুকটা। একমাত্র ওটাকেই রক্তের বদলে পাওয়া জিনিস বলে মনে হয়নি।

খাটের কিনারে বসে নোট বুকটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে লাগলাম। মনে মনে হুমায়রা সম্পর্কে বলা রহিম খানের কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখলাম। ওর বাবার মেয়েটাকে নাকচ করে দেওয়াটাই কীভাবে শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনক হয়েছিল। *নইলে মেয়েটা কষ্ট পেত।* হুমায়ুন কাকার প্রজেক্টর আটকে গেলে যেমন হত, ঠিক তেমনি একই ছবি বারবার আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠতে লাগল: মাথা নিচু করে আসেফ আর ওয়ালিকে মদ ঢেলে দিচ্ছে হাসান। হয়ত এটাই শেষ পর্যন্ত মঙ্গলজনক *হবে*। ওর ভোগন্তি কমাবে। আমারও। যেভাবেই হোক এটুকু স্পষ্ট হয়ে গেছে: আমদের একজনকে বিদায় নিতে হবে।

সেদিন বিকেলে, প্রথম আর শেষবারের মতো শউনিকে চালানোর জন্যে বের করে আনলাম। বার দুই সারা ব্লক ঘুরে বেড়ালাম, ফিরে এলাম তারপর। ওটা নিয়েই সোজা পেছনের উঠোনে চলে এলাম। এখানে গত রাতের পার্টির পরের আবর্জনা সাফ করছিল আলি আর হাসান। কাগজের কাপ, দোমড়ানো ন্যাপকিন আর সোডার খালি বোতল সারা উঠোনময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। চেয়ার গোটাচ্ছিল আলি, দেয়ালের গায়ে ঠেস

দিয়ে রাখছিল ওগুলো। আমাকে দেখে হাত নাড়ল সে।

"*সালাম*, আলি," পাল্টা হাত নেড়ে বললাম।

একটা আঙুল তুলে আমাকে দাঁড়াতে বলল সে। লিভিং কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে গেল তারপর। এক মুহূর্ত বাদে কি যেন একটা হাতে করে আবার বেরিয়ে এল। "কাল রাতে তোমাকে এটা দেওয়ার ফুরসত পাইনি আমি আর হাসান," একটা বাক্স আমার হাতে দিতে দিতে বলল সে। "এটা খুবই নগন্য, তোমার উপযুক্ত নয়, আমির আগা। তারপরেও আশা করি তোমার পছন্দ হবে। হ্যাপি বার্থ-ডে।"

আমার গলায় কি যেন দলা পাকিয়ে উঠছিল। "ধন্যবাদ, আলি," বললাম। ওরা অমার জন্যে কিছু না কিনলেই ভালো ছিল, ভাবলাম। বাক্সটা খুলে আনকোরা নতুন একটা *শাহনামা* দেখতে পেলাম। শক্ত মলাটের একটা বই, প্যাসেজগুলোর নিচে ঝলমলে সব ছবি। এই তো সদ্যজাত ছেলে কাই খসরুর দিকে চেয়ে আছে ফেরাঙ্গিস। এখানে আপ্রসিয়াব ঘোড়া হাঁকাচ্ছে। তলোয়ার হাতে সেনাদলের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আর রুস্তম তো আছেই–আপন ছেলে আর যোদ্ধা সোহরাবকে মারাত্মকভাবে জখম করেছে। "দারুণ," বললাম আমি।

"হাসান বলল তোমার কপিটা অনেক পুরোনো, ছিড়ে গেছে। কয়েকটা পাতাও নাকি খোয়া গেছে," আলি বলল। "এটার সব ছবি কালি কলম দিয়ে হাতে আঁকা," গর্বের সঙ্গে বলল সে। বইটার দিকে তাকাল যেটা সে বা তার ছেলের কেউই পড়তে পারে না।

"খুবই সুন্দর," বললাম আমি। আসলেও তাই। বইটা খুব সস্তা বলেও মনে হল না। আলিকে বলতে চাইলাম, বই নয়, বরং আমিই অনুপযুক্ত। আবার বাইসাইকেলে চেপে বসলাম। "আমার হয়ে হাসানকে ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়ো," বললাম আমি।

শেষ পর্যন্ত বইটা আমার ঘরের কোণের সেই উপহারের স্তূপেই ছুড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু বারবার আমার দৃষ্টি ওটার দিকে ছুটে যাচ্ছিল। তো ওটাকে একেবারে তলায় পাঠিয়ে দিলাম। সেরাতে ঘুমোতে যাবার আগে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম আমার নতুন ঘড়িটা ও দেখেছে কিনা।

পরের দিন সকালে আলি কিচেনে নাশতার টেবিল পরিষ্কার করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। থালাবাসন ধুয়ে ঘর মোছা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। শোবার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থেকে আলি আর হাসান চাকাঅলা খালি ঠেলাগাড়ি নিয়ে বাজারের মুদি দোকানের উদ্দেশে বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।

BanglaBook.org

তারপর উপহারের স্তূপ থেকে নগদ টাকার কয়েকটা খাম আর খেলনা ঘড়িটা তুলে নিলাম। পা টিপে টিপে বের হয়ে এলাম ঘর থেকে। বাবার স্টাডির সামনে থেমে কবাটে গায়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। সারা সকাল ওখানেই ছিল সে, একের পর ফোন করছিল। এখন পরের সপ্তাহে কার্পেটের একটা চালান আসার কথা নিয়ে আলাপ করছে যেন কার সঙ্গে। নিচে নেমে উঠোন পার হয়ে লোকাত গাছের পাশে আলি আর হাসানের লিভিং কোয়ার্টারে ঢুকে পড়লাম। হাসানের ম্যাট্রেসটা উঁচু করে আমার নতুন ঘড়ি আর একমুঠো আফগান টাকা রেখে দিলাম ওটার নিচে।

আরও আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর বাবার ঘরের কড়া নাড়লাম। তাকে বললাম এবার হয়ত অনেক দিন ধরে বলা মিথ্যের এক বিরাট ফর্দের শেষ হবে।

আমার বেডরুমের জানালা দিয়ে দেখলাম আলি আর হাসান মাংস, *নান*, ফল আর সব্জিভর্তি ঠেলাগাড়ি নিয়ে ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে আসছে। বাবাকে দেখলাম বাড়ি থেকে বের হয়ে আলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম না আমি। বাবা ওদের ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল। আলি সায় জানাল। আলাদা হয়ে গেল ওরা। বাড়ির দিকে ফিরে এল বাবা। হাসানের পিছু পিছু নিজের ঘরে চলে গেল আলি।

কয়েক মুহূর্ত পরে আমার দরজায় টোকা দিল বাবা। "আমার অফিসে এস," বলল ও। "আমরা সবাই মিলে এর একটা বিহিত করতে যাচ্ছি।"

বাবার স্টাডিতে চলে এলাম। একটা চামড়ার সোফায় বসলাম। তিরিশ বা চল্লিশ মিনিট পরে আলি আর হাসান এসে যোগ দিল।

ওদের লাল আর ফোলাফোলা চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ওরা দুজনই কাঁদছিল। বাবার সামনে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল ওরা। কবে থেকে এমন দুঃখ দেওয়ার কাজে নিপুন হয়ে উঠেছি বোঝার চেষ্টা করলাম আমি।

সোজাসুজি কাজের কথা পাড়ল বাবা, জিজ্ঞেস করল, "টাকাটা তোমরা চুরি করেছ? আমিরের ঘড়িটা তুমি চুরি করছে, হাসান?"

হাসানের জবাব ছিল একটা মাত্র শব্দ। ক্ষীণ শুকনো গলায় ও জবাব দিল: "হ্যাঁ।"

আমি কুকড়ে গেলাম। যেন কেউ আমাকে চড় কষেছে। আমার বুক ভেঙে গেল। প্রায় সত্যি কথা বলে বসতে যাচ্ছিলাম। তারপর বুঝতে পারলাম: এটা হচ্ছে আমার জন্যে হাসানের শেষ উৎসর্গ। সে অস্বীকার গেলে বাবা ওকে বিশ্বাস

BanglaBook.org

করত, কারণ আমরা সবাই জানি হাসান কখনও মিথ্যা কথা বলে না। বাবা ওকে বিশ্বাস করলে আমি অভিযুক্ত হয়ে পড়তাম। আমাকে জবাবদিহি করতে হত। আমার আসল চেহারা বের হয়ে যেত। বাবা আর কখনওই আমাকে বিশ্বাস করত না। এর ফলে আরেকটা জিনিস বোঝা হয়ে গেল: আমি যে ওই গলির সব ঘটনা দেখেছি, হাসান সেটা জানে। আমি ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম, আঙুলটিও নাড়িনি। ও জানে আমি ওর সঙ্গে বেঈমান করেছি, তারপরও আরও একবার আমাকে উদ্ধার করছে সে। হয়ত শেষ বারের মতো। ঠিক ওই মুহূর্তে ওকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম আমি। আর কাউকে যতটুকু ভালোবাসতে পারি তার চেয়ে অনেক বেশী ভালোবেসেছি ওকে। ওকে বলতে ইচ্ছে করছিল আমিই আসলে ঘাসের আড়ালে গা ঢাকা দেওয়া থাকা সাপ, লেকের দানো। এই উৎসর্গের উপযুক্ত নই আমি। আমি একটা মিথ্যুক, চোর। হয়ত বলেই বসতাম, কিন্তু আমার একটা অংশ খুশী হয়ে উঠেছিল। খুশী হয়ে উঠেছিল এই জন্যে যে শিগগিরই এর শেষ হবে। ওদের তাড়িয়ে দেবে বাবা। একটু খারাপ লাগবে বটে, কিন্তু জীবন যথারীতি চলতে থাকবে। সেটাই চাইছিলাম আমি, এগিয়ে যেতে, ভুলে যেতে, নতুনভাবে সব শুরু করতে। বুক ভরে আবার শ্বাস নিতে সক্ষম হয়ে উঠতে চেয়েছি আমি।

কিন্তু বাবা আমাকে একথা বলে চমকে দিল, "তোমাকে আমি মাফ করে দিলাম।"

মাফ? কিন্তু চুরি তো ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সবচেয়ে বড় গুনাহ। *যখন কাউকে খুন করলে, একটা প্রাণ চুরি করলে তুমি। তুমি তার স্ত্রীর স্বামীর অধিকার চুরি করলে, ছেলেমেয়েদের বাবার অধিকার চুরি করলে। যখন তুমি মিথ্যে বললে, কারও সত্যি জানার অধিকার চুরি করলে তুমি। চুরির মতো এত খারাপ কাজ আর নেই।* বাবা কি আমাকে কোলে বসিয়ে এসব কথা বলেনি? তাহলে কীভাবে সে হাসানকে মাফ করে দিতে পারে? বাবা এটা মাফ করে দিতে পারলে কেন আমাকে তার পছন্দের ছেলে না হওয়ার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেনি? কেন–

"আমরা চলে যাচ্ছি, আগা সাহিব," বলল আলি।

"কী?" বলে উঠল বাবা, ওর মুখ থেকে রঙ সরে যেতে শুরু করেছে।

"এখানে আর থাকতে পারব না আমরা," বলল আলি।

"কিন্তু আমি তো ওকে মাফ করে দিয়েছি, আলি, শুনতে পাওনি?" জিজ্ঞেস করল বাবা।

"এখন এখানে আমাদের পক্ষে জীবন কাটানো অসম্ভব হবে, আগা সাহিব।

BanglaBook.org

আমরা চলে যাচ্ছি," হাসানকে কাছে টেনে নিল আলি। ছেলের কাঁধের উপর দিয়ে হাত জড়াল। রক্ষা করার একটা ভঙ্গি এটা। আমি জানতাম কার কাছ থেকে ওকে রক্ষা করতে চাইছে সে। আমার দিকে নজর ফেরাল আলি। ওর শীতল, ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে আমি বুঝে গেলাম সবকথাই তাকে বলেছে হাসান। সবকিছু বলেছে, আসেফ আর তার বন্ধুরা ওর কী করেছে, ঘুড়ির কথা, আমার কথা। অদ্ভুতভাবে একথা ভেবে আমি খুশী হলাম যে অন্তত একজন জানে আমি আসলে কী। ভান করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি।

"টাকা বা ঘড়ির পরোয়া করি না আমি," হাত মেলে দিয়ে তালু উঁচু করে বলল বাবা। "তোমরা কেন একাজ করছ বুঝতে পারছি না...'অসম্ভব' বলে কী বোঝাতে চাইছ?"

"আমি দুঃখিত, আগা সাহিব, কিন্তু আমাদের ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।"

উঠে দাঁড়াল বাবা, ওর চেহারায় বিষাদের একটা ছায়া। "আলি, আমি কি তোমাদের সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিইনি? হাসান আর তোমার সঙ্গে কি ভালো ব্যবহার করিনি? আলি, তুমিই আমার ভাই, যে-ভাই কোনও দিন ছিল না আমার। সেটা তুমি জান। দয়া করে একাজ করো না।"

"ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুল না, আগা সাহিব," বলল আলি। তার মুখটা বেঁকে উঠল। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হল বুঝি ভেঙচি কাটতে দেখছি। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম কত গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছি আমি। দুঃখের কালো পর্দা টেনে দিয়েছি সবার উপর। এমনকি আলির অসাড় চেহারা পর্যন্ত সেই দুঃখকে লুকোতে পারছে না। জোর করে হাসানের দিকে তাকালাম আমি। কিন্তু নিচের দিকে চেয়ে আছে ও। কাঁধজোড়া নুয়ে পড়েছে। শার্টের হেমের একটা আলগা সুতো প্যাঁচাচ্ছে ওর আঙুল।

এখন আবেদন করছে বাবা। "অন্তত কারণটা তো বলবে! আমি জানতে চাই!"

বাবাকে বলল না আলি, ঠিক হাসান চুরির কথা স্বীকার যাবার সময় যেমন কোনও প্রতিবাদ করেনি। কারণটা কখনও বলতে পারব না, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম ওরা দুজন ওদের অন্ধকার কুঁড়ে ঘরে কাঁদছিল। আমাকে ধরিয়ে না দিতে কাকুতি মিনতি করছিল হাসান। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে গিয়ে আলিকে কেমন কষ্ট করতে হয়েছে সেটা বুঝতে পারছিলাম না।

"আমাকে বাস স্টেশনে নিয়ে যাবে?"

"তোমাকে একাজ করতে নিষেধ করছি!" গর্জে উঠল বাবা। "আমার

BanglaBook.org

কথা শুনতে পাচ্ছ? তোমাকে নিষেধ করছি!"

"সম্মানের সঙ্গেই বলছি, তুমি আমাকে কোনও ব্যাপারেই নিষেধ করতে পারো না, আগা সাহিব," বলল আলি। "আমরা আর তোমার এখানে কাজ করছি না।"

"কোথায় যাবে?" জিজ্ঞেস করল বাবা, ওর কণ্ঠস্বর ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।

"হাযারাজাত।"

"তোমার চাচাত ভাইয়ের কাছে?"

"হ্যাঁ। আমাদেরকে বাস স্টেশনে নিয়ে যাবে, আগা সাহিব?"

এবার বাবাকে এমন একটা কাজ করতে দেখলাম যা কখনওই করতে দেখিনি ওকে: কাঁদল সে। একটা পূর্ণ বয়স্ক লোককে কাঁদতে দেখে খানিকটা ভীত হয়ে উঠলাম আমি। বাবার কান্নার কথা না। "প্লিজ," বলছিল বাবা, কিন্তু আগেই দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আলি। হাসান তার পিছু নিয়েছে। বাবার বলার ভঙ্গি কখনও ভুলব না আমি, আবেদনের বেদনা, ভয়।

কাবুলে গ্রীষ্মকালে কদাচিত বৃষ্টি হয়। অনেক দূরে ভেসে থাকে নীল আকাশ। ব্র্যান্ডিং আয়রনের মতো ঘাড়ের উপর জ্বলুনি তুলতে থাকে সূর্য। সারা বসন্তকাল জুড়ে আমি আর হাসান যে-নালায় পাথর ছুঁড়ে মেরেছি, সেটা এখন শুকনো খটখটে। ধূলো উড়িয়ে চলে যায় রিকশা। লোকেরা যোহরের দশ *রাকা'ত নামায* পড়ার জন্যে মসজিদে যায়, তারপর ঘুমানোর জন্যে যে যেখানে পারে ছায়ার সন্ধানে ফিরতি পথ ধরে। সন্ধ্যার শীতল পরিবেশের অপেক্ষায় থাকে। গ্রীষ্মকালের মানে ছিল দীর্ঘ স্কুলের সময়, ঠাসা ক্লাস রুমে হাওয়াবাতাসহীন অবস্থায় কোরান থেকে *আয়াত* পাঠ করার যুদ্ধ করা। ওই দীর্ঘ বিদেশী আরবি শব্দগুলোকে জিভে নাচানোর প্রয়াস পাওয়া। এর মানে ছিল মোল্লারা গুনগুন করে চলার সময় যখন গরম হাওয়া স্কুলের উঠোনের ওপাশের পায়খানা থেকে দুর্গন্ধ বয়ে নিয়ে আসত তখন হাত দিয়ে মাছি মারা। সেই হাওয়া নিঃসঙ্গ জীর্ণ বাস্কেটবল হুপের চারপাশে ধূলির ঘূর্ণি তুলত।

কিন্তু বাবা আলি আর হাসানকে বাস স্টেশনে নিয়ে যাবার দিন বিকেলে বৃষ্টি হল। ঝড়ো মেঘ ধেয়ে এসে আকাশটাকে লোহার মতো ধূসর করে দিল। কয়েক মিনিটের ভেতরই মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। ঝরে পড়া জলের অবিরাম হিসহিস আওয়াজ আমার কান ভারি করে তুলল।

বাবা নিজে ওদের বামিয়ানে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু আলি প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার জানালার বৃষ্টি-ভেজা আবছা কাঁচ দিয়ে দেখলাম

BanglaBook.org

ওদের সমস্ত জিনিসপত্রে ঠাসা একটা মাত্র স্যুটকেস গেইটের বাইরে অলস দাঁড়িয়ে থাকা বাবার গাড়ির কাছে নিয়ে যাচ্ছে আলি। শক্ত করে বাঁধা জাজিম কাঁধে নিয়ে এগোচ্ছে হাসান। খালি ছাপড়ায় নিজের সমস্ত খেলনা ফেলে গিয়েছিল ও-পর দিন আবিষ্কার করেছি আমি, ঠিক আমার ঘরের জন্মদিনের উপহারের মতো এককোণে স্তূপ হয়ে ছিল।

বৃষ্টির পিচ্ছিল ধারা আমার রুমের জানালা বেয়ে নেমে আসছিল। দেখলাম জোরে ট্রাঙ্কটা বন্ধ করল বাবা। ইতিমধ্যে ভিজে সপ সপ করছে, ড্রাইভারের সীটের দিকে এগিয়ে গেল ও। ভেতরে উঁকি দিয়ে পেছনের সিটে বসা আলিকে কী যেন বলল। সম্ভবত তাকে বিরত রাখার শেষ ব্যর্থ প্রয়াস। খানিকক্ষণ এভাবে কথা বলল ওরা। বাবা ভিজে একাকার। একটা হাত গাড়ির ছাদের উপর। কিন্তু যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, আমি তার নুয়ে পড়া কাঁধ দেখে বুঝতে পারলাম জন্মের পর থেকে দেখে আসা আমার পরিচিত জীবনের ইতি ঘটেছে। পিছলে ভেতরে ঢুকল বাবা। হেডলাইট জ্বলে উঠল। বৃষ্টির ভেতর একজোড়া আলোর ফানেল তৈরি করল সেটা। এটা আমার আর হাসানের দেখা কোনও হিন্দি ছবির দৃশ্য হলে এই অংশে বের হয়ে যেতাম আমি। আমার খালি পা ছপাৎছপাৎ করে পানি ছিটাত, গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে থামতে বলতাম ওটাকে। পেছনের সিট থেকে হাসানকে বের করে বলতাম আমি দুঃখিত, দুঃখে আমার চোখের জল বৃষ্টি জলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। বৃষ্টির ভেতর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরতাম আমরা। কিন্তু এটা কোনও হিন্দি ছবি নয়। আমি দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু কাঁদিনি: গাড়ির পেছনে ছুটে যাইনি। বাবাকে কার্ব থেকে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যেতে দেখেছি। সেই লোকের সঙ্গে কথা বলছিল যার প্রথম মুখের ভাষা ছিল আমার নাম। বাবা রাস্তার মোড়ে বাঁমে বাঁক নেওয়ার মুহূর্তে পেছনের সিটে এলিয়ে পড়া হাসানকে পলকের জন্যে দেখতে পেলাম। কতবার ওখানে মার্বল খেলেছি আমি আর হাসান।

পিছিয়ে এলাম আমি, জানালার ভেতর দিয়ে কেবল বৃষ্টিধারা দেখতে পেলাম, মনে হচ্ছিল যেন গলন্ত রূপা।

BanglaBook.org

দশ

মার্চ ১৯৮১

আমাদের ঠিক উল্টো দিকে বসে আছে একটা অল্পবয়সী মেয়ে। জলপাই সবুজ পোশাক ওর পরনে, তার ওপর কালো শাল, রাতের তীব্র শীত ঠেকাতে মুখের চারপাশে শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে। ট্রাকটা যখনই ঝাঁকি খাচ্ছে বা কোনও ছোট গর্তে পড়ছে তখনই জোরে দোয়া পড়ছে সে। ট্রাকের প্রতিটি ঝাঁকির সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে জোরে *"বিসমিল্লাহ!"* বের হয়ে আসছে। তার স্বামী, মোটাসোটা ব্যাগি প্যান্ট পরা একলোক, একহাতে একটা বাচ্চাকে ধরে রেখেছে, আরেক হাতে তসবীহ জপছে। নীরব দোয়া পাঠের সময় ঠোঁট নড়ছে তার। আরও লোকজন আছে, বাবা আর আমিসহ সব মিলিয়ে দশবার জন। পায়ের কাছে স্যুটকেস নিয়ে পুরোনো রাশান ট্রাকের তারপুলিন ঢাকা ক্যাবের ভেতর অচেনা লোকদের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসে আছি আমরা।

আজ রাত দুটোর পর পর আমরা কাবুল ছেড়ে আসার পর থেকেই আমার পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি গুলিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। বাবা এমন কিছু কখনও বলেনি, কিন্তু আমি জানতাম আমার কার-সিকনেসকে আমার অনেক দুর্বলতার একটা বলেই মনে করত ও। কয়েকবার আমার পেটের ভেতরটা তীব্রভাবে পাক দিয়ে ওঠায় আমি গুঙিয়ে উঠেছি দেখে ওর বিব্রত চেহারায় সেই ছাপ দেখেছি আমি। তজবীহঅলা মোটা লোকটা–দোয়া-পড়ে-চলা মহিলার স্বামী–যখন জানতে চাইল আমি বমি করে দেব কিনা, বললাম করতেও পারি। অন্যদিকে

BanglaBook.org

চেয়ে রইল বাবা। লোকটা তার পাশের তারপুলিনের কাভার ওঠাল। ড্রাইভারের জানালার উপর বাড়ি মেরে থামতে বলল তাকে। কিন্তু ড্রাইভার করিম, হাড্ডিসার শ্যাম বর্ণের এক লোক বাজপাখির মতো চেহারায় ঠোঁটের উপর পেন্সিলের মতো সরু গোঁফঅলা এক লোক, মাথা নাড়ল।

"এখনও কাবুলের অনেক কাছে আমরা," পাল্টা জবাব দিল সে। "ওকে পেট সামলে রাখতে বল।"

চাপা কণ্ঠে কী যেন বলে উঠল বাবা। ওকে বলতে চাইলাম আমি দুঃখিত। কিন্তু হঠাৎ করে আমার মুখ বেয়ে লালা গড়াতে শুরু করল। গলার ভেতরে তেতো স্বাদ লাগল। ঘুরে তারপুলিন উঁচু করে চলন্ত ট্রাকের পাশ দিয়েই হড়হড় করে সব উগড়ে দিলাম। পেছনে অন্য যাত্রীদের কাছে ক্ষমা চাইছিল বাবা। যেন কার-সিকনেস একটা পাপ। যেন আঠার বছর বয়সে অসুস্থ হতে পারো না তুমি। করিম থামতে রাজি হওয়ার আগেই আরও দুবার বমি করলাম। আমি যাতে গাড়ির ভেতরটা গন্ধ করে ফেলতে না পারি মূলত সেটাই থামার কারণ। এটাই তার বেঁচে থাকার যন্ত্র। করিম আদম পাচারকারী। তখন বেশ লোভনীয় পেশা ছিল এটা–*শোরোভি*-অধিকৃত কাবুল থেকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পাকিস্তানে লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া। আমাদের কাবুলের দক্ষিণ-পুবে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরের জালালাবাদে নিয়ে যাচ্ছে সে। ওখানে দ্বিতীয় একদল রিফিউজিসহ তার ভাই তুরের একটা আরও বড় একটা ট্রাক অপেক্ষা করছে। আমাদেরকে খাইবার পাস পার করে পেশওয়ারে পৌঁছে দেবে।

করিম যখন রাস্তার এক পাশে ট্রাক থামাল আমরা তখন মাহিপুর ফলসের কয়েক কিলোমিটার দূরে। মাহিপুর কথাটার মানে হচ্ছে "উড়ন্ত মাছ"। এটা একটা উঁচু চূড়া, ১৯৬৭ সালে আফগানিস্তানের জন্যে জার্মানির বানানো হাইড্রো প্ল্যান্টের দিকে নেমে যাওয়া একটা খাড়া ঢাল রয়েছে এখানে। জালালাবাদে যাবার পথে বাবা আর আমি অসংখ্যবার এই চূড়ার উপর দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে গেছি। সাইপ্রেস গাছ আর আখের শহর, আফগানরা যেখানে শীতের অবকাশ কাটাত।

ট্রাকের পেছন দিয়ে একলাফে নেমেই রাস্তার পাশের নোংরা এম্ব্যাঙ্কমেন্টের দিকে ছুটে গেলাম। মুখ ভরে আছে লালায়, আরেকটা বমির দমক আসার লক্ষণ। অন্ধকার পর্দায় ঢাকা গভীর উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকা ক্লিফের কিনারে হোঁচট খেলাম। হাঁটুর উপর দুহাতে ভর দিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। বমি বের হয়ে আসার অপেক্ষা করছি। কোথায় যেন একটা ডাল ভাঙার শব্দ হল। একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া ঢালের গায়ে জন্মানো গাছের

BanglaBook.org

ডালপালার ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অলোড়ন তুলছে ঝোপঝাড়ে। নিচ থেকে উপত্যকার ভেতর দিয়ে বয়ে চলা পানির ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যায়।

রাস্তার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে যে-বাড়িতে সারা জীবন কাটিয়েছি সেটাই কীভাবে ছেড়ে চলে এসেছি সেকথা ভাবলাম। যেন অল্প সময়ের জন্যে বাইরে যাচ্ছি আমরা। *কোফতায়* মাখামাখি অবস্থায় সিঙ্কে পড়ে অছে থালাবাসন; ফয়েতে বেতের টুকুরিতে রয়েছে ময়লা কাপড়; বিছানা অগোছাল; ক্লোজিটে ঝুলছে বাবার ব্যবসার কোট; এখনও লিভিং রুমের দেয়ালে ঝুলে আছে পর্দা, বাবার স্টাডির শেল্ফে এখনও ঠাসাঠাসি হয়ে আছে মায়ের বইগুলো। আমাদের পালানোর চিহ্নগুলো সূক্ষ্ম: বাবা-মায়ের বিয়ের ছবিটা নেই; নেই মৃত হরিণের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা আমার দাদা আর বাদশাহ নাদেরের ছবিটাও। ক্লোজিট থেকে কয়েকটা পোশাক উধাও হয়েছে। পাঁচ বছর আগে আমাকে দেওয়া রহিম খানের চামড়ায় মোড়ানো নোট বইটাও নেই।

সকালে গত পাঁচ বছর ধরে আমাদের বাড়িতে কাজ করে চলা কাজের লোক জালালুদ্দিন হয়ত ভাববে আমরা হাঁটতে কিংবা গাড়ি নিয়ে বেড়াতে গেছি। ওকে জানাইনি আমরা। এখন আর কাবুলে কাউকে বিশ্বাস করার জো নেই। টাকা-পয়সার বিনিময়ে কিংবা ভয়ে লোকে অন্যের খবর ফাঁস করে দেয়: পড়শী পড়শীর খবর, ছেলেমেয়ে বাবা-মায়ের খবর, ভাই ভাইয়ের খবর, চাকর মনিবের খবর, বন্ধু বন্ধুর খবর। আমার তেরতম জন্মদিনের দিন অ্যাকোর্ডিয়ান বাজিয়েছিল গায়ক আহমেদ যাহির, তার কথা ভাবলাম। কয়েক জন বন্ধুকে নিয়ে গাড়িতে করে ঘুরতে বের হয়েছিল সে। পরে কেউ একজন রাস্তার পাশে তার বুলেটবদ্ধ লাশ খুঁজে পেয়েছে। মাথার পেছনে গুলি করে মারা হয়েছে তাকে। *রফিক* কিংবা কমরেডরা সব জায়গাতেই আছে। এরা কাবুলকে সোজা দুভাগ করে ফেলেছে। একদল আড়ি পাতে আরেক দল তা করে না। সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হচ্ছে কেউ জানে না কে কোন দলে। দর্জির দোকানে গিয়ে স্যুটের ফিটিং করানোর সময়ের মামুলি কোনও মন্তব্য তোমাকে সোজা পোলেহ-চারখির গরাদখানায় নিয়ে ফেলতে পারে। কসাইয়ের কাছে কার্ফ্যু নিয়ে অভিযোগ কর, তারপরই দেখবে একটা কালাশনিকভের মুখের দিকে তাকিয়ে আছ। এমনকি ডিনার টেবিলে, ঘরের একান্ত পরিবেশে লোকজনকে হিসাব করে কথা বলতে হয়–ক্লাসরুমেও *রফিকরা* ছিল। এরা ছাত্রদের তাদের বাবামায়ের উপর গোয়েন্দাগিরি করার শিক্ষা দিত–কখন শুনতে হবে, কার কাছে বলতে হবে।

মাঝরাতে রাস্তার মাঝখানে কী করছিলাম আমি? আমার তো বিছানায় কম্বলের নিচে থাকার কথা। পাশে শিথিল হয়ে যাওয়া পৃষ্ঠা অলা একটা বই।

BanglaBook.org

এটা স্বপ্ন না হয়ে পারে না। হতেই হবে। সকালে ঘুম থেকে জেগে জানালা দিয়ে উঁকি দেব আমি: সাইডওঅকে কোনও গম্ভীর চেহারার রাশান সেনাকে টহল দিতে দেখব না। আমার শহরে রাস্তাঘাটে কোনও ট্র্যাঙ্ক ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে না। অভিযোগের আঙুলের মতো কাঁপে ওগুলোর টারেট। কোনও শোরগোল নেই, কার্ফ্যু নেই, কোনও রাশান আর্মি পর্সোনাল ক্যারিয়ার বাজারের ভেতর দিয়ে ছুটে যাবে না। তারপর পেছনে বাবা আর করিমকে সিগারেট খেতে খেতে জালালাবাদে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার আলোচনা করতে শুনলাম। বাবাকে আশ্বস্ত করছিল করিম, তার ভাইয়ের একটা "বিরাট ফার্স্টক্লাস কোয়ালিটির ট্রাক আছে, পেশওয়ারের যাত্রা হবে একেবারেই সাধারণ। "চোখ বন্ধ করে তোমাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে ও," বলল করিম। আমার কানে এল সে আর তার ভাই চেক পয়েন্টের রাশান আর আফগান সৈন্যদের চেনে, কীভাবে ওরা একটা "দুতরফের জন্যে সুবিধাজনক" ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে সেসব বলছে সে। এটা কোনও স্বপ্ন নয়। যেন সেই সূত্রেই একটা মিগ হঠাৎ সগর্জনে আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল । সিগারেট ফেলে কোমর থেকে একটা হ্যান্ডগান বের করে আনল করিম। সেটা আকাশের দিকে তাক করে মুখ দিয়ে গুলি করার ভঙ্গি করল, তারপর থুতু ফেলে গাল দিয়ে উঠল মিগটাকে লক্ষ্য করে।

হাসান কোথায় ভাবলাম। তারপর ঘটল অনিবার্য ব্যাপারটা। আগাছার একটা ঝোপের উপর বমি করে ফেললাম। মিগের কানে তালা লাগানো আওয়াজে চাপা পড়ে গেল আমার বমি আর গোঙানির শব্দ।

বিশ মিনিট পর মাহিপুরের চেকপযেন্টে থামলাম অমরা। আমাদের ড্রাইভার ট্রাকের এঞ্জিন চালু রেখেই লাফ দিয়ে নেমে আগুয়ান কণ্ঠস্বরগুলোকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেল। পায়ের নিচে পিশে যাচ্ছে নুড়ি পাথর। সংক্ষিপ্ত এবং নিচু কণ্ঠে বাক্য বিনিময় হল। লাইটারের একটা ঝলক। "*স্পাসেবা।*"

আবার লাইটারের ঝলক। হেসে উঠল কেউ একজন। তীক্ষ্ণ খলখল একটা শব্দ চমকে দিল আমাকে। আমার উরু খামচে ধরল বাবার হাত। হাসতে থাকা লোকটা এবার গান ধরল। অস্পষ্ট বেসুরো গলায় রাশান উচ্চারণে গাইছে একটা পুরোনো আফগান বিয়ের গান:

আহেস্তা বারো, মাহ-ই-মান, আহেস্তা বারো।
ধীরে যাও, প্রিয় চাঁদ আমার, ধীরে যাও।

অ্যাসফল্টের উপর আওয়াজ তুলছে বুটের হীল। ট্রাকের পেছনে ঝোলানো তারপুলিনটা তুলে ফেলল কেউ একজন। তিনটা মুখ উঁকি দিল। একটা করিমের, বাকি দুজন সৈন্য; একটা আফগান, আর অন্যটা হাসিমুখ এক রাশান, বুলডগের মতো চেহারা, মুখের কোণে একটা সিগারেট ঝুলছে। ওদের পেছনে হাড়-রঙা এটা চাঁদ ঝুলছে আকাশের গায়ে। করিম আর আফগান সৈনিক পশতু ভাষায় নিজেদের মধ্যে কি যেন কথাবার্তা বলল। আমি সামান্য অংশ বুঝতে পারলাম–তুরের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে একটা কিছু। রাশান সৈনিকটি ট্রাকের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিল। বিয়ের গানটা গাইছিল সে-ই, টেইলগেইটের উপর আঙুল দিয়ে তাল ঠুকছে। এমনকি চাঁদের ম্লান আলোতেও একের পর এক যাত্রীদের উপর চোখ বোলানোর সময় তার চোখে ফুটে ওঠা চকচকে দৃষ্টি দেখতে পেলাম। ঠাণ্ডা সত্ত্বেও তার কপালে ঘামের রেখা দেখা দিয়েছিল। কালো শাল পরা মহিলার উপর স্থির হল তার চোখ। চোখ না সরিয়েই রাশান ভাষায় করিমের সঙ্গে কথা বলল সে। রাশান ভাষাতেই কাটাকাটা স্বরে জবাব দিল করিম। আফগান সৈনিকও নিচু স্বরে বোঝানোর ভঙ্গিতে একটা কিছু বলল। কিন্তু রাশান সেনা চিৎকার করে কি যেন বলতেই কুকড়ে গেল ওরা দুজন। গলা খাকারি দিল করিম। মাথা নিচু করল সে। বলল সৈনিকটা ট্রাকের পেছনে মেয়েটাকে নিয়ে আধা ঘণ্টা কাটাতে চায়।

তরুণী মুখের উপর শাল টেনে দিয়েছিল। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তার স্বামীর কোলে বসা ছোট্ট শিশুটিও কাঁদতে শুরু করল। স্বামী বেচারার চেহারা আকাশের চাঁদের মতোই ম্লান হয়ে এল। করিমকে সে বলল "মিস্টার সৈনিক সাহিবকে" একটু দয়া দেখাতে বলতে। তারও তো নিশ্চয়ই বোন বা মা আছে। স্ত্রীও আছে নিশ্চয়ই। করিমের কথা শুনল রাশান, তারপর একটানা বকবক করতে শুরু করল।

"আমাদেরকে পাস দেওয়ার জন্যে এটাই তার দাম," বলল করিম। স্বামী লোকটার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না সে।

"কিন্তু আমরা তো আগেই বেশ চড়া দাম মিটিয়েছি। ভালো টাকাই পেতে যাচ্ছে সে," বলল স্বামীটি।

করিম আর রাশান সৈনিক কথা বলল। "সে বলছে...সব দামের সঙ্গেই ট্যাক্স থাকে।"

এই সময় উঠে দাঁড়াল বাবা। এবার ওর উরুতে হাতের চাপ দেওয়ার পালা ছিল আমার। কিন্তু বাবা জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিল। পা সরিয়ে নিল সে। দাঁড়ানোর পর চাঁদ ঢাকা পড়ে গেল ওর শরীরের আড়ালে। "আমি

Banglabook.org

চাই এ লোকটাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করো তুমি," বলল বাবা। কথাটা করিমকে বললেও তাকিয়ে রইল রাশান সেনার দিকেই। "ওকে জিজ্ঞেস করো ওর কীসে লজ্জা হয়।"

কথা বলল ওরা। "সে বলছে এটা যুদ্ধ। যুদ্ধে কোনও লজ্জার ব্যাপার নেই।"

"বলো ভুল হচ্ছে তার। যুদ্ধ শালীনতা নাকচ করে দেয় না। বরং শান্তির সময়ের চেয়ে বেশী প্রয়োজন *দাবী* করে।"

সব সময়ই কি তোমাকে বীর হতে হবে? ভাবলাম আমি। আমার মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল। *একবারের জন্যেও কি যা হবার হতে দিতে পারো না?* কিন্তু আমি জানতাম ওর পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। এটা ওর ধাত নয়। সমস্যাটা হচ্ছে, ওর স্বভাবের করণে আমাদের সবাইকে প্রাণ খোয়াতে হবে।

করিমকে কি যেন বলল রাশান সৈনিক। তার মুখে একটা হাসির রেখো ফুটে উঠেছে। "আগা সাহিব," করিম বলল, "এই *রাসিরা* আমাদের মতো নয়। এরা সম্মান বা শ্রদ্ধা সম্পর্কে কিছুই জানে না।"

"কী বলেছে সে?"

"সে বলছে তোমার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিতে মজা পাবে সে, যেমন..."

থেমে গেল করিম। কিন্তু প্রহরীর নজর কেড়ে নেওয়া মহিলার দিকে তাকাল সে। সৈনিকটা অসমাপ্ত সিগারেটটা ফেলে দিয়ে হ্যান্ডগানটা হোলস্টার থেকে বের করে এনেছে। *তো এখানেই মরতে যাচ্ছে বাবা। এভাবেই ঘটতে যাচ্ছে ব্যাপারটা।* মনে মনে স্কুলে শেখা একটা দোয়া পড়তে লাগলাম আমি।

"ওকে বলো এই অশালীন ব্যাপারটা ঘটতে দেওয়ার আগে আমি বরং এক হাজার গুলি হজম করতে রাজি আছি," বলল বাবা। চট করে আমার মন ছয় বছর আগের সেই শীতকালে ফিরে গেল। আমি একটা গলির মুখ থেকে উঁকি মারছি। কামাল আর ওয়ালি হাসানকে চেপে ধরে রেখেছে। আসেফের নিতম্বের পেশীগুলো শক্ত আর শিথিল হচ্ছে। তার কোমর একবার সামনে আরেকবার পেছনে যাচ্ছে। বীর ছিলাম বটে। ঘুড়িটা নিয়ে *বাকওয়াজি* করেছি। অনেক সময় আমি ভাবি আসলেই আমি বাবার ছেলে কিনা।

বুলডগের মতো চেহারার রাশান সৈনিকটি অস্ত্র তাক করল।

"বাবা, দয়া করে বসো," আমি বললাম, ওর শার্টের হাতা ধরে টান মারলাম, "মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি তোমাকে গুলি করার কথা ভাবছে সে।"

BanglaBook.org

চাপড় মেরে আমার হাত সরিয়ে দিল বাবা। "তোমাকে কি আমি কিছুই শেখাইনি?" ধমকে উঠল। হাসতে থাকা সৈনিকটির দিকে তাকাল ও। "ওকে বলে দাও আমাকে যেন প্রথম গুলিতেই মারতে পারে। কারণ আমি যদি না মরি, ওকে স্রেফ টুকরো টুকরো করে ফেলব, ওর বাবার গুল্লি মারি আমি!"

তর্জমা শোনার সময় রাশান সৈনিকের মুখের হাসি এতটুকু ম্লান হল না। বন্দুকের সেফটি ক্লিক করল সে। বাবার বুকের দিকে তাক করল ওটার নল। আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে এসেছে। ধড়াশ ধড়াশ করছে। হাতের ভাঁজে মুখ লুকালাম আমি।

গর্জে উঠল বন্দুকটা।

তাহলে হয়ে গেছে। আঠার বছর বয়সে এখন একা হয়ে গেছি আমি। এই দুনিয়ায় আমার আর কেউ রইল না। বাবা মারা গেছে, এখন কবর দিতে হবে ওকে। ওকে কোথায় কবর দেব? তারপর কোথায় যাব আমি?

কিন্তু চোখের পাতা একটু ফাঁক করতেই আমার মাথার ভেতরে চলতে থাকা এইসব এলোমেলো ভাবনা থেমে গেল। দেখলাম বাবা দাঁড়িয়ে আছে। অন্যদের সাথে দ্বিতীয় একটা রাশান সৈন্যকে দেখতে পেলাম আমি। এরই উঁচু করে ধরা অস্ত্র থেকে ধোঁয়া বের হয়ে আসছে। বাবাকে যে সৈনিকটা গুলি করতে যাচ্ছিল, সে আগেই তার অস্ত্র হোলস্টারে ভরে রেখেছে। এক পা থেকে আরেক পায়ের শরীরের ভর বদল করছে সে। আগে আর কখনও এমন একই সঙ্গে হাসি আর কান্নার অনুভূতি হয়নি আমার।

ধূসর চুল আর ভারিক্কি গড়নের দ্বিতীয় রাশান সৈনিকটি ভাঙা ভাঙা ফারসিতে আমাদের সঙ্গে কথা বলল। কমরেডের আচরণের জন্যে ক্ষমা চাইল সে। "রাশিয়া যুদ্ধ করার জন্যে ওদের এখানে পাঠিয়েছে," বলল সে, "কিন্তু ওরা আসলে স্রেফ ছেলেমানুষ, এখানে আসার সময় ড্রাগের মজা পেয়েছে ওরা।" তরুণ সৈনিকটির দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকাল সে, যেন বেয়াদব ছেলের দিকে তাকাচ্ছে কোনও বিরক্ত বাবা। "এই ছেলেটি এখন ড্রাগে আসক্ত হয়ে পড়েছে। ওকে থামানোর চেষ্টা করেছি আমি..." হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানাল সে।

কয়েক মুহূর্ত পরে আমরা আবার চলতে শুরু করেছিলাম। একটা হাসির আওয়াজ কানে এল আমার। তারপর প্রথম সৈনিকটির গলার অওয়াজ। অস্পষ্ট, বেসুরো গলায় বিয়ের গান গাইছে সে।

BanglaBook.org

আমরা নীরবে আরও পনের মিনিটের মতো আগে বাড়ার পরে তরুণীর

স্বামীকে এমন একটা কাজ করতে দেখলাম যা আগেও অনেককেই করতে দেখেছি: বাবার হাতে চুমু খেল সে।

তুরের দুর্ভাগ্য। মাহিপুরে কথোপকথনের টুকরোটাকরা অংশ কি আমার কানে আসেনি?

সূর্য ওঠার আনুমানিক ঘণ্টাখানেক আগে জালালাবাদে ঢুকলাম আমরা। ঝটপট আমাদের ট্রাক থেকে নামিয়ে একতলা দরদালান, বাবলা গাছ আর বন্ধ দোকানপাটের ভরা দুটো মাটির রাস্তার মোড়ে দাঁড়ানো একটা একতলা বাড়ির ভেতর নিয়ে এল করিম। দ্রুত বাড়ির ভেতরে ঢোকার সময় শীতের কবল থেকে বাঁচতে কোটের কলার তুলে দিলাম আমি। আমাদের জিনিসপত্র পেছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। কেন যেন আমার নাকে মূলার গন্ধ লাগল।

আমাদের ম্লান আলোকিত খালি লিভিংরুমে নিয়ে আসার পরে সামনের দরজায় তালা মেরে দিল করিম। পর্দা হিসাবে চালানো ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়গুলো টেনে দিল। এবার বড় করে দম নিয়ে দুঃসংবাদটা জানাল আমাদের: ওর ভাই তুর আমাদের পেশওয়ারে নিয়ে যেতে পারছে না। ওর ট্রাকের এঞ্জিন আগের সপ্তাহে বিগড়ে গেছে। এখনও খুচরো যন্ত্রপাতির অপেক্ষা করছে তুর।

"*গত সপ্তাহে?*" জোরে বলে উঠল কে যেন। "কথাটা তোমার জানা থাকলে আমাদের এখানে নিয়ে এলে কেন?"

চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়ার আভাস পেলাম আমি। তারপর ঘরের মাঝখান দিয়ে নিমেষে চলে গেল কি যেন। পরক্ষণেই দেখলাম দেয়ালের উপর লুটিয়ে পড়েছে করিম। মেঝে থেকে দুই ফিট উপরে ঝুলছে তার স্যান্ডেল পরা পাজোড়া, গলায় পেঁচিয়ে আছে বাবার হাত।

"কেন তোমাকে বলছি আমি," ধমকে উঠল বাবা। "কারণ নিজের অংশের জন্যে টাকা পাবে সে। এটাই তার মাথা ব্যথা।" করিমের গলা দিয়ে গোঙানির শব্দ বের হয়ে আসছিল। মুখের কোণ থেকে লালা ঝরছে।

"ওকে নামিয়ে আনো, আগা সাহিব, ওকে তুমি মেরে ফেলবে," বলল যাত্রীদের একজন।

"সেরকমই ইচ্ছে ছিল আমার," বলল বাবা। রুমের অন্য কেউই যেকথাটা জানে না সেটা হল বাবা ঠাট্টা করেনি। লাল হয়ে গেছে করিমের চেহারা। হাত-পা ছুড়ছে সে। বাবা তার গলা টিপে ধরেই রাখল যতক্ষণ না রাশান সৈনিকের চোখে লেগে যাওয়া তরুণী মা তাকে থামতে অনুরোধ করল।

অবশেষে বাবা ওকে ছেড়ে দিতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বাতাসের জন্যে তড়পাতে লাগল করিম। নীরব হয়ে গেলে রুমটা। একঘণ্টারও কম সময় আগে চেনে না এমন একটা মেয়ের সম্ভ্রম বাঁচাতে স্বেচ্ছায় গুলি খেতে চেয়েছে বাবা, আর এখন একটা লোককে প্রায় মেরেই ফেলতে যাচ্ছিল সে। সেই একই মেয়ের আবেদন না হলে লোকটাকে ঠিকই মেরে ফেলত।

পাশের দরজার গায়ে একটা কিছু এসে পড়ল। না পাশের দরজায় না, নিচে।

"কী ওটা?" জিজ্ঞেস করল কেউ একজন।

"অন্যরা," হাঁপাতে হাঁপাতে বলল করিম, এখনও বাতাসের জন্যে আঁইটাই করছে। "বেসমেন্টে।"

"ওরা কতদিন ধরে অপেক্ষা করছে?" করিমের শরীরের উপর দাঁড়িয়ে জানতে চাইল বাবা।

গলা ডলছে করিম। "সপ্তাহখানেক হবে," ককিয়ে উঠে বলল সে।

"কত দিন?"

"কী?"

"খুচরো যন্ত্র আসতে কতদিন লাগবে?" গর্জে উঠল বাবা। কুকড়ে গেল করিম, কিন্তু কিছু বলল না। অন্ধকার ছিল বলে খুশি হলাম আমি। বাবার চেহারার খুনে ভাব দেখতে ইচ্ছে করছিল না আমার।

করিম বেসমেন্টের দিকে নেমে যাওয়া ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তোলা সিঁড়িগুলোর দরজা খোলামাত্র ছত্রাকের গন্ধের মতো বিকট একটা গন্ধ আঘাত হানল আমার নাকে। সারি বেঁধে নামতে লাগলাম আমরা। বাবার শরীরের ভারে ককাচ্ছে ধাপগুলো। শীতল বেসমেন্টে এসে দাঁড়ানোর পর মনে হল অন্ধকারে কারও চোখ পিটপিট করে দেখছে আমাদের। গোটা রুমে জটলা পাকানো ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল আমার। কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় ওদের ছায়া লুটিয়ে পড়ছে দেয়ালের গায়ে। বেসমেন্টে জুড়ে নিচু একটা গুঞ্জণ ধ্বনি ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও পানি ঝরে পড়ার আওয়াজও আসছে নিচে থেকে। এছাড়াও ভিন্ন একটা কিছু: একটা আঁচড়ানোর শব্দ।

আমার পেছনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবা, হাতের ব্যাগ ফেলে দিল।

করিম আমাদের বলেছে ট্রাকটা ঠিক হতে দিন দুইয়ের বেশী লাগবে না। তারপর আমরা পেশওয়ারের উদ্দেশে–স্বাধীনতার দিকে, নিরাপত্তার দিকে–রওয়ানা হয়ে যেতে পারব।

BanglaBook.org

পরের এক সপ্তাহের জন্যে আমাদের বাড়ি হয়েছিল বেসমেন্টটা। তৃতীয় রাতের দিকে আমি আবিষ্কার করলাম আঁচড়ানোর আওয়াজের কারণটা ধরতে পেরেছি। ইঁদুর।

অন্ধকারে আমার চোখ সয়ে আসার পর বেসমেন্টে মোটামুটি তিরিশজনের মতো রিফিউজি গুনেছিলাম আমি। দেয়াল বরাবর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বসে আছি আমরা। ক্র্যাকার, খেজুর দিয়ে রুটি, আপেল খেয়েছি। প্রথম সে রাতে পুরুষরা সবাই একসঙ্গে *নামায* পড়ল। রিফিউজিদের একজন বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল বাবা কেন ওদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে না। "আল্লাহ আমাদের সবাইকে বাঁচাবে। তুমি কেন তার কাছে *নামায* পড়ছ না?"

নস্যিতে একটা টান দিয়েছে বাবা। পা সোজা করে আড়মোড়া ভেঙেছে। "আমাদের বাঁচাবে একটা এইট সিলিন্ডার আর একটা ভালো কার্বোরেটর।" একথাই খোদার ব্যাপারে বাকিদের নীরব করে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল।

সেরাতে আরও পরে জানতে পারি আমাদের সঙ্গে লুকিয়ে থাকা লোকজনের ভেতর দুজন কামাল আর ওর বাবা। কামালকে আমার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে বসে থাকতে দেখাটা আমার জন্যে বেশ ভালো একটা ধাক্কা ছিল বটে। কিন্তু সে আর তার বাবা যখন রুমের আমাদের দিকে এল কামালের চেহারা দেখতে পেলাম আমি। *সত্যিই* দেখেছি...

শুকিয়ে গেছে সে–এছাড়া আর কোনও শব্দে বোঝানো যাবে না। ফাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে, সেখানে পরিচয়ের কোনও চিহ্ন ফুটে উঠল না। কাঁধজোড়া ঝুলে পড়েছে, চিবুক এমনভাবে চুপসে গেছে, মনে হচ্ছে বুঝি সেগুলোকেও চোয়ালের হাড়ের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। কাবুলের একটা মুভি থিয়েটারের মালিক ছিল ওর বাবা, বাবাকে বলছিল কীভাবে তিনমাস আগে একটা ফস্কে যাওয়া গুলিতে মারা গেছে তার স্ত্রী। তারপর কামাল সম্পর্কে বাবাকে জানাল সে। কেবল টুকরোটুকরো অংশ কানে এল আমার: *ওকে একা যেতে দেওয়া উচিত হয়নি...এত সুন্দর আগাগোড়া জানো তো...ওরা চারজন ছিল...লড়াই করার চেষ্টা করেছে...খোদা...ওকে নিয়ে গেল...পড়ে ছিল রক্তাক্ত...ওর প্যান্ট...এখন আর কথা বলে না...স্রেফ চেয়ে থাকে...*

BanglaBook.org

কোনও ট্রাক আসছে না। ইঁদুর ভরা বেসমেন্টে এক সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের জানাল করিম ট্রাকটা মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

"আরেকটা উপায় আছে," বলল করিম, গোঙানি ছাপিয়ে চড়ে উঠছিল

তার কণ্ঠস্বর। তার কাজিনের একটা ফুয়েল ট্রাক আছে। সেটায় করে বার দুই লোক পাচার করেছে সে। এখন জালালাবাদে আছে সে। আমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারবে হয়ত।

প্রবীন দম্পতি ছাড়া আর সবাই যেতে রাজি হল।

সে রাতেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। বাবা আর আমি, কামাল আর ওর বাবা আর অন্যরা। করিম আর তার চৌকো চেহারার প্রায় টেকো মাথা কাজিন আযিয আমাদের ফুয়েল ট্রাকে উঠতে সাহায্য করল। একে একে আমরা দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনের ডেকে উঠে পড়লাম। পেছনের ওঠার সময় মই বেয়ে উঠতে হল আমাদের। পিছলে ঢুকে পড়লাম ট্যাঙ্কের ভেতর। মনে আছে বাবা মই বেয়ে আধাআধি নেমে আসার পর লাফিয়ে নেমে পড়েছিল আবার। পকেট থেকে একটা নস্যির কৌটা বের করেছে তারপর। বাক্সটা খালি করে পেভ না করা রাস্তা থেকে একমুঠো বালি নিয়ে ভরে নিয়েছে। বালিতে চুমু খেয়েছে। বাক্সে রেখে দিয়েছে। তারপর বুক পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছে ওটা। হৃদয়ের ঠিক পাশে।

আতঙ্ক।

মুখ খুলেছ তুমি। এত বড় করে যে চোয়াল ব্যথা করে উঠেছে। ফুসফুসকে বাতাস টেনে নেওয়ার হুকুম দিয়েছ তুমি। **এখন** বাতাস দরকার তোমার। **এখনই** প্রয়োজন। কিন্তু তোমার শ্বাসনালী তোমাকে অগ্রাহ্য করছে। ব্যর্থ হচ্ছে, কুঁচকে যাচ্ছে, শক্ত হয়ে আসছে। তারপর সহসা একটা ড্রিঙ্কিং স্ট্র দিয়ে শ্বাস টানতে লাগলে তুমি। তোমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তোমার ঠোঁট চেপে বসল। স্রেফ চাপা একটা গোঙানি বের করতে পারছ তুমি। তোমার হাতজোড়া পাক খাচ্ছে, কাঁপছে। কোথাও একটা বাঁধ শব্দ করে খুলে গেল, শীতল ঘামের একটা স্রোত বয়ে গেল। তোমার সারা শরীর ভিজিয়ে দিল। চিৎকার করতে চাইছ তুমি। পারলে চিৎকার ছাড়তে। কিন্তু চিৎকার করার মতো বাতাস নেই তোমার বুকে।

আতঙ্ক।

অন্ধকার ছিল বেসমেন্ট। কিন্তু ফুয়েল ট্রাকের ভেতরটা নিকষ অন্ধকার। আমি ডানে, বামে, উপর, নিচে তাকালাম, চোখের সামনে ধরে হাত নাড়লাম, কিন্তু নড়াচড়ার কোনও লক্ষণ চোখে পড়ল না। চোখ পিটপিট করলাম। আবার। কিচ্ছু না। বাতাস ঠিক নেই। এত ভারি প্রায় নিরেট বলে মনে হচ্ছে। বাতাস তো নিরেট হওয়ার কথা না। হাত বাড়িয়ে বাতাসকে মুঠির ভেতর ধরে পিষে

BanglaBook.org

ঁড়ো করে শ্বাসনালীর ভেতরে পাঠাতে চাইলাম। আর গ্যাসোলিনের তীব্র গন্ধ। ফিউমের কারণে আমার চোখজোড়া জ্বালা করছে। যেন কেউ আমার চোখের পাতা তুলে লেবু ডলে দিয়েছে। প্রতিবার শ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নাকে যেন আগুন ধরে যাচ্ছে। এমন একটা জায়গায় মরে যেতে পারো তুমি, ভাবলাম আমি। একটা আর্তনাদ ভেসে আসতে যাচ্ছে। আসছে, আসছে...

তারপরেই অলৌকিকের স্বাদ পেলাম আমি। আমার জামার হাতা ধরে টান দিল বাবা। অন্ধকারে সবুজ কি যেন একটা ঝিলিক দিয়ে উঠল। আলো! বাবার রিস্টওঅচ। আমি ওই ফ্লুরেসেন্ট সবুজ কাঁটাগুলোর উপর আমার চোখজোড়া সেঁটে রাখলাম। হারিয়ে যেতে পারে ভেবে ভয় হচ্ছিল। চোখের পাতা ফেলার সাহস পাচ্ছিলাম না।

আস্তে আস্তে আশপাশের অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠলাম আমি। গোঙানি আর চাপা কণ্ঠে দোয়া পাঠের আওয়াজ কানে এল। একটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মায়ের চাপা কণ্ঠের আদরের শব্দ। কেউ একজন হেঁচকি তুলল। আরেকজন গালি দিয়ে উঠল *শোরোভিদের*। ট্রাকটা একবার এপাশ ওপাশ আরেকবার উপর নিচে দোল খাচ্ছে। ধাতুর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধছে মাথার।

"ভালো কিছু ভাববার চেষ্টা করো," আমার কানে কানে বলল বাবা। "আনন্দময় কিছু।"

ভালো কিছু। আনন্দময় কিছু। আমি আমার মনকে ভেসে যেতে দিলাম। আসতে দিলাম তাকে:

পাঘমানে শুক্রবার বিকেল। ফলে ভরা মালবেরি গাছে ভরা একটা ঘেসো খোলা প্রান্তর। পোষ না-মানা ঘাসে হাঁটু ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর হাসান। ঘুড়ির সুতো ধরে টানছি আমি, হাসানের কড়া-পড়া হাতে ঘুরছে নাটাইটা। আকাশের দিকে ফিরে আছে আমাদের চোখ। আমাদের ভেতর কোনও কথাবার্তা হচ্ছে না, সেটা আমাদের কিছু বলার নেই বলে নয়, বরং আমাদের কিছু বলার প্রয়োজন নেই বলে। যারা একে অন্যের প্রথম স্মৃতি, যারা একই মায়ের বুকের দুধ খেয়েছে, তাদের বেলায় এমনই হয়ে থাকে। মৃদু হাওয়ায় দুলে উঠল ঘাসের সাগর। নাটাইটাকে ঘুরতে দিল হাসান। ঘুড়িটা পাক খেল, গোত্তা খেল, আবার স্থির হয়ে এল। আমাদের জোড়া ছায়া ঢেউ-তোলা ঘাসে নাচছে। অন্যপাশের নিচু দেওয়ালের ওপাশ থেকে আমাদের কানে কথাবার্তা আর হাসির আওয়াজ ভেসে এল। ঝর্নার কুলুকুলু ধ্বনি। গানের আওয়াজ, পুরোনো, চেনা কোনও গান। মনে হয়

BanglaBook.org

রুবাবের তারে ইয়া মাওলা হবে। দেয়ালের উপর থেকে কেউ আমাদের নাম ধরে ডাকছে। বলছে চা আর কেক খাওয়ার সময় হয়েছে।

কোন মাস ছিল বা কোন বছর মনে নেই আমার। শুধু জানি স্মৃতিটা আমার মাঝে বেঁচে আছে। একটা সুন্দর অতীতের নিখুঁতভাবে মোড়াকবদ্ধ টুকরো। ধূসর, বিরান হয়ে ওঠা আমাদের জীবনের ক্যানভাসের উপর রঙের একটা প্রলেপ।

যাত্রার বাকি অংশ স্মৃতির ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো, মনে পড়ে আবার হারিয়ে যায়। বেশীরভাগই গন্ধ আর শব্দ: মাথার উপর দিয়ে সগর্জনে চলে যাওয়া মিগ: গোলাগুলির বিক্ষিপ্ত শব্দ; কাছেপিঠে ডাক ছাড়া গাধার আওয়াজ; ঘণ্টা টুংটাং: ভেড়ার ডাক; ট্রাকের টায়ারে নিচে পিষে যাওয়া পাথর; অন্ধকারে বাচ্চার কান্না; গ্যাসোলিন, বমি আর মলের গন্ধ।

এর পরে যে কথা মনে আছে সেটা হচ্ছে ট্রাকের ভেতর থেকে ভোরের দিকে বের হয়ে আসার পরে চোখ ধাঁধানো আলোর ধাক্কা। মনে আছে আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ কুঁচকে ফেলেছিলাম আমি। এমনভাবে শ্বাস টানছিলাম যেন দুনিয়া থেকে বাতাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। একটা পাথুরে গর্তের পাশে নুড়ি পাথরের রাস্তার উপর শুয়ে পড়েছি। সকালের ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়েছি। বাতাস পেয়ে মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। আলোর জন্যে কৃতজ্ঞ, বেঁচে আছি বলে কৃতজ্ঞ।

"আমরা পাকিস্তানে পৌঁছে গেছি, আমির," বলল বাবা। আমার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল ও। "করিম বলছে আমাদেরকে পেশওয়ারে নিয়ে যাবার জন্যে একটা বাসের ব্যবস্থা করবে সে।"

গড়িয়ে উপুড় হলাম আমি। এখনও শীতল নুড়ির উপর শুয়ে আছি। বাবার পায়ের অন্যপাশে স্যুটকেসগুলো দেখতে পেলাম। বাবার পায়ের উল্টো হয়ে থাকা ইংরেজি 'ভি' হরফের মাঝখান দিয়ে দেখলাম ট্রাকটা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য রিফিউজিরা পেছনের মই বেয়ে নেমে আসছে। ওপাশে নুড়ি পাথরের রাস্তাটা আকাশের নিচে ঘাসের মতো বিছিয়ে থাকা মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গামলার মতো দেখতে পাহাড়সারির আড়ালে হারিয়ে গেছে। যাবার পথে একটা ছোট গ্রাম পাশ কাটিয়ে গেছে ওটা। একটা রোদে পোড়া ঢালের উপর বিছিয়ে আছে।

আবার আমাদের স্যুটকেসের দিকে নজর ফিরে এল আমার। ওগুলো দেখে বাবার জন্যে মন খারাপ হয়ে গেল। সবকিছু বানানোর পর,

BanglaBook.org

কল্পনার পর, বড়াই করার পর, স্বপ্ন দেখার পর, এটাই তার জীবনের গফল: একটা হতাশ করা ছেলে আর দুটো স্যুটকেস।

কে যেন আর্তনাদ করছে। না, আর্তনাদ না। বিলাপ। যাত্রীদের জটলা কাতে দেখলাম। ওদের কণ্ঠের তাগিদের সুর কানে এল। কেউ একজন ধোঁয়া" কথাটা উচ্চারণ করল। আরেকজনও একই কথা বলল। বিলাপটা গা-ফাটানো আর্তচিৎকারে পরিণত হল।

আমি আর বাবা তাড়াতাড়ি দর্শকদের মাঝে ফিরে এলাম। ওদের ভেতর য়ে পথ করে এগালাম। বৃত্তের কেন্দ্রে পায়ের উপর পা তুলে বসে আছে মালের বাবা। সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে। ছেলের ছাইয়ের মতো যাকাশে চেহারায় চুমু খাচ্ছে।

"শ্বাস ফেলছে না ও! আমার ছেলে নিঃশ্বাস নিচ্ছে না!" বলে কাঁদছিল । বাবার কোলে পড়ে আছে কামালের প্রাণহীন দেহ। ওর সোজা অসাড় ন হাতটা বাবার কান্নার তালে তালে দোল খাচ্ছে। "আমার ছেলে! ও ঃশ্বাস নিচ্ছে না! হে আল্লাহ, ওকে দম ফেলতে সাহায্য করো!"

তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বাবা। এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে ধরল। কিন্তু মালের বাবা ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। কাছেই কাজিনের সঙ্গে াড়িয়ে থাকা করিমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। এরপরের ঘটনা এত দ্রুত ার সংক্ষিপ্ত ছিল যে একে ঠিক মারপিট বলা যাবে না। বিস্ময়ে চিৎকার করে ঠল করিম, পিছিয়ে গেল সে। একটা হাত ঘুরতে দেখলাম আমি। লাথি কাল একটা পা। এক মুহূর্ত পরে কামালের বাবাকে দেখা গেল করিমের ন্দুক হাতে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"গুলি করো না!" চিৎকার করে উঠল করিম।

কিন্তু আমরা কেউ কোনও কিছু করার বা বলার আগেই কামালের বাবা ব্যারেলটা মুখে ঠেসে ধরল। গুলির সেই প্রতিধ্বনির শব্দ কোনওদিনই ভুলব না আমি। কিংবা আলোর ঝলকানি আর লালের বিচ্ছুরণ।

আবার উবু হয়ে গেলাম আমি। রাস্তার পাশে শুকনো বমি করলাম।

BanglaBook.org

এগার

ফ্রিমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া. ১৯৮০-র দশক

আমেরিকার ধারণাটা বাবার পছন্দ হয়েছিল।

আমেরিকায় থাকতে গিয়েই আলসার হয়ে গিয়েছিল ওর।

মনে আছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কয়েক স্ট্রিট দূরে ফ্রিমন্টের লেক এলিযাবেথ পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটছিলাম আমরা। ব্যাটিং প্র্যাকটিসরত ছেলেদের দেখছিলাম, খেলার মাঝে স্যুইংয়ে হাসিতে ভেঙে পড়া মেয়েদের দেখছিলাম। এভাবে হাঁটার সময়গুলোতে বাবা আমাকে দীর্ঘ জটিল বক্তৃতায় আলোকিত করে তুলত। "দুনিয়ায় মাত্র তিনজন সত্যিকারের খাঁটি মানুষ আছে, আমির," বলত ও। হাতের আঙুলে তাদের গুনত। দুঃসাহসী উদ্ধারকর্তা আমেরিকা, ব্রিটেন আর ইসরায়েল। "বাকিরা-" মুখ দিয়ে *পফফট* শব্দ করার সময় হাতের ইশারা করত ও "-গল্পবাজ বুড়ো মেয়েমানুষের মতো।"

ইসরায়েল সম্পর্কে তার কথাবার্তা ফ্রিমন্টের আফগানদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিত, তারা ওকে ইহুদি-পন্থী এবং সেকারণে ইসলাম বিদ্বেষী বলে অভিযুক্ত করত। বাবা ওদের সঙ্গে চা পান আর রাউট কেক খাওয়ার জন্যে মিলিত হত, রাজনীতির কথাবার্তা বলে ওদের ক্ষেপিয়ে দিত। "ওরা আসলে একথা বুঝতে পারছে না," আমাকে বলত ও, "এর সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই।" বাবার দৃষ্টিতে ইসরায়েল হচ্ছে নিজেদের তেলের উপর ফুলে

BanglaBook.org

ফেঁপে ওঠা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত আরবদের সাগরে "সত্যিকারের পুরুষের" একটা দ্বীপ। "ইসরায়েল এটা করে, ইসরায়েল সেটা করে," আরবীয় উচ্চারণ ভঙ্গি নকল করে বলত বাবা। "তাহলে এব্যাপারে একটা কিছু করো না কেন! অ্যাকশনে নামো। তোমরা আরব। তো প্যালেস্টাইনিদের সাহায্য করো!"

জিমি কার্টারকে ঘৃণা করত বাবা, তাঁকে "বড় দাঁতঅলা নির্বোধ" বলে ডাকত। ১৯৮০ সালে আমরা তখনও কাবুলে ছিলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মস্কোয় অনুষ্ঠেয় অলিম্পিক বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিল। *"বাহ, বাহ!"* বিতৃষ্ণার সঙ্গে চিৎকার করে উঠেছিল বাবা। "ব্রেযনেভ আফগানদের নিকেশ করছে আর ওই ব্যাটা বাদাম খোর বলছে কিনা তোমাদের পুলে আমি সাঁতার কাটব না।" বাবার বিশ্বাস ছিল কার্টার নিজের অজান্তেই লিউনিদ ব্রেযনেভের চেয়ে ঢের বেশী কমিউনিজমের পক্ষে কাজ করেছে। "এই দেশ চালানোর যোগ্য নয় সে। এ যেন বাইকই চালাতে পারে না এমন একটা ছেলেকে ব্র্যান্ড নিউ ক্যাডিলাকের স্টিয়ারিংয়ের পেছনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।" আমেরিকা আর গোটা দুনিয়ার দরকার একজন কঠিন মানুষ। এমন একজন যাকে সবাই সমঝে চলবে। এমন কেউ যে কিনা হাত কচলানোর বদলে কাজ দেখাবে। সেই কেউ একজন এল রোনাল্ড রেগ্যানের আদলে। তারপর রেগ্যান যখন টেলিভিশনের পর্দায় এসে *শোরোভি*দের "দ্য ঈভল এম্পায়ার" বলে ঘোষণা দিল, বাবা বাইরে গিয়ে বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে ধরা হাসিমুখ প্রেসিডেন্টের একটা ছবি কিনে নিয়ে এল। ছবিটা বাঁধিয়ে আমাদের হলওয়ের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখল। বাদশাহ জহির শাহর সঙ্গে তোলা ওর নিজের শাদাকালো জীর্ণ চেহারার ছবিটার পাশেই পেরেকে ঝোলাল ওটা। ফ্রিমন্টে আমাদের বেশীর ভাগ পড়শীই ছিল ড্রাইভার, পুলিস, গ্যাস স্টেশন অ্যাটেনডেন্ট আর ওয়েলফেয়ারের টাকায় চলা অবিবাহিত মা। ঠিক সেই ধরনের ব্লু-কলার শ্রেণীর লোকজন যারা অচিরেই মুখের উপর রেগ্যানোমিক্সের বালিশের চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠবে। আমাদের বিল্ডিংয়ে বাবাই ছিল একমাত্র রিপাবলিকান।

কিন্তু উপসাগর এলাকার ধোঁয়াশা ওর চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিত। ট্রাফিকের আওয়াজ মাথা ব্যথা করত। আর ফুলের রেণু কাশির দমক তোলার জন্যে যথেষ্ট ছিল। ফলফলারি কখনওই যথেষ্ট মিষ্টি ছিল না। আর সব খোলা মাঠ আর গাছপালা গেল কোথায়? দুবছর ধরে বাবাকে ওর দুর্বল ইংরেজিকে আরেকটু উন্নত করে তোলার জন্যে ইএসএল-এ নাম লেখানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু কথাটা শুনলেই বকাবাদ্যি করত ও। "টিচার হয়ত আমি

BanglaBook.org

'ক্যাট' বললে একটা চকচকে ছোট তারা দেবে আমাকে যাতে দৌড়ে বাড়ি ফিরে তোমাকে দেখাতে পারি," গজগজ করে বলত।

১৯৮৩ সালের বসন্তের এক রোববারে অ্যামট্রেক যেখানে ফ্রিমন্ট বুলেভার্দকে ক্রস করেছে তার পশ্চিমে ইন্ডিয়ান মুভি থিয়েটারের পাশেই পেপারব্যাক বিক্রি হয় এমন একটা ছোট বুকস্টোরে ঢুকলাম। বাবাকে বলেছিলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বের হয়ে আসছি। বাবা কাঁধ ঝাঁকিয়েছিল। ফ্রিমন্টে একটা গ্যাস স্টেশনে কাজ করত ও। সেদিন ছিল ওর ছুটির দিন। দেখলাম ফ্রিমন্ট বুলেভার্দ পার হয়ে এলোমেলো পায়ে একজোড়া প্রবীন ভিয়েতনামী দম্পতি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ন্‌গুয়েনের ছোট মুদি দোকান ফাস্ট অ্যান্ড ইযি-তে ঢুকছে ও। ওরা ছিল ধূসর চুলের বন্ধুসুলভ মানুষ। মহিলার পার্কিনসন'স রোগ ছিল, লোকটার কোমর বদলাতে হয়েছিল। "এখন ও সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানের মতো," সব সময় আমাকে বলত সে। ফোকলা দাঁতে হাসত। "সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যানের কথা তোমার মনে আছে, আমির?" তারপর মিস্টার ন্‌গুয়েন লী মেজরসের মতো ভুরু কোঁচকাত। ভান করত যেন স্লো-মোশনে দৌড়াচ্ছে।

মাইক হ্যামার মিস্ট্রির একটা জীর্ণ কপির পাতা ওল্টাচ্ছিলাম, এমন সময় আর্তনাদ আর কাঁচ ভাঙার আওয়াজ কানে এল আমার। বইটা ফেলে রেখে রাস্তা পেরুনোর জন্যে ঝেড়ে দৌড় লাগালাম। ন্‌গুয়েনদের দেয়ালের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমি, ওদের চেহারা ছাইয়ের মতো ধূসর হয়ে গেছে। স্ত্রীকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে মিস্টার ন্‌গুয়েন। মেঝের উপর বাবার পায়ের কাছে পড়ে আছে কমলা, একটা ওল্টানো ম্যাগাজিন র‍্যাক, একটা জেলির ভাঙা জার, আর ভাঙা কাঁচের টুকরো।

জানা গেল বাবার কাছে কমলা কেনার মতো কোনও নগদ টাকা ছিল না। মিস্টার ন্‌গুয়েনকে একটা চেক লিখে দিয়েছিল ও। মিস্টার ন্‌গুয়েন ওর পরিচয় জানতে চেয়েছিল। "আমার লাইসেন্স দেখতে চেয়েছে সে," ফারসিতে চিৎকার করে উঠল বাবা। "আজ প্রায় দুবছর হতে চলল ওর হতচ্ছাড়া ফল কিনে পকেটে টাকা ভরে আসছি আর কুত্তার বাচ্চা কিনা আমার লাইসেন্স দেখতে চায়!"

"বাবা, এটা ব্যক্তিগত কোনও ব্যাপার নয়," ন্‌গুয়েনদের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললাম আমি। "আইডি চাওয়ারই কথা ওদের।"

"আমি তোমাদের এখানে দেখতে চাই না," এক পা সামনে বেড়ে স্ত্রীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলল ন্‌গুয়েন। হাতের ছড়িটা বাবার দিকে তাক

BanglaBook.org

করে রেখেছে। এবার আমার দিকে ফিরল সে। "তুমি খুব ভালো ছেলে। কিন্তু তোমার বাবা একটা পাগল। এখানে আর ওকে দেখতে চাই না আমরা।"

"আমাকে চোর ঠাউড়েছে নাকি?" বলল বাবা, গলা চড়ে উঠছে ওর। বাইরে লোক জমায়েত হয়ে গেছে। চেয়ে আছে ওরা। "কেমন তরো দেশরে বাবা এটা? কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না!"

"আমি পুলিস ডাকছি," মুখ বাড়িয়ে দিয়ে বলল মিসেস ন্‌গুয়েন। "বের হয়ে যাও, নইলে পুলিসে খবর দেব।"

"প্লিজ, মিসেস ন্‌গুয়েন, দয়া করে পুলিস ডেকো না। ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি আমি। দয়া করে পুলিসে খবর দিয়ো না, ঠিকাছে? প্লিজ?"

"হ্যাঁ, ওকে বরং বাড়ি নিয়ে যাও। সেটাই ভালো হবে," বলল মিস্টার ন্‌গুয়েন। ওয়্যার রিমড চশমার আড়ালে তার চোখ এক লহমার জন্যেও বাবার উপর থেকে সরল না। বাবাকে নিয়ে দরজা গলে বের হয়ে এলাম। বেরুনোর পথে একটা ম্যাগাযিনে লাথি হাঁকাল ও। আবার ফিরে যাবে না কথা আদায় করে স্টোরে ফিরে ন্‌গুয়েন দম্পতির কাছে ক্ষমা চাইলাম আমি। ওদের বললাম বাবা একটা খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। মিসেস ন্‌গুয়েনকে আমাদের ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার দিলাম। ক্ষতির একটা আনুমানিক হিসাব দিতে বললাম ওকে। "হিসাব করেই জানাবে আমাকে। সব কিছুর দাম চুকিয়ে দেব আমি। মিসেস ন্‌গুয়েন, আমি যারপর নাই দুঃখিত।" আমার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে মাথা দালাল মিসেস ন্‌গুয়েন। দেখলাম স্বাভাবিকের চেয়ে একটু যেন বেশীই কাঁপছে তার হাতজোড়া। বাবার উপর ক্ষেপে উঠলাম আমি। ওর কারণে একজন বয়স্কা মহিলা এভাবে কাঁপছে।

"বাবা এখনও আমেরিকার জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে," অনেকটা ব্যাখ্যা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললম।

ওদের বলতে ইচ্ছে করল কাবুলে আমরা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে সেটাকেই ক্রেডিট কার্ডে হিসাবে ব্যবহার করতাম। আমি আর হাসান কাঠের লাঠিটা রুটিঅলার কাছে নিয়ে যেতাম, ওটার ওপর ছুরি দিয়ে একটা দাগ কাটত সে। একেকটা *নানের* জন্যে একটা দাগ। জ্বলন্ত তন্দুর থেকে আমাদের *নান* বের করে দিত সে। মাস শেষে বাবা কাঠির গায়ে দাগ দেখে ওর পাওনা মিটিয়ে দিত। ব্যস। কোনও কথা নেই, নেই কোনও আইডির ঝামেলা।

BanglaBook.org

কিন্তু বললাম না। পুলিস না ডাকার জন্যে মিস্টার ন্‌গুয়েনকে ধন্যবাদ জানালাম। বাবকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। আমি মুরগীর গলার মাংস দিয়ে স্যুপ বানানোর সময় বেলকনিতে বসে গজগজ করতে লাগল ও। পেশওয়ার থেকে বোয়িংয়ে পেটে এখানে আসার পর দেড় বছর পেরিয়ে গেছে। এখনও খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টায় আছে বাবা।

সেরাতে নীরবে খাওয়া সারলাম আমরা। দুই লোকমা মুখে দেওয়ার পর প্লেটটা ঠেলে সরিয়ে দিল বাবা।

টেবিলের উল্টোদিক থেকে ওর দিকে তাকালাম। ছোট করে ছাঁটা ওর নখগুলো। এঞ্জিন অয়েলের কারণে কালো হয়ে গেছে। হাতের আঙুলগুলোতে কড়া পড়ে গেছে। গায়ে গ্যাস স্টেশনের গন্ধ–ধূলি, ঘাম, আর গ্যাসোলিন–ওর কাপড়ে। বাবা হচ্ছে সেই বিপত্নীকের মতো যে কিনা আবার বিয়ে করলেও মৃত স্ত্রীর কথা ভুলতে পারেনি। জালালাবাদের আখের ক্ষেত আর পাঘমানের বাগান ভুলে যেতে কষ্ট হচ্ছে ওর। ওর বাড়িতে আসা যাওয়া করা অসংখ্য লোকের কথা ভুলতে পারছে না। ⟩ হাঁটার কথাও ভুলতে পারছে না শোর বাজারের লোকারণে। লোকজনকে শুভেচ্ছা জানাতে পারছে না যারা ওকে আর ওর বাবাকে চিনত; ওর দাদাকে চিনত। যাদের সঙ্গে ওর বংশ পরম্পরায় সম্পর্ক ছিল। যাদের অতীতের সঙ্গে ওর অতীত মিলে মিশে গেছে।

আমার জন্যে আমেরিকা ছিল স্মৃতিকে কবর দেওয়ার একটা জায়গা।

বাবার জন্যে স্মৃতি কাতরতায় ভোগার জায়গা।

"আমাদের হয়ত পেশওয়ারেই ফিরে যাওয়া উচিত," আমার পানির গ্লাসে ভাসমান বরফের দিকে তাকিয়ে বললাম। আইএনএস ভিসা ইস্যু করবে এই আশায় ছয় মাস পেশওয়ারে ছিলাম আমরা। আমাদের ছোট এক রুমের অ্যাপার্টমেন্টা ছিল ময়লা মোজা আর বিড়ালের মলের গন্ধে ভরা। কিন্তু চারপাশে পরিচিত লোকজনের ছড়াছড়ি ছিল। অন্তত বাবার চেনা মানুষ ছিল ওরা। পড়শীদের পুরো কড়িডরকে ডিনারে দাওয়াত দিত সে। বেশীর ভাগই ভিসার অপেক্ষায় থাকা আফগান। অনিবার্যভাবে কেউ হয়ত একটা তবলা নিয়ে আসত; কেউ আনত হারমোনিয়াম। চায়ের অয়োজন চলত। মোটামুটি চলনসই গানের গলা থাকলেই একেবারে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত গান গাইত সে। মশার দল গুঞ্জন থামিয়ে ফেলত। তুলি দেওয়া হাতগুলো ব্যথা হয়ে যেত।

"ওখানে অনেক সুখে ছিলাম আমরা, বাবা। অনেকটা বাড়ির মতোই

BanglaBook.org

ছিল," বললাম আমি।

"পেশওয়ার আমার জন্যে ভালো ছিল। তোমার জন্যে নয়।"

"এখানে অনেক বেশী খাটুনি যাচ্ছে তোমার।"

"এখন আর তেমন খারাপ না," বলল সে— যেদিন গ্যাস স্টেশনের ডে-ম্যানেজার হয়েছে সেদিন থেকে নয়, এটাই বাঝাল ও। কিন্তু স্যাঁতসেঁতে দিনগুলোয় ওকে আমি চোখ কুঁচকে কব্জি ডলতে দেখেছি। খাওয়ার পর এন্টাসিডের বোতল বের করার সময় ওর কপালে জমে ওঠা স্বেদ বিন্দু লক্ষ করেছি। "তাছাড়া, আমি তো নিজের জন্যে এখানে আসিনি, তাই না?"

টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরলাম। আমার পরিষ্কার কোমল ছাত্রসুলভ হাত ওর শ্রমিকের শক্ত কড়া পড়া হাতের উপর। কাবুলে ওর কিনে দেওয়া সব ট্র্যাক, ট্রেইন সেট আর বাইকের কথা ভাবলাম। এবার আমেরিকা। আমিরের জন্যে শেষ একটা উপহার।

আমরা যুক্তরাষ্ট্রে পৌছানোর ঠিক এক মাসের মাথায় ওয়াশিংটন ব্যুলেভার্দের খানিকটা দূরে এক পরিচিত আফগানের মালিকানাধীন একটা গ্যাস স্টেশনে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ পেয়ে যায় বাবা। আমরা আসার সপ্তাহেই কাজের খোঁজে লেগে গিয়েছিল ও। সপ্তাহে ছয় দিন। বার ঘন্টার শিফটে ডিউটি শুরু করেছিল বাবা: গ্যাস পাম্প করা, রেজিস্টার লেখা, তেল বদলানো, উইন্ডশিল্ড ধোয়া। অনেক সময় ওর জন্যে লাঞ্চ নিয়ে আসতাম আমি, দেখতাম শেল্ফের উপর রাখা একপ্যাকেট সিগারেটের খোঁজ করছে। কোনও কাস্টমার হয়ত তেলের দাগ পড়া কাউন্টারের উল্টোদিকে অপেক্ষা করছে। উজ্জ্বল ফ্লুরোসেন্ট বাতির নিচে বাবার চেহারা ভাঙা আর ফ্যাকাসে দেখাত। আমি ভেতরে ঢোকার সময় দরজার উপরের ইলেক্ট্রনিক বেলটা ডিংডং শব্দে বেজে উঠত। কাঁধের উপর দিয়ে ফিরে তাকাত বাবা। হাত নেড়ে হাসত ও। ক্লান্তিতে ওর চোখ বেয়ে জল ঝরত।

ওকে যেদিন কাজে নেওয়া হয় সেদিনই আমরা স্যান হোসেতে আমাদের এলিজিবিলিটি অফিসার মিসেস ডবিন্সের কাছে গিয়েছিলাম। বিশালদেহী এক কৃষ্ণাঙ্গী মহিলা, চোখজোড়া সব সময় পিটপিট করছে, হাসলে গালে টোল পড়ে। সে আমাকে বলেছিল গির্জায় গান গাইত সে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছি। ওর গলার স্বর শুনে আমার গরম দুধ আর মধুর কথা মনে পড়ে গেছে। ওর ডেস্কের উপর ফুড স্ট্যাম্পের স্তূপটা নামিয়ে রেখেছিল বাবা। "ধন্যবাদ, এসব আমার দরকার নেই," বলল ও। "আমি সব সময় কাজ করি। আফগানিস্তানে কাজ করেছি। আমেরিকায়ও

BanglaBook.org

কাজ করছি। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, মিসেস ডবিন্স। কিন্তু আমি খামোকা টাকা নিতে রাজি নই।"

চোখ পিটপিট করে উঠেছিল মিসেস ডবিন্সের। ফুডস্ট্যাম্পগুলো তুলে নিয়েছে সে। পালা করে এমনভাবে আমাদের দিকে তাকিয়েছে যেন আমরা হয় ঠাট্টা করছি কিংবা "ওর সঙ্গে কোনও রকম হেঁয়ালি করছি" হাসান যেমন বলত। "পনের বছর ধরে একাজ করছি আমি, এপর্যন্ত এমন কথা বলেনি কেউ," বলল সে। এভাবেই বাবা অপমানকর ফুডস্ট্যাম্প মুহূর্তগুলোর সমাপ্তি টেনেছিল আর নিজের একটা বিরাট ভয় দূর করেছিল: কোনও আফগান হয়ত ওকে ভিক্ষার টাকায় খাবার কিনতে দেখে ফেলবে। যেন টিউমার থেকে সেরে উঠেছে এমনি ভঙ্গিতে ওয়েলফেয়ার অফিস থেকে বের হয়ে এসেছিল বাবা।

১৯৮৩ সালের সেই গ্রীষ্মে বিশ বছর বয়সে হাই স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বের হয়ে আসি আমি। সেদিন মাঠে মর্টারবোর্ড ছেড়ে আসা সবচেয়ে বয়স্ক সিনিয়র ছিলাম আমি। অসংখ্য পরিবার, ক্যামেরার ঝলকানি আর নীল গাউনের ভীড়ে বাবাকে হারিয়ে ফেলার কথা মনে পড়ে। ওকে টুয়েন্টি ইয়ার্ড লাইনের কাছে পকেটে হাত ঢোকানো অবস্থায় পেয়েছিলাম। বুকের উপর ঝুলছিল ক্যামেরাটা। আমাদের মাঝখানে চলমান লোকদের আড়ালে হারিয়ে গিয়ে ফের উদয় হল সে: চেঁচামেচি জুড়ে দেওয়া নীল জামা পড়া মেয়েরা একে অন্যকে আলিঙ্গন করছে, কাঁদছে, ছেলেরা বাবাদের সাথে হাত মেলাচ্ছে। বাবার দাড়িতে পাক ধরেছে। কপালের কাছে পাতলা হয়ে এসেছে মাথার চুল। কাবুলে কি আরও লম্বা ছিল না ও? একটা বাদামী গাউন ছিল ওর পরনে। ওর একমাত্র স্যুট-আফগান বিয়ে আর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এই স্যুটটাই পরত ও। সে বছর ওর পঞ্চাশতম জন্মদিনে আমার কিনে দেওয়া লাল টাইটা ছিল গলায়। এবার আমাকে দেখতে পেল ও। হাসল। ইশারায় আমাকে মর্টারবোর্ডটা পরতে বলল। স্কুলের ক্লক টাওয়ারটা আমার পেছনে রেখে ছবি ওঠাল। ওর জন্যে হাসলাম আমি। একদিক থেকে আমার চেয়ে বরং এটা তারই দিন ছিল। আমার দিকে এগিয়ে এল ও। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ভুরুর উপর একটা চুমু খেল। "আমি *মুফতাখির*, আমির," বলল। গর্বিত। কথাটা বলার সময় ওর চোখজোড়া ছলছল করে উঠল। ওই দৃষ্টির গ্রহীতা হতে পেরে খুশী লাগল আমার।

সেরাতে আমাকে হেওয়ার্ডে একটা আফগান *কাবাব* হাউসে নিয়ে গেল

BanglaBook.org

ও। অনেক খাবারের ফরমাশ দিল। মালিককে বলল তার ছেলে আসছে ফলে কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছে। গ্র্যাজুয়েশনের ঠিক আগে আগে এ নিয়ে ওর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত তর্ক হয়েছিল আমার। ওকে বলেছিলাম, একটা চাকরিতে ঢুকে পড়তে চাই আমি, ওকে সাহায্য করব, কিছু টাকা পয়সা জমাব। হয়ত পরের বছর কলেজে যাওয়া যাবে। কিন্তু আমার দিকে সেই বাবাসুলভ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ও। অমার জিভের কথা জিভেই উবে গেছে।

ডিনারের পর আমাকে রেস্তরাঁ থেকে উল্টোদিকের একটা বারে নিয়ে গেল বাবা। ম্লান আলোকিত ছিল জায়গাটা। আমার অপছন্দের বিয়রের কটু গন্ধে ভরে ছিল পুরো জায়গাটা। কেবল ক্যাপ আর ট্যাঙ্কটপ পরা লোকজন পুল খেলছিল, সবুজ টেবিলের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল নীল ধোঁয়ার মেঘ। ফ্লুরোসেন্ট লাইটের আলোয় পাক খাচ্ছিল। আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বাবার পরনে ওর বাদামী স্যুট, আমি পরে ছিলাম প্লিটেড স্ল্যাক আর স্পোর্টস জ্যাকেট। বারে এক বুড়ো লোকের পাশে গিয়ে বসলাম আমরা। মাথার উপরের মিচেলব সাইনের নীল আলোয় অসুস্থ দেখাচ্ছিল তাকে। বাবা একটা সিগারেট ধরিয়ে বিয়রের ফরমাশ দিল। "আজ অনেক বেশী খুশি আমি," বিশেষ কাউকে নয়, বরং সবার উদ্দেশে বলল ও। "আজ রাতে ছেলেকে নিয়ে ড্রিঙ্ক করছি। আমার বন্ধুর জন্যে একটা দাও," বলল ও, বুড়োর পিঠে একটা চাপড় দিল। লোকটা টুপি নিচু করে হাসল। লোকটার উপরের পাটির কোনও দাঁত নেই।

তিন চুমুকে বিয়র শেষ করে ফেলল বাবা, আরেকটা ফরমাশ দিল। আমার নিজেরটার চারভাগের একভাগ শেষ করার আগেই তিনটা গ্লাস শেষ করে ফেলল ও। কিন্তু তারপর বুড়োকে একটা স্কচ আর চারজন পুল প্লেয়ারকে এক পিচার বাডওয়াইযার সাধার কথা বলল। লোকটা মাথা নেড়ে ওর পিঠে চাপড় দিল। ওরা ওর উদ্দেশে ড্রিঙ্ক করল। কেউ একজন একটা সিগারেট ধরাল। বাবা টাই ঢিল করে বুড়ো লোকটার হাতে এক মুঠো সিকি তুলে দিল। জ্যুক বক্সের দিকে ইশারা করল ও। "ওকে ওর প্রিয় গানটা বাজাতে বলো," আমার উদ্দেশে বলল ও। বুড়ো মাথা দোলাল। বাবাকে একটা স্যালুট দিল সে। অচিরেই কান্ট্রি মিউজিক বাজতে শুরু করল। ঠিক এভাবেই একটা পার্টি শুরু করে দিয়েছিল বাবা।

এক পর্যায়ে উঠে দাঁড়াল ও, হাতের বিয়র উঁচু করে ধরল, কাঠের গুঁড়োভর্তি মেঝেতে ঢেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠল, "রাশিয়ার পোঙ্গা মারি!" অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল পুরো বার, এরপর শোনা গেল তার প্রতিধ্বনি।

সবার জন্যে আরেক রাউন্ড পিচার কিনল বাবা।

আমরা চলে আসার সময় ওকে বিদায় নিতে দেখে খারাপ লাগল সবার। কাবুল, পেশওয়ার, হেওয়ার্ড। একই বাবা, হেসে ভাবলাম আমি।

বাবার পুরোনো হালকা হলুদ রঙের বুইক সেঞ্চুরিতে করে বাড়ি ফিরে এলাম আমরা। পথে ঘুমে ঢলে পড়েছিল বাবা, জ্যাকহ্যামারের মতো নাক ডাকছিল। ওর গায়ে তামাক, অ্যালকোহাল, ঘামের উৎকট গন্ধ পাচ্ছিলাম। কিন্তু গাড়ি থামাতেই জেগে উঠল ও। কর্কশ কণ্ঠে বলল, "ব্লকের শেষ মাথায় চলে যাও।"

"কেন, বাবা?"

"বলছি যাও।" রাস্তার দক্ষিণ প্রান্তে গাড়ি থামাতে হল আমাকে। কোটের পকেট থেকে একগোছা চাবি বের করে আমার হাতে তুলে দিল ও। "ওই যে," আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়ি দেখাল ইশারায়। একটা পুরোনো মডেলের ফোর্ড। লম্বা, প্রশস্ত; গাঢ় রঙটা চাঁদের আলোয় ঠিক ধরতে পারলাম না। "রঙ করাতে হবে, স্টেশনের কাউকে দিয়ে নতুন চাকা লাগিয়ে দেব আমি। তবে ওটা চলে।"

হতচকিত অবস্থায় চাবিগুলো নিলাম আমি। পালা করে একবার গাড়ির দিকে আরেকবার ওর দিকে তাকাতে লাগলাম।

"কলেজে যেতে লাগবে," বলল ও। ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে চাপ দিলাম। চোখজোড়া জলে ভরে উঠল আমার। আমাদের চেহারাগুলো আড়ালে থাকায় খুশীই হলাম আমি। "ধন্যবাদ, বাবা।"

বেরিয়ে এলাম আমরা, ফোর্ডে উঠে বসলাম। গ্র্যান্ড তোরিনো এটা। নেভী ব্লু। বলল বাবা। একটা ব্লক ঘুরে এলাম আমি, ব্রেক, রেডিও পরখ করে তারপর সিগন্যাল অন করলাম। আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের লটে পার্ক করে এঞ্জিন বন্ধ করলাম। "*তাশাকোর*, বাবা জান," বললাম আমি। আরও অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল, বলতে চাইছিলাম ওর এই মায়ায় আমি কতটা আন্দোলিত হয়েছি, আমার জন্যে ওর কাজগুলো আমার কাছে কত প্রিয়। এখনও আমার জন্যে যা করছে ও। কিন্তু জানতাম এতে বিব্রত বোধ করবে ও। তার বদলে স্রেফ পুনরাবৃত্তি করলাম, "*তাশোকর।*"

হেসে হেডরেস্টে মাথা এলিয়ে দিল ও। কপালটা প্রায় সিলিং ছুঁইছুঁই করছে। কিছু বললাম না আমরা। স্রেফ অন্ধকারে বসে রইলাম। এঞ্জিনের শীতল হয়ে আসার টিক্ক টিক্ক শব্দ শুনতে লাগলাম। দূরে সাইরেনের বিলাপ শোনা যাচ্ছে। তারপর আমার দিকে মাথা ঘোরাল বাবা। "হাসান যদি এখন

আমাদের সঙ্গে থাকত, খুবই ভালো লাগত আমার," বলল ও।

হাসানের নাম উচ্চারিত হওয়ামাত্র যেন একটা ইস্পাতের হাত আমার গলা চেপে ধরল। জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলাম আমি। ইস্পাতের হাতজোড়ার চাপ শিথিল হয়ে আসার অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ফল-এ জুনিয়র কলেজে ভর্তি হতে যাচ্ছি, গ্র্যাজুয়েশনের পরের দিন বললাম বাবাকে। ঠাণ্ডা ব্ল্যাক কফি খেতে খেতে এলাচ দানা চিবোচ্ছিল ও। এটা ওর হ্যাঙওভারের মাথা ব্যথা দূর করার নিজস্ব ওষুধ।

"ভাবছি ইংরেজিতে মেজর করব," বললাম। ভেতরে ভেতরে কুকড়ে গেলাম। ওর জবাবের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"ইংরেজি?"

"ক্রিয়েটিভ রাইটিং।"

কথাটা ভাবল ও। "বলতে চাইছ, গল্প। গল্প বানাবে।" পায়ের দিকে তাকালাম আমি।

"এসবের জন্যে কি ওরা টাকা পয়সা দেবে, মানে গল্প বানানোর জন্যে?"

"যদি ভালো লিখতে পারো," বললাম। "আর যদি চোখে পড়ে যাও।"

"তার সম্ভাবনা কতটুকু, মানে চোখে পড়ার?"

"সেটা ঘটে যায়," বললাম আমি।

মাথা দোলাল ও। "তা ভালো লিখতে আর চোখে পড়ার আগ পর্যন্ত কী করবে তুমি? টাকা কামাবে কীভাবে? বিয়ে করলে তোমার খানুমকে কীভাবে চালাবে?"

আমি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না। "আমি...আমি একটা কিছু কাজ যোগাড় করে নেব।"

"অ," বলল ও। "*বাহ, বাহ!* তো আমি যদি বুঝে থাকি, একটা ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে তোমাকে কয়েক বছর পড়াশোনা করতে হবে, তারপর আমার মতো একটা *ছাত্তি* কাজ পাবে, যেটা কিনা আজই অনায়াসে পেয়ে যেতে পারো। আর তোমার ডিগ্রিটা তোমাকে কোনও একদিন...চোখে পড়ে যাবার...ব্যাপারে তেমন একটা সাহায্য করবে, সে সম্ভাবনা বেশ কম।" লম্বা একটা দম নিয়ে চায়ে চুমুক দিল বাবা। মেডিকেল স্কুল, ল-স্কুল আর "আসল কাজ" সম্পর্কে বিড়বিড় করে কি যেন বলল।

চেহারা লাল হয়ে উঠল আমার, সারা অস্তিত্ব জুড়ে একটা অপরাধ

BanglaBook.org

বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ওর আলসারের বিনিময়ে নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করার অপরাধ। আমি আর বাবার জন্যে কোরবানি হতে চাইছি না। শেষবার কাজটা করতে গিয়ে নিজেকেই শেষ করে দিয়েছি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবা। এবার সবগুলো এলাচ-দানা মুখে দিল।

অনেক সময় ফোর্ডের হুইলের পেছনে বসে জনালার কাঁচ নামিয়ে দিই আমি, তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁকিয়ে বেড়াই–ইস্ট বে থেকে সাউথ বে পর্যন্ত, সেই পেনিনসূলা পর্যন্ত গিয়ে ফের ফিরে আসি। আমাদের মহল্লার কটনউড গাছের সারি বাঁধা রাস্তায় গাড়ি চালাই, যেখানকার লোকেজন কখনও রাজার সাথে হাত মেলায়নি, এরা জীর্ণ একতলা এক রুমের ফ্ল্যাটে থাকে। গরাদঅলা জানালা এসব বাড়িতে। এখানে পুরোনো গাড়িগুলো খনির ড্রিপের মতো পেছনের সিঁড়িতে তেল চুঁইয়ে ফেলে। পেন্সিলের মতো ধূসর চেইন দিয়ে আটকানো বেড়া পেছনের উঠোনগুলোকে আমাদের পাড়া থেকে আলাদা করে রেখেছে। খেলনা, ন্যাড়া টায়ার আর লেবেল খসে পড়া বিয়রের বোতল সামনের উঠোন ভরে রেখেছে। বাকলের গন্ধ ছড়ানো রাস্তাগুলো পেরিয়ে যাই আমি। একসঙ্গে পাঁচটা *বাযকাশি* টুর্নামেন্ট এটে যাবে এমন বড়বড় গাছের ছায়াঅলা পার্ক পার হয়ে যাই। লস আলটোসের ঢাল বেয়ে তোরিনো নিয়ে উঠে যাই। ছবিঅলা জানালা আর রুপালি সিংহের ছবিঅলা রট আয়রনের গেইট অলস গতিতে পার হই। চেরুব ঝর্নাঅলা বাড়ি, যতন করা ড্রাইভওয়ে আছে সেখানে। ড্রাইভওয়েতে কোনও ফোর্ড তোরিনো নেই। এসব বাড়ি ওয়াযির আকবার খানে বাবার বাড়িটাকে কাজের লোকদের কুড়ের মতো করে তোলে।

কোনও এক রোববার সকাল সকাল জেগে উঠলাম আমি, তারপর হাইওয়ে সেভেনটিন ধরে এগিয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে ফোর্ডটাকে সোজা সান্তা ক্রুযে নিয়ে গেলাম। পুরোনো লাইটহাউসের পাশে গাড়িতে বসেই সূর্যাস্তের অপেক্ষা করব। সাগরের উপর দিয়ে কুয়াশার ভেসে যাওয়া দেখব। আফগানিস্তানে আমি শুধু সিনেমাতেই সাগর দেখেছি। অন্ধকারে হাসানের পাশে বসে সব সময় আমি যা পড়েছি সেটা সত্যি কিনা ভেবেছি: সাগরের হাওয়ায় লবণের গন্ধ থাকে। হাসানকে বলতাম কোনও একদিন আমি শৈবালে ঢাকা সাগর সৈকতে হেঁটে বেড়াব, বালিতে পা দাবাব আমরা। আমাদের পায়ের কাছ থেকে পানির সরে যাওয়া দেখব। প্রথমবার প্যাসিফিক দেখার পর প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি। সুবিশাল, নীল, ঠিক

BanglaBook.org

ছেলেবেলায় সিনেমায় যেমন সাগর দেখেছিলাম।

অনেক সময় সন্ধ্যার আগে আগে গাড়ি পার্ক করে ফ্রিওয়ে ওভারপাসের উপর দিয়ে হেঁটে যাই। বেড়ার উপর ঠেসে থাকে আমার চেহারা। আস্তে আস্তে করে এগিয়ে চলা মিটমিট করতে থাকা লাল টেইললাইটগুলো গুনে চলি। যতদূর চোখ যায় আর কিছু চোখে পড়ে না। বিএমডব্লিউ, স্যাব, পোর্শে। এইসব কোনওদিনই কাবুলেও দেখিনি। ওখানে বেশীর ভাগ লোকই রাশান ভোলগা, পুরোনো ওপেল বা ইরানি পাইকান চালায়।

আমরা ইউএস-এ এসেছি প্রায় দুবছর হয়ে গেছে। এখনও আমি এই দেশের আকার, বিশালতায় চমৎকৃত হই। প্রত্যেকটা ফ্রিওয়ের ওধারে, প্রত্যেকটা শহরের ওধারে রয়েছে আরেকটা শহর। পাহাড়ের ওধারে পাহাড়, পর্বতমালার ওধারে পাহাড়সারি। সেগুলো পেরিয়ে গেলে আরও শহর, আরও মানুষ।

রাওসি আর্মি আফগানিস্তানে ঢোকার অনেক আগে, গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার আর স্কুলগুলো ধ্বংস করে ফেলার অনেক আগেই, বীজের মতো মাইন পেতে মৃত্যফাঁদ বানানোর অনেক আগে, শিশুদের পাথরের কবরে চাপা দেওয়ার অনেক আগে, কাবুল আমার কাছে একটা ভূতুড়ে শহরে পরিণত হয়েছিল। একটা ঠোঁটকাটা ভূতের শহর।

আমেরিকা ছিল ভিন্ন রকম। আমেরিকা যেন একটা নদী। অতীত সম্পর্কে উদাসীন বয়ে চলেছে। এই নদীতে পথ চলতে পারি আমি। একেবারে তলায় পাঠিয়ে দিতে পারি আমার সমস্ত পাপ। অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যেতে দিতে পারি। এমন কোনও জায়গায় যেখানে কোনও ভূত নেই। নেই কোনও স্মৃতি। নেই পাপ।

আর কিছু না হলেও এর জন্যে আমেরিকাকে আলিঙ্গন করি আমি।

BanglaBook.org

পরের গ্রীষ্মে–১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মে–যে গ্রীষ্মে আমার আঠার বছর পূর্ণ হল–বুইকটা বিক্রি করে ৩৫০ ডলার দিয়ে একটা লক্কড় মার্কা '৭১ মডেলের ফক্সওয়্যাগন কিনল বাবা। গাড়িটার মালিক ছিল এক আফগান, বাবার পুরোনো পরিচিত। কাবুলের এক হাইস্কুলের টিচার ছিল সে। বাসটা যেদিন গোঁগোঁ শব্দ করতে করতে আমাদের রাস্তায় এসে ঢুকল, পাড়া-পড়শীরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। এঞ্জিন বন্ধ করে বাসটাকে নীরবে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গার দিকে এগিয়ে যেতে দিল বাবা। যার যার আসনে দেবে গেলাম আমরা, চোখ দিয়ে জল না বেরিয়ে আসা পর্যন্ত হাসলাম একটানা। সবচেয়ে বড় কথা,

যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত হলাম যে পড়শীরা আর আমাদের দিকে তাকিয়ে নেই। মরচে পড়া ধাতুর একটা কাহিল দর্শন শবদেহ ছিল বাসটা। ভাঙা জানালাগুলোয় কালো গারবেজ ব্যাগ দিয়ে তালি মারা, টায়ার ক্ষয়ে গেছে। গদিগুলো ক্ষয়ে একেবারে স্প্রিংয়ে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু বুড়ো টিচার বাবাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল যে, এঞ্জিন আর ট্রান্সমিশন ঠিকই আছে। এক্ষেত্রে লোকটা মিথ্যে বলেনি।

শনিবার দিন সকালে আমাকে জাগিয়ে তুলল বাবা। বাবা তৈরি হওয়ার সময় খবরের কাগজের ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে গ্যারাজ বিক্রির বিজ্ঞাপনগুলোয় গোল দাগ দিলাম। নিজেদের রুট স্থির করে নিলাম আমরা-ফ্রিমন্ট, ইউনিয়ন সিটি, নিওয়ার্ক এবং হেওয়ার্ড আগে। তারপরে স্যান হোসে, মিলপিতাস, সানিভেল, আর সময় পেলে ক্যাম্পবেল।

বাস চালাল বাবা। থার্মো থেকে গরম চা খেতে লাগল ও। আমি পথ দেখালাম। গ্যারাজ বিক্রির জায়গাগুলোতে থামলাম আমরা। এমন সব খুচরো জিনিসপত্র কিনলাম যেগুলো এখন আর লোকে রাখতে চায় না: পুরোনো সেলাই মেশিন, কাঠের টেনিস র‍্যাকেট, তারহীন গিটার আর পুরোনো ইলেক্ট্রোলাক্স ভ্যাকুম ক্লিনার নিয়ে কড়া দর কষাকষি করলাম। দুপুর নাগাদ বেরিয়েসার অদূরে স্যান হোসে ফ্রি মার্কেটে পৌঁছলাম আমরা। একটা জায়গা বাছাই করে অল্প লাভে জিনিসগুলো বিক্রি করে দিলাম: গতকাল যে শিকাগো রেকর্ডটা মাত্র সিকি দিয়ে কিনেছিলাম সেটা বিক্রি হয়ে গেল এক ডলারে বা পাঁচটার একটা সেট বিকোল ৪ ডলারে; একটা কাহিল দর্শন সিঙ্গার সেলাই মেশিন ১০ ডলারে কেনা হলেও খানিক দরাদরির পর ২৫ ডলার যোগান দিল।

গ্রীষ্ম নাগাদ আফগান পরিবারগুলো গোটা স্যান হোসে ফ্রি মার্কেটে কাজ করতে লেগে গিয়েছিল। ব্যবহৃত মালের সেকশনের আইলে আফগান গান বাজত। ফ্রি মার্কেটের আফগানদের ভেতরে একটা অলিখিত আচরণ বিধি বলবত ছিল: আইলের ওপাশের লোকটাকে সম্ভাষণ জানাবে তুমি, আলুর *বোলানি* বা খানিকটা *কাবুলি* খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানাবে, তারপর খোশগল্প করবে। বাবা বা মায়ের মৃত্যুর জন্যে শোক জানাবে, কিংবা বাচ্চার জন্ম হওয়ায় অভিনন্দন জানাবে। আফগানিস্তান আর *রাওসিদের* কথা এলে দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়বে-এবং কথাবার্তা অনিবার্যভাবে সেদিকে গড়াবেই। কিন্তু রোববারে এই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবে তুমি। কারণ এমনটা বের হয়ে যেতে পারে যে আইলের ওপাশের লোকটাকেই আগের দিন ফ্রিওয়ে এক্সিটে

BanglaBook.org

কোনও লোভনীয় পুরোনো জিনিস বিক্রি করতে গিয়ে প্রায় ভুল দিকে পেরিয়ে আসতে যাচ্ছিলে।

চায়ের চেয়ে বেশী একমাত্র যে জিনিসিটা এই আফগান আইলে প্রবাহিত হয় সেটা হচ্ছে আফগান গুজব। ফ্লি মার্কেটেই তুমি চা খাও আর আখরোট *কোলচা* খাও। জানতে পারো কার মেয়ে কার সঙ্গে বাগদান ভেঙে আফগান বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে পালিয়ে গেছে; যে কিনা আবার কাবুলে একজন *পারচামি*–মানে কমিউনিস্ট–ছিল; যে কিনা ওয়েরফেয়ারের টাকায় চলা সত্ত্বও ঘুষ দিয়ে একটা বাড়ি কিনেছে। চা, রাজনীতি, আর কেলেঙ্কারী: এসব হচ্ছে ফ্লি মার্কেটে রোববার দিনের আফগানদের বৈশিষ্ট।

অনেক সময় বাবা আইল ধরে ধীর কদমে এগোনোর সময় আমি দোকান চালাই। বাবা সম্মানের সঙ্গে বুকে হাত বেঁধে রাখে। কাবুলের পরিচিত লোকজনকে শুভেচ্ছা জানায়: ব্যবসায়ী আর দর্জিরা সাবেক রাষ্ট্রদূত, বেকার সার্জন আর ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের পাশাপাশি পুরোনো উলের কোট আর জরাজীর্ণ বাইসাইকল বিক্রি করে।

১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মকালের গোড়ার দিকের এক রোববার সকালে বাবা যখন বসে আছে, আমি কনসেশন স্ট্যান্ড থেকে দুই কাপ কফি কিনে আনলাম। ফিরে এসে দেখি বাবা এক বয়স্ক ডাকসাঁইটে চেহারার লোকের সঙ্গে আলাপ করছে। বাসের পেছনের বাম্পারের উপর কাপগুলো নামিয়ে রাখলাম আমি। ঠিক রেগ্যান/বুশ স্টিকারের পাশেই।

"আমির," আমাকে ইশারায় ডেকে বলল বাবা। "এ হচ্ছে জেনারেল সাহিব, মিস্টার ইকবাল তাহেরি। কাবুলের একজন ডেকোরেটেড জেনারেল ছিল ও। মিলিটারি অভ ডিফেন্সে কাজ করত।"

তাহেরি। নামটা চেনা লাগছে কেন?

যেন পার্টিতে আছে এমনিভাবে হাসল জেনারেল—যেসব জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ লোকদের হালকা রসিকতায় দরাজ হাসত সে। রোদে পোড়া মসৃণ কপালের উপর থেকে হালকা রূপালি চুল পেছনে আঁচড়ানো। চোখের উপর ভুরুজোড়া যেন শাদা পাফ। গা থেকে কোলনের গন্ধ আসছে। পরনে আয়রন গ্রে থ্রি পিস স্যুট। অসংখ্য বার ইস্ত্রি করার ফলে চকচকে হয়ে গেছে। কোমরে ঝুলছে একটা ঘড়ির সোনালি চেইন।

"এত দরাজ পরিচয়," বলল সে, ভরাট, সংস্কৃত কণ্ঠস্বর। "*সালাম বাচ্চে*।" হ্যালো, মাই চাইল্ড।

"*সালাম*, জেনারেল সাহিব," হাত মিলিয়ে বললাম। তার সরু হাতগুলো

BanglaBook.org

কঠিনভাবে চেপে ধরল আমাকে। যেন ভেজা ভেজা চামড়ার নিচে ইস্পাত লুকিয়ে আছে।

"আমির একজন বিরাট লেখক হতে যাচ্ছে," বলল বাবা। এখানে দুবার ঢোক গিললাম আমি। "কলেজে ফার্স্ট ইয়ার শেষ করেছে ও। সবগুলো কোর্সে 'এ' পেয়েছে।"

"জুনিয়র কলেজ," ওকে শুধরে দিলাম আমি।

"*মাশাল্লাহ,*" বলল জেনারেল তাহেরি। "তুমি কি আমাদের দেশকে নিয়ে লিখবে? যেমন ধরা যাক ইতিহাস? বা অর্থনীতি?"

"আমি গল্প লিখি।" রহিম খানের দেওয়া চামড়ায় মোড়ানো নোটবুকে লেখা ডযেন খানেক ছোট গল্পের কথা ভেবে বললাম আমি। ভাবছিলাম, হঠাৎ এই লোকের উপস্থিতিতে কেন বিব্রত বোধ করছি।

"অ, একজন গল্প বনিয়ে," বলল জেনারেল। "বেশ, এধরনের কঠিন অবস্থায় একটু নিস্কৃতি পেতে লোকের গল্পেরও প্রয়োজন আছে।" বাবার কাঁধে হাত রেখে আমার দিকে ফিরল সে। "গল্পের কথা যখন উঠল, আমি আর তোমার বাবা একবার গ্রীষ্মে জালালাবাদে একসঙ্গে ফীজ্যান্ট শিকার করেছিলাম," বলল সে। "দারুণ সময় ছিল সেটা। আমার যদি ঠিক মনে থাকে, তোমার বাবার চোখ ঠিক ব্যবসার মতোই শিকারের বেলায়ও দারুণ তীক্ষ্ণ ছিল।"

বুটের ডগা দিয়ে আমাদের তারপুলিনের উপর সাজিয়ে রাখা একটা টেনিস বলের উপর হালকা লাথি হাঁকাল বাবা। "ব্যবসা বটে।"

জেনারেল তাহেরি যুগপৎ বিষাদ আর ভদ্রতাসূচক হাসি ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হল। আস্তে করে চাপড় দিল বাবার কাঁধে। *"যিন্দাগি মিগযারে,"* বলল সে। জীবন কেটে যায়। আমার দিকে চোখ ফেরাল। "আমরা আফগানরা একটু বাড়িয়ে বলতে সব সময়ই পছন্দ করি, *বাচ্চে*। শুনেছি অনেক লোককে বোকার মতো মহান বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।" ছোট বক্তৃতাটাকে তার কোটের মতোই শোনাল। প্রায়শ ব্যবহৃত, অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল।

"আমাকে তোষামোদ করছ তুমি," বলল বাবা।

"মোটেই না," মাথাটা একপাশে কাত করে বলল জেনারেল। বিনয় দেখাতে বুকের উপর চেপে রেখেছে হাতজোড়া। "ছেলেমেয়েদের অবশ্যই তাদের বাবার ঐতিহ্য জানতে হবে।" আমার দিকে ফিরল সে। "বাবাকে শ্রদ্ধা করো তো, *বাচ্চে?* সত্যিই ওকে শ্রদ্ধা করো?"

"*বালে,* জেনারেল সাহিব, করি," বললাম। ভাবলাম লোকটা আমাকে

"বাছা আমার" বলে না ডাকলেই ভালো হয়।

"তাহলে কংগ্র্যাচুলেশনস। তুমি মানুষ হওয়ার পথে অধেকটা এগিয়ে গেছ," খানিকটা রসিকতা মেশানো কণ্ঠে বলল সে। কোনও পরিহাস নেই সেখানে। এমনিতে উদ্ধত লোকের শুভেচ্ছা।

"*পাদর* জান, চায়ের কথা ভুলে গেছ তুমি," এক তরুণীর কণ্ঠস্বর। আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে, মখমলের মতো কালো চুলের ক্ষীণ কটি সুন্দরী। হাতে একটা মুখ-খোলা থার্মো আর স্টাইরোফোম কাপ। চোখ পিটপিট করলাম আমি। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল আমার। উড়ন্ত পাখির বাঁকানো পাখার মতো মাঝখানে মিলে যাওয়া কালো একজোড়া ভুরু তার। প্রাচীন পারসিয়ার রাজকুমারীদের মতো অসাধারণ টিকালো নাক—হয়ত রুস্তমের স্ত্রী তাহমিনার—*শাহনামার* সোহরাবের মা—মতোই হবে। ওর চোখজোড়া চেস্টনাটের মতো বাদামী, বড়বড় পাঁপড়িতে ঢাকা। আমার চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল, তারপরেই উড়ে গেল।

"তুমি খুবই ভালো, মাই ডিয়ার," জেনারেল তাহেরি বলল। মেয়েটার কাছ থেকে কাপটা নিল। মেয়েটা চলে যাবার আগেই দেখলাম ওর ঠিক বাম দিকের চোয়ালের রেখার মসৃণ ত্বকের উপর একটা কাস্তে আকারের জন্মদাগ রয়েছে। দুই আইল দূরে একটা ফিকে ধূসর রঙের ভ্যানের দিকে এগিয়ে গেল সে। ভেতরে রাখল থার্মোটা। পুরোনো রেকর্ড আর পেপারব্যাকের স্তূপের উপর হাঁটু ভেঙে বসতেই ওর মাথার একপাশের চুল এলোমেলো হয়ে গেল।

"আমার মেয়ে সুরাইয়া জান," বলল জেনারেল তাহেরি। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যে উদগ্রীব কোনও লোকের মতো দীর্ঘশ্বাস টানল সে। সোনালি পকেট ওয়াচের দিকে তাকাল। "বেশ, এবার সময় হল সব গুছিয়ে নেওয়ার।" পরস্পরের গালে চুমু খেল সে আর বাবা। আমাদের দুজনের সঙ্গেই হাত মেলাল। "তোমার লেখালেখির সাফল্য কামনা করছি," বলল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। ওগুলোর ওপাশে ভাবের লেশমাত্র নেই।

সেদিনের অবশিষ্ট সময়টুকু ধূসর ভ্যানটার দিকে তাকানোর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যুঝে গেলাম আমি।

বাড়ি ফেরার পথে মনে পড়ল আমার। তাহেরি। জানতাম নামটা আগেও শুনেছি আমি।

BanglaBook.org

"তাহেরির মেয়েকে নিয়ে কিছু কেচ্ছা চালু আছে না?" বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম গলার স্বর।

"তুমি আমাকে চেন," বাসটাকে আস্তে আস্তে ফ্লি মার্কেট থেকে বেরুনোর লাইনে নিয়ে আসার সময় বলল বাবা। "আলোচনা গুজবের দিকে বাঁক নিলে আমি সে জায়গা থেকে সরে আসি।"

"কিন্তু কেচ্ছা তো চালু আছে, তাই না?" বললাম।

"কেন জানতে চাইছ?" লজ্জিত চেহারায় তাকিয়ে আছে সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা হাসি ফুটিয়ে তুললাম আমি। "এমনি কৌতূহল, বাবা।"

"তাই? ব্যস আর কিছু না?" বলল ও, চোখে বিদ্রূপ, তাকিয়ে আছে আমার দিকে। "তোমার উপর কোনও রকম ছাপ ফেলেনি তো সে?"

চোখ পাকালাম আমি। "বাবা, প্লিজ।"

হাসল সে। বাসটাকে ফ্লি মার্কেট থেকে বের করে আনল। হাইওয়ে ৬৮০-র উদ্দেশে রওয়ানা হলাম আমরা। কিছুক্ষণ নীরবে গাড়ি চালালাম আমরা। "আমি শুধু শুনেছি একটা লোক নাকি জড়িত ছিল আর অবস্থা...ঠিক মতো এগোয়নি।" গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও। যেন বলতে চাইছে মেয়েটার ব্রেস্ট ক্যান্সার আছে।

"ওহ।"

"শুনেছি মেয়েটা ভালো, কঠোর পরিশ্রমী, দয়ালু। কিন্তু কোনও *খাস্তে গার*, প্রেমিক...সেই থেকে জেনারেলের দরজায় কড়া নাড়েনি।" দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবা। "ব্যাপারটা হয়ত অন্যায়, কিন্তু অনেক সময় কয়েক দিনের মধ্যে যা ঘটে, কখনও এক দিনেও হতে পারে, গোটা জীবনের ধারাই পাল্টে দিতে পারে, আমির," বলল সে।

সেরাতে বিছানায় জেগে শুয়ে থাকার সময় সুরাইয়া তাহেরির কাস্তে আকারের জন্মদাগ, ওর কোমল টিকালো নাক আর উজ্জ্বল চোখজোড়া কীভাবে আমার চোখের উপর চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়েই ফের সরে গিয়েছিল সেকথা ভাবলাম। সুরাইয়া তাহেরি। আমার স্বপ্ন-সুন্দরী।

BanglaBook.org

বার

আফগানিস্তানে *ইয়েল্‌দা* হচ্ছে *জাদি* মাসের প্রথম রাত, শীতের প্রথম রাত। বছরের দীর্ঘতম রাত এটা। রেওয়াজ অনুযায়ী আমি আর হাসান অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতাম। *কুরসির* নিচে গলান থাকত আমাদের পা। আলি আপেলের ছাল স্টোভে ফেলত। লম্বা সেই রাত কাটানোর জন্য সুলতান আর চোরের প্রাচীন কেচ্ছা কাহিনী শোনাত আমাদের। আলির কাছেই আমি *ইয়েল্‌দার* প্রেমের কাহিনী শুনেছি। হতবুদ্ধি মথের দল মোমবাতির আলোর দিকে ধেয়ে আসে, নেকড়ের দল সূর্যের খোঁজে পাহাড়র ঢাল বেয়ে উঠে যায়। আলি কিরে কেটে বলেছে, *ইয়েল্‌দার* রাতে তুমি যদি তরমুজ খাও, পরের গ্রীষ্মে তোমার আর পিপাসা লাগবে না।

বড় হয়ে ওঠার পর আমার কবিতার বইয়ে পড়েছি *ইয়েল্‌দা* হচ্ছে তারাহীন রাত, যেদিন বিরহ কাতর প্রেমিকরা সারারাত জেগে থাকে। অন্তহীন অন্ধকার সহ্য করে। সূর্য উদয়ের অপেক্ষায় থাকে, এটা তাদের প্রিয়জনকে ফিরিয়ে আনবে। সুরাইয়া তাহেরির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর প্রতিটি রাত আমার জন্যে *ইয়েলদার* রাতে পরিণত হলো। রোববার সকাল হতেই বিছানা ছাড়লাম আমি। এরই মধ্যে আমার মাথার ভেতর সুরাইয়া তাহেরির বাদামী চোখের চেহারা জেগে উঠছে। বাবার বাসে বসে ওকে খালি পায়ে বসে হলদে এনসাইক্লোপিডিয়ার কার্ডবোর্ডের বাক্স সাজাতে না দেখা পর্যন্ত একের পর মাইলগুলো গুনে চললাম। অ্যাসফল্টের বিপরীতে ফর্শা দেখাচ্ছে ওর পায়ের গোড়ালী। সরু কব্জিতে টুংটাং শব্দ তুলছে রূপার

BanglaBook.org

ব্রেসলেট। ওর চুলগুলো পিঠের উপর দিয়ে নেমে এসে শাদা পর্দার মতো ঝুলে পড়ার সময় জমিনে কেমন ছায়া ফেলবে ভাবতে লাগলাম আমি। সুরাইয়া, স্বপ্ন-সুন্দরী। আমার *ইয়েলদার* সকালের সূর্য।

আইল ধরে এগিয়ে যাবার একটা অজুহাত খাড়া করি আমি–পরিহাসের একটা ভঙ্গি করে মেনে নেয় বাবা। তাহেরির স্ট্যান্ড পাশ কাটিয়ে যায় ও। জেনারেলের উদ্দেশে হাত নাড়ি আমি। কড়া ইস্ত্রি করা ধূসর কোটটা পরে থাকে সে বরাবরের মতো। সেও পাল্টা হাত নাড়ে। অনেক সময় ডিরেক্টর'স চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সে, আমার লেখালেখি, যুদ্ধ, দিনের ভালো সওদা, এসব নিয়ে টুকটাক কথাবার্তা বলে। জোর করে চোখ যাতে অন্যদিকে–সুরাইয়া যেখানে পেপারব্যাক নিয়ে বসে থাকে সেদিকে–যেতে না পারে সেই কসরত করে চলি। জেনারেল আর আমি পরস্পরকে বিদায় জানাই, হেঁটে ফিরে আসার সময় যাতে অলসভাব না ফুটে ওঠে সেই চেষ্টা করি।

অনেক সময় একা বসে থাকে ও। জেনারেল হয়ত অন্য কোনও সারিতে সামাজিকতা সারতে যায়। আমি ওকে চিনি না, কিন্তু পরিচিত হতে ব্যাকুল এমন ভান করে হেঁটে যাই। অনেক সময় ফিকে ত্বক আর রঙ দেওয়া চুলের মোটামুটি মাঝবয়সী মহিলাদের সঙ্গে থাকে ও। নিজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম গ্রীষ্মকাল শেষ হবার আগেই ওর সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু স্কুল খুলে গেল। পাতারদল লাল, তারপর হলুদ হয়ে ঝড়ে পড়ল। আবার গজাল। তারপরেও কথা বলার সাহস সঞ্চয় করতে পারলাম না। ওর চোখের দিকে তাকানোর মতো সাহস পেলাম না *দিলে* ।

১৯৮৫ সালের মে মাসের শেষ দিকে স্প্রিং কোয়ার্টার শেষ হল। সমস্ত জেনারেল এডুকেশন ক্লাসে ছক্কা মারলাম আমি। আমি যে কীভাবে বসে লেকচার শুনেছিলাম আর সুরইয়ার নাকের কোমাল বাঁকের কথা ভেবেছি সেটা একটা ছোটখাট অলৌকিক ঘটনাই বটে।

তারপর সেই গ্রীষ্মের এক প্রবল গরমের দিন, ফ্লি মার্কেটে ছিলাম বাবা আর আমি। আমাদের বুদ সাজাচ্ছিলাম। খবরের কাগজের সাহায্যে বাতাস করছি নিজেদের। ব্র্যান্ডিং আয়রনের মতো সূর্যটা আগুন ঢাললেও সেদিন জমজমাট ছিল বাজার। বেশ ভালো বিক্রি-বাট্টা হচ্ছিল। তখন মাত্র ১২:৩০ বাজে, কিন্তু ততক্ষণে ১৬০ ডলার ব্যবসা করে ফেলেছি আমরা। আমি উঠে আড়মোড়া ভাঙলাম। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম কোক খাবে কিনা ও। বাবা বলল খাবে।

"সাবধান, আমির," আমি হাঁটতে শুরু করতেই বলল ও।

BanglaBook.org

"কী থেকে, বাবা?"

"আমি *আহমক* নই, তো আমার সঙ্গে চালাকি করতে যেয়ো না।"

"তুমি কীসের কথা বলছ জানি না আমি।"

"একটা কথা মনে রেখ," আমার দিকে আঙুল তুলে বলল বাবা। "লোকটা কিন্তু আপাদমস্তক পশতুন। তার *নাঙ* আর *নামুস* আছে।" *নাঙ। নামুস।* অহঙ্কার আর গর্ব। পশতুন পুরুষের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে যখন সেটা স্ত্রীর সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। বা মেয়ের।

"আমি তো স্রেফ আমাদের ড্রিঙ্ক আনতে যাচ্ছি।"

"আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়ো না যেন, এটাই কেবল চাই।"

"ফেলব না। *কসম।* বাবা।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বাতাস করতে শুরু করল বাবা।

প্রথমে কনসেশন বুদের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপর টি-শার্ট স্ট্যান্ডের কাছে বামে ঘুরলাম। এখানে ৫ ডলারে তুমি শাদা নাইলনের টি-শার্টে ছাপ মারা জেসাস, এলভিস, জিম মরিসন, কিংবা সবার চেহারা পেয়ে যেতে পারো। মাথার উপর মারিয়াচির গান বাজছে। আচার আর গ্রিল্ড মাংসের গন্ধ পেলাম আমি।

আমাদের সারি থেকে দুই সারি দূরে তাহেরিদের ভ্যানটা দেখতে পেলাম। কাঠির মাথায় আম বিক্রি করার একটা কিয়স্কের পাশেই রয়েছে ওটা। একা একা পড়ছে মেয়েটা। আজ গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলের পোশাক ওর পরনে। স্যান্ডেলের মাথা দিয়ে আঙুল দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল পেছনে আঁচড়ে টিউলিপ ফুলের মতো করে খোঁপা বেঁধেছে। আমার ইচ্ছে ছিল স্রেফ সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাব। চলে গিয়েছি বলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখি তাহেরিদের শাদা টেবিল ক্লথের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। কোঁকড়া করার আয়রন আর পুরোনো নেকটাইয়ের ওপাশে সুরাইয়ার দিকে তাকিয়ে আছি।

"*সালাম,*" বললাম। "*মোযাহেম* হওয়ার জন্যে দুঃখিত। তোমাকে বিরক্ত করতে চাইনি।"

"*সালাম।*"

"জেনারেল সাহিব আছে?" বললাম আমি। কানজোড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে আমার। মেয়েটার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

"ওদিকে গেছে," বলল সে। ডান দিকে ইঙ্গিত করল। ব্রেসলেটগুলো গড়িয়ে কনুইয়ের কাছে নেমে গেল। জলপাই রঙের বিপরীতে রূপালি।

"তাকে বলো *সালাম* জানাতে এসেছিলাম আমি?" বললাম।

BanglaBook.org

"ঠিকাছে।"

"ধন্যবাদ," বললাম। "ওহ, আমার নাম আমির। যদি তোমার জানতে ইচ্ছে করে থাকে। যাতে তাকে বলতে পারো। আ...আমার *সালাম* জানানোর জন্যে।"

"হ্যাঁ।"

এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর বদল করলাম আমি। "এবার যাই আমি। তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত।"

"আমাকে বিরক্ত করোনি তুমি," বলল সে।

"তাহলে তো ভালো।" মাথা নিচু করে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম। "এখন আমি যাব।" আগেই কি কথাটা বলিনি? *"খোদা হাফেয।"*

"খোদা হাফেয।"

হাঁটতে শুরু করলাম আমি। তারপর থেমে ঘুরলাম। সাহস খুইয়ে বসার আগেই বলে ফেললাম কথাটা। "কী পড়ছ জানতে পারি?"

চোখ পিট পিট করল সে।

দম আটকে রেখেছি আমি। হঠাৎ, আমার মনে হল ফ্লি মার্কেটের সব আফগান বুঝি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। মনে হল এক ধরনের নীরবতা নেমে এসেছে। কথা বলতে গিয়ে থেমে গেছে মুখগুলো। মাথা ঘুরছে। প্রবল আগ্রহে সরু হয়ে আসছে চোখ।

এটা *কী?*

এই পর্যায় পর্যন্ত আমাদের আলাপটাকে একজন লোক সম্পর্কে আরেকজন লোকের শ্রদ্ধাপূর্ণ খোঁজ খবর হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারত। কিন্তু আমি তাকে একটা প্রশ্ন করে বসেছি। এখন সে যদি জবাব দেয়, তাহলে আমরা...মানে আমাদের মধ্যে গল্প শুরু হতে পারে। আমি একজন *মোজারাদ*–অবিবাহিত তরুণ আর সে অবিবাহিতা তরুণী। অন্তত *ইতিহাস* আছে তার। মারাত্মকভাবে গুঞ্জনের উপাদান হওয়ার পথে চলেছে এটা। সেরা গুঞ্জণ। বিষাক্ত জিভগুলো সচল হয়ে উঠবে। ওকে সেই বিষের ঝাঁঝ সইতে হবে। আমাকে নয়। আমার লিঙ্গের প্রতি পক্ষপাতমূলক আফগান ডাবল স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল আমি। *ওকে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে দেখনি?* নয়, বরং *হায়, দেখলে না ছেলেটাকে যেতে দিচ্ছিল না সে? কী লোচাক!*

আফগান মানদণ্ড অনুযায়ী আমার প্রশ্নটা ছিল বেপরোয়া। এর মাধ্যমে আমি নিজেকে প্রকাশ করে দিয়েছি। ওর প্রতি আমার আগ্রহের ব্যাপারে

সন্দেহের কোনও অবকাশ রাখিনি। কিন্তু আমি পুরুষ। কেবল আহত অহমের ঝুঁকি নিয়েছি আমি। ক্ষত সেরে যায়। বদনাম সারে না। আমার সাহসের মোকাবিলা করবে সে?

বইটা ঘোরাল সে, ফলে কাভারটা আমার দিকে মুখ করল। *ওয়াদারিং হাইটস।* "এটা পড়েছ?" জানতে চাইল সে।

মাথা দোলালাম। চোখের পেছনে হৃৎপিণ্ডের দপদপানি টের পাচ্ছিলাম। "দুঃখের কাহিনী।"

"দুঃখের গল্পেই ভালো বই হয়," বলল সে।

"তা ঠিক।"

"শুনেছি তুমি নাকি লেখালেখি কর।"

কীভাবে জানল? ওর বাবা বলেছে কিনা ভাবলাম। হয়ত ওকে সে জিজ্ঞেস করে থাকতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো কথাকেই অসম্ভব বলে নাকচ করে দিলাম। বাবা আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে পারে, কিন্তু কোনও আফগান মেয়ে-কোনও ভদ্র আর *মোহতারাম* আফগান মেয়ে-বাবার কাছে কোনও তরুণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে যাবে না। আর কোনও বাবাও, বিশেষ করে *নাঙ* আর *নামুস* আছে এমন কোনও আফগান বাবা মেয়ের সঙ্গে কোনও *মোজারাদ* সম্পর্কে আলাপ করতে যাবে না, যদি না সে *খাস্তেগর* বা পাণিপ্রার্থী হয়—যে প্রস্তাব রেখেছে এবং নিজের বাবাকে দরজার কড়া নাড়ার জন্যে পাঠিয়েছে।

অবিশ্বাস্যভাবে নিজেকে বলতে শুনলাম, "তুমি কি আমার গল্প পড়বে?"

"পড়তে পারলে ভালোই লাগবে," বলল সে। এখন ওর মাঝে একটু যেন অস্বস্তি টের পেলাম। ওর চোখজোড়া বারবার এপাশ ওপাশ নড়ছে। হয়ত জেনারেল আসছে কিনা দেখছে। মেয়ের সঙ্গে এত লম্বা সময় ধরে আমাকে আলাপ করতে দেখলে লোকটা কী ভাববে সেকথা ভাবলাম।

"একদিন তোমাকে একটা এনে দিতে পারি," বললাম। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় সুরাইয়ার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে দেখা এক মহিলাকে আইল ধরে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ফল ভর্তি একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ তার হাতে। আমাদের দেখামাত্র সুরাইয়ার দিক থেকে আমার দিকে পালা করে তাকাতে লাগল সে। হাসল।

"আমির জান, তোমাকে দেখে খুশি হলাম," বলল সে। টেবিল ক্লথের উপর ব্যাগের জিনিসগুলো বের করে রাখল। তার কপালটা স্বেদবিন্দুতে চকচক করছে। হেলমেটের মতো চেপে বসা মাথার চুল রোদ লেগে ঝলমল

BanglaBook.org

করছে। মাথার যেখানে যেখানে চুল পাতলা হয়ে এসেছে সেসব জায়গায় চাঁদি দেখতে পাচ্ছি আমি। বাঁধাকপির মতো গোল মুখে ছোটছোট সবুজ চোখজোড়া বসানো। দাঁতে ক্যাপ। ছোট ছোট আঙুলগুলো সসেজের মতো। বুকের উপর একটা সোনালী হরফে লেখা 'আল্লাহ' পড়ে আছে। ঘাড়ের চামড়ার ভাঁজে হারিয়ে গেছে চেইনটা। "আমি জামিলা। সুরাইয়া জানের মা।"

"*সালাম*, খালা জান," বললাম আমি। বিব্রত বোধ করছি। আফগানদের মাঝে যেমন লাগে। মহিলা আমার নাম জানে, অথচ আমি তার পরিচয়ই জানতাম না।

"তোমার বাবা কেমন আছে?" জিজ্ঞেস করল মহিলা।

"ভালোই আছে, ধন্যবাদ।"

"কি জানো, তোমার দাদা, গাজি সাহিব, জাজ সাহেব? তার চাচা আর আর আমার দাদা আবার চাচাত ভাই ছিল।" বলল সে। "তো তোমরা কিন্তু আত্মীয়।" ক্যাপ লাগানো দাঁতে হাসল সে। দেখলাম তার মুখের ডানপাশটা একটু ঝুলে পড়েছে। আবার সুরাইয়া আর আমার উপর ঘুরে বেড়াতে লাগল তার চোখ।

বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম জেনারেল তাহেরির মেয়ে এখনও বিয়ে করেনি কেন। পাত্র নেই তাই। বলেছে বাবা। উপযুক্ত পাত্র মিলছে না। কিন্তু এর বেশী কিছু বলেনি ও। বাবা জানে বাড়তি কথাবার্তা কোনও মেয়ের ভালো বিয়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে কতটা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। আফগান পুরুষরা, বিশেষ করে যারা সম্ভ্রান্ত ঘরের, অস্থির স্বভাবের হয়। কোথাও একটু ফিসফাস বা অভিযোগ, ব্যস শঙ্কিত পাখির মতো পালাবে ওরা। তো বিয়ে এসেছে আবার গেছে, কিন্তু সুরাইয়ার জন্যে কেউ *আহেস্তা বারো* গায়নি। কেউ ওর হাত মেহেদীতে রাঙিয়ে দেয়নি। ওর মাথার উপর কোরান ধরেনি কেউ। ওর বাবা জেনারেল তাহেরিই প্রত্যেকটা বিয়েতে ওর সঙ্গে নেচেছে।

এখন এই মহিলা, ওর মা, শ্বাসরুদ্ধকরভাবে আগ্রহী হয়ে উঠেছে, ক্রুর হাসি ফুটে উঠেছে তার *ঠোঁটে*। চোখের আশার দ্যুতি লুকিয়ে রাখতে পারছে না। আমাকে দেওয়া ক্ষমতার অবস্থানের কারণে একটু যেন কুকড়ে গেলাম, কারণ জেনেটিক লটারিতে এটা পেয়েছি আমি, যা আমার লিঙ্গ স্থির করে দিয়েছে।

জেনারেলের চোখের আড়ালে কী ভাবনা খেলা করছে কখনও জানতে পারিনি আমি, কিন্তু তার স্ত্রীর মনের অবস্থা একেবারে পরিষ্কার আমার কাছে।

BanglaBook.org

এব্যাপারে আমার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী যদি দেখা দেয়ও–ব্যাপারটা যাই হোক না কেন–এই মহিলা হবে না সেটা।

"বসো, আমির জান," বলল সে। "সুরাইয়া, ওকে একটা চেয়ার দাও, *বাচ্চে।* একটা পীচ ধুয়ে দাও। ওগুলো মিষ্টি, টাটকা।"

"না, ধন্যবাদ," বললাম আমি। "আমি বরং যাই। বাবা অপেক্ষা করছে।"

"তাই?" বলল খানুম তাহেরি। আমি ভদ্রতা করে প্রস্তাব করেছি বলে স্পষ্টই খুশী। "তাহলে ধরো, এটা অন্তত নিয়ে যাও।" একমুঠো কিসমিস আর কয়েকটা পীচ একটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ওটা নেওয়ার জন্যে জোর করল আমাকে। "তোমার বাবাকে আমার *সালাম* পৌঁছে দিও। আবার আমাদের দেখতে এসো।"

"আসব। ধন্যবাদ, খালা জান." বললাম। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে সুরাইয়া।

"আমি তো ভেবেছিলাম কোক খাব," বাবা বলল। পীচের ব্যাগটা আমার হাত থেকে নিল ও। একাধারে কৌতুক আর সিরিয়াস দৃষ্টিতে আমাকে দেখছিল ও। কথা বানাতে শুরু করেছিলাম আমি, কিন্তু একটা পীচে কামড় দিয়ে হাত নাড়ল বাবা। "বাদ দাও, আমির। খালি আমার কথাটা মনে রেখ।"

সেরাতে বিছানায় শুয়ে সুরাইয়ার চোখে কীভাবে সূর্যের আলো বিচিত্র সব ছবি এঁকেছে সেটা ভাবলাম। ওর কণ্ঠার হাড়ের উপরে সূক্ষ্ম গহ্বরের কথা ভাবলাম। মাথার ভেতর আমাদের কথপোকথন পুনারবৃত্তি করে গেলাম বারবার। কী বলেছিল ও? *শুনলাম তুমি লেখালেখি কর নাকি? শুনেছি তুমি একজন লেখক? কোনটা?* চাদরের উপর ছটফট করে চললাম। ছাদের দিকে চেয়ে রইলাম। আবার ওকে দেখার আগে ছয়টা শ্রমবহুল অন্তহীন *ইয়েল্‌দা* রাতের কথা ভেবে হতাশ বোধ করলাম।

কয়েক সপ্তাহ চলল এরকম। জেনারেল ঘুরতে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি, তারপর তাহেরির স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যাই। খানুম তাহেরি থাকলে আমাকে চা আর *কুলচা* খাওয়ার কথা বলে। কাবুলের আগের দিন সম্পর্কে আলাপ করি আমরা। আমাদের পরিচিত লোকজনের কথা বলি। তার অথ্রাইটিস নিয়ে আলাপ হয়। নিঃসন্দেহে সে লক্ষ করে থাকবে তার স্বামীর অনুপস্থিতির সাথেই

BanglaBook.org

আমার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সেটা কখনও বলেনি সে। "ইশ, একটুর জন্যে তোমার কাকার দেখা পেলে না," বলবে সে। খানুম তাহেরি থাকলেই আমার বরং ভালো লাগে। সেটা কেবল তার আন্তরিক আচরণের কারণে নয়, বরং তখন সুরাইয়া অনেক স্বাভাবিক থাকে, মা কাছে থাকায় অনেক কথা বলে। যেন তার উপস্থিতি যাই ঘটে থাকুক না কেন তাকে জায়েজ করে দিচ্ছে। যদিও জেনারেলের মতো একই মাত্রায় হবে না সেটা। খানুম তাহেরির উপস্থিতির কারণে আমাদের দেখা সাক্ষাৎগুলো গুঞ্জণ থেকে মুক্ত না হলেও গুঞ্জণে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। যদিও আমার সঙ্গে তার তোষামোদি সুরাইয়াকে স্পষ্টই বিব্রত করে তোলে।

একদিন সুরাইয়া আর আমি একা বুদে কথা বলছি, আমাকে স্কুলের কথা বলছিল ও: ফ্রিমন্টে ওহলোন জুনিয়র কলেজে জেনারেল এডুকেশন ক্লাসে পড়ছিল সে।

"কীসে মেজর করবে?"

"আমি টিচার হতে চাই," বলল সে।

"তাই? কেন?"

"সব সময় তাই চেয়েছি। আমরা ভার্জিনিয়ায় থাকতে ইএসএল সার্টিফায়েড হয়েছিলাম। এখন সপ্তাহে একদিন পাবলিক লাইব্রেরিতে পড়াই। মাও একজন টিচার। কাবুলের যারঘুনা হাই স্কুলে মেয়েদের ফারসি আর ইতিহাস পড়াত।"

পেটমোটা এক লোক পাঁচটা মোমবাতির একটা সেটের জন্যে তিন ডলার দিতে চাইল। সুরাইয়া সেটটা দিল তাকে। পায়ের কাছে একটা ছোট ক্যান্ডিবক্সে রেখে দিল টাকাটা। লাজুক চোখে আমার দিকে তাকাল। "তোমাকে একটা গল্প বলতে চাই আমি," বলল ও। "কিন্তু একটু দ্বিধা লাগছে।"

"বলো আমাকে।"

"একটু হাস্যকর।"

"দয়া করে শোনাও।"

হাসল ও। "বেশ, আমি যখন কাবুলে ফোর্থ গ্রেডের ছাত্র, বাবা বাড়ির কাজে সাহায্য করার জন্যে যেবা নামে এক মহিলাকে রেখেছিল। ইরানের মাশাদে তার একটা বোন ছিল। যেবা লেখাপড়া জানত না বলে মাঝে মধ্যে আমাকে দিয়ে চিঠি লেখাত। বোন জবাব দিলে আমি সেগুলো ওকে পড়ে শোনাতাম। একদিন ওকে জিজ্ঞেস করলাম ও লেখা-পড়া শিখতে চায় কিনা।

BanglaBOOK.org

দরাজ হাসল সে। চোখজোড়া পিটপিট করে উঠল। বলল খুবই ভালো হবে তাহলে। তো আমি আমার স্কুলের কাজ শেষ করার পর ওকে নিয়ে কিচেনে বসতে শুরু করলাম। ওকে *আলেফ-বেহ* শেখাতাম। মনে আছে অনেক সময় বাড়ির কাজ করতে করতে চোখ তুলে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে যেবাকে দেখতে পেতাম, প্রেশার কুকারে মাংস নাড়তে নাড়তে আগের রাতে বাড়ির কাজ হিসাবে করতে দেওয়া হরফ লেখা মকশ করছে।

"যাহোক, এক বছরের মধ্যেই ছোটদের বই পড়তে শিখে ফেলল যেবা। আমরা উঠোনে বসে থাকতাম, আর সে আমাকে দুরা আর সারার গল্পপড়ে শোনাত–আস্তে আস্তে হলেও নির্ভুলভাবে। আমাকে সে *মাওলেম* সুরাইয়া ডাকতে শুরু করল। টিচার সুরাইয়া।" আবার হাসল ও। "জানি ছেলেমানুষি মনে হচ্ছে, কিন্তু যেবা প্রথমবার চিঠি লেখার পরেই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল, আমি টিচার ছাড়া আর কিছু হতে চাই না। ওকে নিয়ে দারুণ গর্বিত হয়ে উঠেছিলাম আমি। মনে হচ্ছিল সত্যিকারের মূল্যবান একটা কাজ করেছি, বুঝেছ?"

"হ্যাঁ," মিথ্যে করে বললাম আমি। হাসানকে অপদস্থ করার জন্যে কীভাবে নিজের শিক্ষাকে ব্যবহার করেছি সেকথা ভাবলাম। কীভাবে বড়বড় শব্দগুলো দিয়ে ওকে হয়রানি করেছি, অথচ ও টেরও পায়নি।

"বাবা চাইছে আমি যেন ল' স্কুলে পড়ি। মা সব সময় মেডিকেল স্কুলের ইঙ্গিত দিয়ে আসছে। কিন্তু আমি টিচারই হব। এতে তেমন টাকাপয়সা নেই, কিন্তু এটাই হতে চাই আমি।"

"আমার মাও টিচার ছিল," বললাম।

"জানি," বলল ও। "বাবা বলেছে।" তারপর কী বলে বসেছে বুঝতে পেরে, ওর জবাবের তাৎপর্য নিয়ে, চেহারা লাল হয়ে উঠল ওর। মানে ওদের ভেতর আমার অনুপস্থিতিতে "আমির প্রসঙ্গে আলাপ" হয় বটে। হাসি ঠেকাতে বেশ ভালো রকম কসরত করতে হল আমাকে।

"তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি," পকেট থেকে একতাড়া স্ট্যাপল করা কাগজ বের কবলাম। "যেমন কথা দিয়েছিলাম।" ওকে আমার লেখা একটা ছোটগল্প দিলাম।

"ওহ, তোমার মনে ছিল," বলল ও। আসলে ঝলমল করে উঠেছে ওর চেহারা। "ধন্যবাদ!" আমি কোনওমতে বুঝতে পারলাম আমাকে প্রথমবারের মতো "*তু*" বলে সম্বোধন করেছে ও, আনুষ্ঠানিক "*শোমা*" নয়, কারণ হঠাৎ করে ওর হাসি উধাও হয়ে গেল। চেহারা থেকে রঙ মিলিয়ে গেল। আমার পেছনে একটা কিছুর ওপর স্থির হল ওর দৃষ্টি। চট করে ঘুরে দাঁড়ালাম

BanglaBook.org

আমি। মুখোমুখি হলাম জেনারেল তাহেরির।

"আমির জান। আমাদের হবু গল্প বলিয়ে। কী আনন্দের ব্যাপার," বলল সে। ক্ষীণ হাসছে।

"*সালাম*, জেনারেল সাহিব," ভারি হয়ে আসা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বললাম।

আমাকে পাশ কাটিয়ে বুদের দিকে এগিয়ে গেল সে। "আজকের দিনটা অনেক সুন্দর, তাই না?" বলল। তারপর ভেস্টের বুক পকেটে বুড়ো আঙুল ঠেসে দিল। অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল সুরাইয়ার দিকে। কাগজগুলো ওর হাতে তুলে দিল ও।

"শোনা যাচ্ছে এসপ্তাহে নাকি বৃষ্টি হবে। বিশ্বাসই হতে চায় না, কী বলো?" গোটানো কাগজগুলো গর্বেজক্যানে ফেলে দিল সে। আমার দিকে ফিরে আস্তে করে কাঁধে হাত রাখল। একসঙ্গে কয়েক কদম এগিয়ে গেলাম আমরা।

"কি জানো, *বাচে*, আমি আসলে তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করেছি। তুমি ভদ্র ছেলে। সত্যিই কথাটা বিশ্বাস করি। কিন্তু–" দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা হাত নাড়ল। "–ভদ্র ছেলেদেরও অনেক সময় কিছু কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। তো, এটা আমার দায়িত্ব একথা মনে করিয়ে দেওয়া যে ফ্রি মার্কেটে তুমি সম্ভ্রান্তদের একজন।" থামল সে। তার ভাবহীন চোখ চেয়ে আছে আমার দিকে। "বুঝতে পারছ, এখানে সবাই একজন গল্প বলিয়ে।" নিখুঁত দুপাটি দাঁত বের করে হাসল সে "তোমার বাবাকে আমার *সালাম* পৌঁছে দিয়ো, আমির জান।"

হাত নামিয়ে নিল সে। আবার হাসল।

"কী ব্যাপার?" জিজ্ঞেস করল বাবা। রকিং চেয়ারের বিনিময়ে এক বয়স্কা মহিলার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিল ও।

"কিছু না," বললাম। একটা পুরোনো টিভি সেটের উপর বসলাম। তারপর সব বললাম ওকে।

"আহ, আমির," দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও।

দেখা গেল যা ঘটেছে সেটা নিয়ে আসলে আমার অত ভাবিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

কারণ সপ্তাহের শেষের দিকে ঠাণ্ডা লেগে গেল বাবার।

হাঁচি আর খুশখুশে কাশি দিয়ে শুরু হয়েছিল। হাঁচি ভালো হয়ে গেল, কিন্তু কাশিটা

BanglaBook.org

য়ে গেল। রুমালে কফ ঝেড়ে সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখছিল ও। বারবার বুকটা রীক্ষা করাতে বললাম আমি, কিন্তু হাতের ইশারায় নাকচ করে দিয়েছে ও। হাসপাতাল আর ডাক্তার ওর দুচোখের বিষ। আমার জানামতে বাবা একবারই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল, ইন্ডিয়ায় গিয়ে ম্যালেরিয়ায় পড়ে গিয়েছিল যখন।

তারপর দু'সপ্তাহ পার হবার পর রক্তের দাগঅলা কফসহ একটা ন্যাকড়া টয়লেটে ফেলার সময় ধরে ফেলাম ওকে।

"কতদিন ধরে একাজ করছ তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আজ ডিনারে কী আছে?" বলল ও।

"তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি আমি।"

বাবা একটা গ্যাস স্টেশনের ম্যানেজার হলেও মালিক ওকে স্বাস্থ্য বীমা করে দেয়নি। বাবাও বেপরোয়া বলে ও নিয়ে চাপাচাপি করতে যায়নি। তো ওকে স্যান হোসের কাউন্টি হসপিটালে নিয়ে গেলাম। পাণ্ডু বর্ণের থলথলে ডাক্তার নিজেকে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র বলে পরিচয় দিল। "তোমার চেয়ে কম বয়সী আর আমার চেয়ে রোগা মনে হচ্ছে ওকে।" বিজিবিজ করল বাবা। বুকের এক্স-রে করানোর জন্যে আমাদের পাঠাল সে। নার্স আমাদের ডেকে পাঠানোর সময় রেসিডেন্ট একটা ফর্ম পূরণ করছিল।

"এটা নিয়ে ফ্রন্ট ডেস্কে চলে যাও।" দ্রুত লিখতে লিখতে বলল সে।

"কী এটা?" জানতে চাইলাম।

"একটা রেফারাল।" *হিজিবিজি-হিজিবিজি।*

"কিসের জন্যে?"

"পালমোনারি ক্লিনিক।"

চট করে আমার দিকে এক পলক তাকাল সে। চশমা ঠেলে উপরে ওঠাল। আবার লিখতে শুরু করল। "ওর ডান পাশের ফুসফুসে একটা দাগ রয়েছে। ওটা চেক করে দেখতে চাই।"

"একটা দাগ?" জিজ্ঞেস করলাম। হঠাৎ করে রুমটা যেন খুব ছোট বলে মনে হতে লাগল।

"ক্যানসার?" সহজ কণ্ঠে জানতে চাইল বাবা।

"সম্ভবত। সন্দেহজনক তো বটেই।" বিড়বিড় করে বলল ডাক্তার।

"আমাদেরকে আর কিছু বলতে পারবে না?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তেমন কিছু না। আগে একটা ক্যাট স্ক্যান করাতে হবে, তারপর ডাক্তারকে দেখাতে হবে সেটা।" আমার হাতে রেফারড ফর্মটা তুলে দিল সে। "তোমার বাবা সিগারেট খায় বললে না?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ।"

মাথা দোলাল সে। আমার দিত থেকে বাবার দিকে তাকিয়ে ফের আমার দিকে তাকাল। "দুই সপ্তাহর মধ্যেই ওরা তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।"

ওকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল দুই সপ্তাহ "সন্দেহজনক" শব্দটা নিয়ে কেমন করে বেঁচে থাকব? কেমন করে আমি খাব, কাজ করব, পড়াশোনা করব? এমন একটা কথা বলে কীভবে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারছে সে?

ফরমটা হাতে নিয়ে ওল্টালাম। সেরাতে বাবা ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর একটা কম্বল ভাঁজ করে নিলাম। ওটাকে *জায়নামাজ* হিসাবে ব্যবহার করলাম আমি। জমিনে মাথা *ঠেকিয়ে* কোরানের প্রায় ভুলে যাওয়া *আয়াত তেলাওয়াত* করলাম–কাবুলে যেসব *আয়াত* আমাদের মুখস্থ করতে বাধ্য করেছিল মোল্লাহ–যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি এমনকি নিশ্চিত নই এমন এক খোদার কাছে দয়া ভিক্ষা করলাম। এখন মোল্লাহকে হিংসা হল আমার। তার বিশ্বাস আর নিশ্চয়তার জন্যে হিংসা হল।

দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেল। কেউ কোনও রকম যোগাযোগ করল না। আমি ওদের ফোন করলে ওরা বলল ওরা রেফারালটা হারিয়ে ফেলেছে। আমি কি ওটা পাঠানোর ব্যাপারে নিশ্চিত? বলল তিন সপ্তাহের মধ্যে যোগাযোগ করবে ওরা। আমি নরক গুলজার করে ক্যাট স্ক্যানের জন্যে তিন সপ্তাহকে এক সপ্তাহে নামিয়ে আনলাম। ডাক্তার দেখানোর জন্যে দুই সপ্তাহ।

বাবা সে কোত্থেকে এসেছে জানতে চাওয়ার আগ পর্যন্ত পালমোনোলজিস্ট ডাক্তার শ্লাইডারের সঙ্গে আলাপটা ভালোই চলছিল। যেই ডাক্তার শ্লাইডার বলল সে রাশিয়ান, বাবা বেদিশা হয়ে গেল।

"ডাক্তার, আমাদের মাফ করবে," বললাম আমি। বাবাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে এলাম। ডাক্তার শ্লাইডার হেসে এক হাতে স্টেথোস্কোপ নিয়ে পিছিয়ে গেল।

"বাবা, ওয়েটিং রুমে ডাক্তার শ্লাইডারের জীবনী পড়েছি আমি। মিশিগানে ওর জন্ম। *মিশিগান!* সে আমেরিকান। আমি আর তুমি সারা জীবনেও এমন আমেরিকান হতে পারব না।"

"ওর জন্ম কোথায় আমি তার পরোয়া করি না। সে একজন *রাউসি*," যেন নোংরা কোনও শব্দ বলেছে এমনভাবে মুখ বাঁকাল। "ওর বাবা-মা রাশিয়া থেকে এসেছে। ওর দাদা-দাদী *রাউসি*। তোমার মায়ের নামে কসম কাটছি, সে আমাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করলে আমি ওর হাত ভেঙে ফেলব।"

"ডাক্তার শ্লাইডারের বাবা-মা *শোরোভিদের* হাত থেকে পালিয়ে

BanglaBook.org

এসছিল, বুঝতে পারছ না? ওরা পালিয়ে এসেছে!"

কিন্তু বাবা কিছুতেই শুনবে না এসব। আমার মনে হয় মৃত স্ত্রীর মতো আর মাত্র একটা জিনিসকেই ভালোবসত ও, সেটা হচ্ছে আফগানিস্তান। তার ছেড়ে আসা দেশ। হতাশায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠতে যাচ্ছিলাম আমি। তার বদলে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ফিরে তাকালাম ডাক্তার শ্নাইডারের দিকে। "আমি দুঃখিত, ডাক্তার। এভাবে কাজ হবে না।"

এরপরের পালমোনোলজিস্ট ডাক্তার আমানি ছিল ইরানি। বাবা তাকে অনুমোদন দিল। বাঁকা গোঁফঅলা মৃদুভাষী লোক ডাক্তার আমানি। মাথায় ধূসর ঝাঁকড়া চুল। সে আমাদের জানাল ক্যাট স্ক্যানটা সে দেখেছে, প্যাথলজির জন্যে লাঙ মাসের একটা টুকরো নিতে ব্রঙ্কোসকপি নামের একটা অপারেশন করতে হবে তাকে। পরের সপ্তাহে দিন ঠিক করল সে। বাবাকে অফিস থেকে বের করে আনার সময় তাকে ধন্যবাদ জানালাম। মনে মনে ভাবছিলাম এবার "মাস" শব্দটা নিয়ে এক সপ্তাহ পার করতে হবে আমাকে। এটা আবার "সন্দেহজনক" কথাটার চেয়ে আরও বেশী অলুক্ষণে। ভাবলাম এখন সুরাইয়া আমার পাশে থাকলে ভালো হত।

দেখা গেল শয়তানের মতো ক্যানসরেরও অনেক নাম। বাবার অসুখটার নাম "আউট সেল কারসিনোমা।" অ্যাডভান্সড। অপারেশনের অতীত। ডাক্তার আমানিকে একটা প্রগনসিসের কথা বলল বাবা। ডাক্তার আমানি ঠোঁট কামড়াল। "মারাত্মক" শব্দটা বলল। "কেমোথেরাপি আছে অবশ্য," বলল সে। "তবে সেটা কেবল পলিয়েটিভ হবে।"

"এর মানে কী?" জানতে চাইল বাবা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাক্তার আমানি। "মানে এতে ফলাফলে কোনও পরিবর্তন হবে না। স্রেফ দীর্ঘায়িত হবে।"

"জবাবটা একেবারে পরিষ্কার, ডাক্তার আমানি। সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ," বলল বাবা। "কিন্তু আমার জন্যে কোনও কেমো ওষুধ লাগবে না।" চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল এক রকম মনস্থির করে ফেলেছে ও। ঠিক সেদিনের মতো যেদিন মিসেস ডবিন্সের ডেস্কের উপর ফুড স্ট্যাম্পের স্তূপ ফেলেছিল।

"কিন্তু বাবা-"

"লোকের সামনে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে না, আমির। কখনও না। নিজেকে কী ভাব তুমি?"

ফ্লি মার্কেটে জেনারেল তাহেরি যে বৃষ্টির কথা বলেছিল সেটা নামতে নামতে

BanglaBook.org

কয়েক সপ্তাহ পার হয়ে গেল। কিন্তু আমরা যখন ডাক্তার আমানির অফিসে গেলাম, বিদায়ী গাড়িগুলো সাইডওঅকে কাদাগোলা পানি ছিটাতে লাগল। একটা সিগারেট ধরাল বাবা। গাড়ি পর্যন্ত এবং সেখান থেকে বাড়ি ফেরার আগ পর্যন্ত পুরো রাস্তা সিগারেট টানল ও।

বাবা লবির দরজায় চাবি ঢোকানোর সময় আমি বললাম, "আমার মনে হচ্ছে কেমোর একটা সুযোগ নিলে ভালো হত, বাবা।"

পকেটে চাবি ঢুকিয়ে আমাকে বৃষ্টি থেকে সরিয়ে দালানের ডোরাকাটা অনিংয়ের নিচে নিয়ে এল বাবা। সিগারেট ধরা হাতে আমার বুকে চাপ দিল ও। "*ব্যস!* আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।"

"আমার কী হবে, বাবা? আমি তাহলে কী করব?" জানতে চাইলাম। চোখজোড়া জলে ভরে উঠল আমার।

বাবার বৃষ্টিভেজা চেহারায় বিতৃষ্ণার একটা ছাপ খেলে গেল। আমি ছোট থাকতে ঠিক এই দৃষ্টিতে তাকাত বাবা। যখন আমি আছাড় খেয়ে মালাইচাকি ছড়ে ফেলে কাঁদতাম, তখনও কান্নাই এই বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করত। এবারও সেই কান্নাই তা ডেকে আনল। "তোমার বয়স এখন বাইশ বছর, আমির! একজন সাবালক! তুমি..." থামল ও, মুখ বন্ধ করল। আবার খুলল। ভাবল। আমাদের মাথার উপর বৃষ্টির জল অনিং ক্যানভাসের উপর বাদ্য বাজাচ্ছে। "তুমি বলছ, তোমার কী হবে? এতগুলো বছর ঠিক এই কথাটাই তোমাকে শেখানোর চেষ্টা করে আসছি আমি। কীভাবে এই প্রশ্নটা না করার চেষ্টা করতে হবে।"

দরজা খুলল ও। আমার দিকে ফিরল আবার। "আরেকটা কথা। আর কেউ যেন একথাটা জানতে না পারে, ঠিকাছে? কেউ না। আমি কারও সহানুভূতি চাই না।" তারপর ম্লান করিডরে উধাও হয়ে গেল ও। বাকি দিনটা টিভির সামনে সিগারেট টেনে গেল। জানি না কাকে উপেক্ষা করছিল। আমাকে? ডাক্তার আমানিকে? নাকি যে আল্লাহকে কখনও বিশ্বাস করেনি, তাকে?

কিছুদিন এমনকি ক্যানসারও বাবাকে ফ্লি মার্কেট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারল না। শনিবারদিনগুলোয় আমরা গ্যারাজ-সেল অব্যাহত রাখলাম। বাবা ড্রাইভার আর আমি নেভিগেটর। রোববার আমাদের পসরা সাজিয়ে বসতে লাগলাম। ব্রাস ল্যাম্প, বেসবল গ্লাভস, ভাঙা যিপারঅলা স্কি জ্যাকেট। বাবা পুরোনো দেশের চেনাজানাদের ডেকে আনত। আমি এক বা দুই ডলারের জন্যে খদ্দেরের সঙ্গে দরকষাকষি করি। যেন এর অনেক গুরুত্ব আছে। যেন

প্রতিদিন দোকান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার এতীম হওয়ার দিন এগিয়ে আসছে না।

অনেক সময় জেনারেল তাহেরি আর তার স্ত্রী আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যায়। ঝানু কূটনীতিক জেনারেল আমার দিকে হাসি মুখে তাকায়। দুহাতে করমর্দন করে। কিন্তু খানুম তাহেরির ভেতর এক ধরনের নতুন সংযম দেখা যাচ্ছে। সেই সংযম কেবল জেনারেলের মনোযোগ অন্য কোনওদিকে সরে গেলেই গোপন ঝুলন্ত হাসি বা আমার দিকে ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকানোর ভেতর দিয়ে ভঙ্গ হয়।

সেই সময়টা আমার অনেক কিছুর "প্রথমবার" হিসেবে মনে অছে। বাথরুমে বাবার প্রথম গোঙানি শুনেছিলাম আমি। প্রথমবারের মতো ওর বালিশে রক্ত পেয়েছি। গ্যাস স্টেশনে তিন বছর চাকরি করার সময় বাবা কখনও অসুস্থ হয়নি। আরেকটা প্রথম।

সেই বছর হ্যালুইন নাগাদ বাবা শনিবার বিকেলের মাঝামাঝি এত ক্লান্ত হয়ে উঠছিল যে আমি গাড়ি থেকে বের হয়ে পুরোনো জিনিস নিয়ে দর কষাকষি করতাম, ও গাড়িতেই অপেক্ষা করত। থ্যাংকস গিভিং নাগাদ দুপুরের আগেই ইস্তফা দিতে শুরু করল ও। সামনের লনে যখন স্লেজের আবির্ভাব ঘটল আর ডাগলাস ফারের উপর তুষারের পর্দা জমল, বাবা বাড়িতেই রইল: আর আমি একা ফক্সওয়্যাগন চালিয়ে যাওয়া-আসা করলাম পেনিনসূলায়।

ফ্লি মার্কেটে এক সময় বাবার পরিচিত জনেরা ওর ওজন কমা নিয়ে মন্তব্য করতে লাগল। প্রথম প্রথম সেটা ছিল প্রশংসাসূচক। ওরা এমনকি গোপন রহস্যটা কী সেটাও জানতে চাইল। কিন্তু প্রশংসা আর প্রশ্ন দমে গেলেও ওজন কমা থামল না। একের পর এক পাউন্ড ওজন কমেই চলল। কমেই চলল। গাল সেঁটে গেল। কপালের দুপাশ গলে গেল। কোটরের গর্তে বসে গেল ওর চোখজোড়া।

তারপর একদিন, রোববারে নববর্ষের অল্পকদিন বাদে, এক গাট্টাগোট্টা ফিলিপিনোর কাছে একটা ল্যাম্প শেড বিক্রি করছিল বাবা। আমি তখন ফক্সওয়্যাগনের ভেতর ওর পা ঢেকে দেওয়ার জন্যে একটা কম্বলের খোঁজ করছিলাম।

"এই যে, এই লোকের তো সাহায্য দরকার!" সতর্ক কণ্ঠে বলে উঠল ফিলিপিনো। ঘুরে দেখি বাবা জমিনে পড়ে আছে। ওর হাতা-পা থরথর করে কাঁপছে।

"*কোমুক!*" চিৎকার করে উঠলাম আমি। "কেউ সাহায্য করো!" বাবার

Banglabook.org

কাছে দৌড়ে গেলাম। মুখে ফেনা গড়াচ্ছে ওর। ফেনায় ভরে যাচ্ছে ওর দাড়ি। কুঁচকে থাকা চোখের শাদা অংশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

লোকজন আমাদের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। কাকে যেন বলতে শুনলাম মৃগীরোগ। অন্য একজন চিৎকার করছে। "৯১১-এ ফোন কর!" ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেলাম আমি। আমাদের ঘিরে ভীড় জমে ওঠায় আকাশ ঢাকা পড়ে গেল।

বাবার লালা লাল হয়ে গেল। জিভ কামড়াচ্ছে ও। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাত জড়িয়ে ধরে বললাম, বাবা এই যে আমি। তুমি ঠিক হয়ে যাবে। এই তো এখানেই আছি আমি। যেন ওর খিঁচুনী বন্ধ করতে পারব। বাবাকে ছেড়ে যেতে রাজি করাতে পারব ওদের। হাঁটুতে এক ধরনের ভার অনুভব করলাম। দেখলাম বাবার ব্লাডার শিথিল হয়ে গেছে। *শসস*, বাবা জান। আমি এখানে। তোমার ছেলে তোমার পাশেই আছে।

শাদা দাড়ি আর টেকো মাথা ডাক্তার আমাকে টেনে রুম থেকে বের করে নিয়ে এল। "তোমাকে নিয়ে তোমার বাবার ক্যাট স্ক্যান দেখতে চাই আমি," বলল সে। হলওয়ের একটা ভিউয়িং বক্সে ছবিটা আটকাল। পেন্সিলের ইরেজার লাগানো প্রান্ত দিয়ে বাবার ক্যানসারের ছবিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল। অনেকটা কোনও পুলিসের মৃতদেহে ডাকাতের গুলির চিহ্ন তার পরিবারের সদস্যদের দেখানোর মতো। ছবিগুলোতে বাবার মগজটাকে বিরাট কোনও ওয়ালনাটের ক্রস সেকশনের মতো মনে হল। টেনিস বলের মতো ধূসর জিনিসে ছিন্নভিন্ন হয়ে আছে।

"দেখতেই পাচ্ছ, ক্যানসার মেটেসটেসাইজড হয়ে গেছে," বলল সে। "ওকে ব্রেইনের ফোলা কমাতে স্টেরয়েড নিতে হবে। অ্যান্টিসিজার মেডিসিনও খেতে হবে। আমি প্যালিয়েটিভ রেডিয়েশনের কথা বলব। এর মানে জানা আছে তোমার?"

বললাম, হ্যাঁ। ক্যানসারের আলোচনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল আমার।

"ঠিকাছে,তাহলে," বলল সে। বীপার পরখ করল। "আমাকে যেতে হচ্ছে। তবে তোমার কোনও প্রশ্ন থাকলে আমাকে পেইজ করতে পারো।"

"ধন্যবাদ।"

বাবার খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসে সারা রাত কাটিয়ে দিলাম আমি।

পরের দিন সকালে হলের ওপাশের ওয়েটিং রুম আফগানে ঠাসাঠাসি অবস্থা

BanglaBook.org

হল। নিওয়ার্কের কসাই। বাবার এতীমখানায় ওর সঙ্গে কাজ করা এক এঞ্জিনিয়ার। ওরা লাইন ধরে এসে নীরবে বাবাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। ওর দ্রুত আরোগ্য কামনা করল। বাবা তখন জেগে ছিল। ঘোর লাগা, ক্লান্ত, কিন্তু জেগে।

মাঝ সকালের দিকে জেনারেল তাহেরি আর তার স্ত্রী এল। সুরাইয়া এল তাদের পিছু পিছু। পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা। আবার একই সময়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। "কেমন আছ, *দোস্ত* আমার?" বাবার হাত ধরে বলল জেনারেল তাহেরি।

বাহুতে ঝোলানো আইভির দিকে ইঙ্গিত করল বাবা। ক্ষীণ হাসল। পাল্টা হাসল জেনারেল।

"তোমাদের এত কষ্ট করতে যাওয়া ঠিক হয়নি। তোমাদের সবার কথাই বলছি," ককিয়ে উঠে বলল বাবা।

"এটা কোনও কষ্ট না," খানুম তাহেরি বলল।

"মোটেই কোনও কষ্ট না। তারচেয়েও জরুরি কথা হচ্ছে, তোমার কি কিছু লাগবে?" জিজ্ঞেস করল জেনারেল তাহেরি। "যেকোনও কিছু? নিজের ভাইয়ের কাছে যেভাবে চাইতে আমার কাছেও ঠিক সেভাবে চাইতে পারো।"

পশতুনদের সম্পর্কে বাবার বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। *আমরা রগচটা হতে পারি। জানি আমাদের অনেক বেশী অহঙ্কার। কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে, বিশ্বাস করো, পাশে একজন পশতুন ছাড়া আর কাউকে পাবে না তুমি।*

বালিশের উপর মাথা নাড়ল বাবা। "তুমি এখানে আসাতেই আমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে গেছে।" জেনারেল হেসে বাবার হাত চেপে দিল। "কেমন আছ, আমির জান? তোমার কিছু লাগবে?"

আমার দিকে ওর তাকানোর ভঙ্গি, ওর চোখে ছিল মায়া। "নাহ, ধন্যবাদ, জেনারেল সাহিব। আমি..." আমার গলায় একটা কি যেন দলা পাকিয়ে উঠল। চোখ ভরে উঠল জলে। এক ছুটে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম।

ভিউয়িং বক্সের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদলাম। এখানে আগের রাতে খুনীর চেহারা দেখেছি।

বাবার রুমের দরজা খুলে সুরাইয়া বেরিয়ে হয়ে এল। আমার পাশে এসে দাঁড়াল ও। ওর পরনে একটা ধূসর স্যোয়েট-শার্ট আর জিন্স। চুল খোলা। ওর আলিঙ্গনে স্বস্তি খুঁজে পেতে চাইলাম আমি।

"আমি দুঃখিত, আমির," বলল ও। "আমরা সবাই জানতাম একটা

BanglaBook.org

কোনও সমস্যা আছে, কিন্তু ব্যাপারটা যে এমন তার কোনও ধারণাই ছিল না।"

শার্টের হাতায় চোখ মুছলাম আমি। "কেউ জানুক, চায়নি ও।"

"তোমার কিছু লাগবে?"

"না," হাসার চেষ্টা করলাম আমি। আমার হাতে হাত রাখল ও। আমাদের প্রথম স্পর্শ। গ্রহণ করলাম। হাতটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এলাম। চোখের কাছে। ছেড়ে দিলাম তারপর। "তুমি বরং ভেতরে যাও। নইলে তোমার বাবা আমার উপর ক্ষেপে যাবে।"

হাসল ও। মাথা দোলাল। "তাই উচিত হবে।" চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল ও।

"সুরাইয়া?"

"কী?"

"তুমি আসায় আমি খুশী হয়েছি। এর মানে...আমার কাছে অনেক কিছু।"

দুদিন পরে বাবাকে ছেড়ে দিল ওরা। বাবাকে রেডিয়েশন চিকিৎসা নিতে রাজি করানোর জন্যে ওরা রেডিয়েশন অন্টোলজিস্ট বলে একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এল। বাবা প্রত্যাখ্যান করল। আমি যাতে বাবাকে রাজি করাই সে চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু বাবার মুখের ভাব আগেই দেখা ছিল আমার। ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে ফর্মটর্মে সই করে আমার ফোর্ড তোরিনোয় করে বাবাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম।

সেরাতে একটা উলের কম্বল ওর গায়ে দিয়ে কাউচে শুয়ে ছিল বাবা। ওকে গরম চা আর রোস্ট করা আখরোট এনে দিলাম আমি। ওর পিঠের নিচে হাত দিয়ে অনায়াসে ওঠালাম ওকে। আমার হাতের নিচে ওর শোল্ডারব্লেড যেন পাখির ডানার মতো মনে হল। কম্বলটা আবার ওর বুক পর্যন্ত টেনে দিলাম। পাঁজরের হাড়গুলো গায়ের পাতলা পাণ্ডুর চামড়াকে টানটান করে রেখেছে।

"তোমার জন্যে আর কিছু করার আছে আমার, বাবা?"

"না, *বাচ্চে*। ধন্যবাদ।"

ওর পাশে বসলাম আমি। "তাহলে তুমি আমার জন্যে একটা কিছু করতে পারবে কিনা ভাবছি। যদি খুব বেশী ক্লান্ত না হয়ে থাক।"

"কী?"

"আমি *খাস্তেগারিতে* যেতে চাই। আমি চাই তুমি জেনারেল তাহেরিকে

BanglaBook.org

ওর মেয়ের জন্যে প্রস্তাব দাও।"

বাবার শুকনো ঠোঁটজোড়া হাসিতে প্রসারিত হল। কোঁকড়ানো পাতায় সবুজের ছোপ। "তুমি শিওর?"

"আর কোনও ব্যাপারে এতটা শিওর ছিলাম না।"

"ঠিক মতো ভেবে দেখেছ?"

"*বালে*, বাবা।"

"তাহলে ফোনটা আমার হাতে দাও। আর আমার ছোট নোট বইটা।"

চোখ পিটপিট করলাম আমি। "এখনই?"

"নইলে কখন?"

হাসলাম। "ঠিকাছে।" টেলিফোন আর ছোট নোট বইটা দিলাম ওকে। ওতে আফগান বন্ধুদের নাম্বার লিখে রেখেছিল বাবা। তাহেরিদের নাম্বার খুঁজে বের করে ডায়াল করল। কানের কাছে নিয়ে এল রিসিভার। আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা তখন নাচছে।

"জামিলা জান? *সালাম আলাইকুম।*" বলল ও। নিজের পরিচয় দিল। বিরতি। "অনেক ভালো। ধন্যবাদ। তোমরা এসে কি যে ভালো হয়েছে।" একটুক্ষণ শুনল ও। মাথা দোলাল। "মনে থাকবে কথাটা। ধন্যবাদ। জেনারেল সাহিব বাড়ি আছে?" বিরতি। "ধন্যবাদ।"

আমার দিকে চকিত দৃষ্টি হানল ও। কেন যেন হাসতে ইচ্ছে করল আমার। কিংবা চিৎকার করে উঠতে মন চাইল। হাতটা মুঠি পাকিয়ে মুখের কাছে এনে কামড়ে দিলাম। নাক দিয়ে মৃদু স্বরে হেসে উঠল বাবা।

"জেনারেল সাহিব, *সালাম আলাইকুম*...হ্যাঁ, বেশ ভালো...*বালে*... তোমার মেহেরবানি, জেনারেল সাহিব। ফোন করেছি এটা জানতে যে আমি কি কাল সকালে তোমার আর খানুম তাহেরির সঙ্গে একটু দেখা করতে আসতে পারব কিনা। একটা সম্মানের ব্যাপার এটা...হ্যাঁ...এগারোটা তো খুব ভালো। ততক্ষণ পর্যন্ত *খোদা হাফেজ*।"

ফোন নামিয়ে রাখল বাবা। পরস্পরের দিকে তাকালাম আমরা। হাসতে শুরু করলাম আমি। বাবাও যোগ দিল সে হাসিতে।

চুল ভিজিয়ে উল্টো করে আঁচড়াল বাবা। ওকে একটা পরিষ্কার শাদা শার্ট পরতে সাহায্য করলাম, টাই বেঁধে দিলাম। কলার বাটন আর বাবার গলার মাঝখানে দুই ইঞ্চি ফাঁকা জায়গাটা নজরে এল আমার। বাবা একেবারে চলে যাবার পর রেখে যাওয়া সমস্ত ফাঁকা জায়গার কথা ভাবলাম আমি। ভিন্ন কিছু

BanglaBook.org

ভাববার চেষ্টা করলাম। ও চলে যায়নি। এখনও না। আজকের দিনটা ভালো কিছু ভাববার জন্যে। ওর বাদমী স্যুটের জ্যাকেটটা, আমার গ্র্যাজুয়েশনের সময় পরেছিল ওটা ও, গায়ের উপর ঝুলে পড়েছে। বাবার অনেক বেশী অংশই হারিয়ে গেছ, ওটা আর পূরণ হওয়ার নয়। ওটার হাতা গুটিয়ে না দিয়ে পারলাম না। সামনে ঝুঁকে ওর জুতোর ফিতে বেঁধে দিলাম।

ফ্রিমন্টে অনেক আফগানের আবাসিক এলাকা হিসাবে পরিচিত একটা জায়গায় একতলা একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে তাহেরিরা। বে-উইন্ডো আছে এটার, পিচ করা ছাদ আর সীমানা ঘেরা চৌহদ্দী। এখানে টবে রাখা জেরানিয়েম দেখতে পেলাম আমি। ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা রয়েছে জেনারেলের ধূসর ভ্যানটা।

বাবাকে ফোর্ড থেকে বের হতে সাহায্য করলাম। তারপর হুইলের পেছনে উঠে বসলাম আবার। প্যাসেঞ্জার উইন্ডো দিয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ল ও। "বাড়িতেই থেক। ঘণ্টাখানেকের ভেতর তোমাকে ফোন করব আমি।"

"ঠিকাছে, বাবা," বললাম। "গুড লাক।"

হাসল ও।

চলে এলাম আমি। রিয়ার ভিউ মিররে দেখলাম বাবা ওর শেষ দায়িত্ব পালন করতে টলমল পায়ে ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাবার ফোনের অপেক্ষা করার সময় আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের লিভিং রুমের এমাথা ওমাথায় পায়চারি করতে লাগলাম আমি। সাড়ে দশ কদম বিস্তার। জেনারেল না বলে দিলে কী হবে? আমাকে সে যদি ঘৃণা করে থাকে? বারবার কিচেনে এসে আভেন ক্লকটা দেখতে লাগলাম।

দুপুরের আগে আগে বেজে উঠল ফোন। বাবা।

"তো?"

"জেনারেল রাজি হয়েছে।"

ফোঁশ করে আটকে রাখা দম ছাড়লাম আমি। বসে পড়লাম ধপ করে। আমার হাতজোড়া কাঁপছে। "রাজি হয়েছে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সুরাইয়া জান ওপরে ওর নিজের রুমে রয়েছে। আগে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় ও।"

"ঠিকাছে।"

কাউকে কিছু একটা বলল বাবা। ও ফোন তুলে রাখার সময় ডাবল ক্লিক করে একটা শব্দ হল।

BanglaBook.org

"আমির?" সুরাইয়ার কণ্ঠস্বর।

"সালাম।"

"বাবা হ্যাঁ বলেছে।"

"জানি," বললাম। রিসিভার হাত বদল করলাম। হাসছি। "কি যে খুশী লাগছে আমার। কী বলতে হবে বুঝতে পারছি না।"

"আমিও খুশী, আমির। আমি...বিশ্বাসই করতে পারছি না যে এমন একটা ব্যাপার ঘটছে।"

জোরে হেসে উঠলাম আমি। "জানি।"

"শোন," বলল ও। "তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। এমন একটা কথা যেটা আগেই জানা দরকার তোমার..."

"আমি পরোয়া করি না।"

"তোমার জানা দরকার। আমাদের মাঝে কোনও রকম গোপনীয়তা চাই না আমি। আমি চাই কথাটা আমার কাছ থেকেই শোন তুমি।"

"তাতে যদি তোমার ভালো লাগে, ঠিক আছে, বলো। কিন্তু তাতে করে কিছুই পাল্টাবে না।"

অন্যপ্রান্তে দীর্ঘ বিরতি। "আমরা ভার্জিনিয়ায় থাকতে একটা আফগান ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি। তখন আমার বয়স আঠার... বিদ্রোহী...নির্বোধ, আর...ও ছিল ড্রাগে আসক্ত...প্রায় এক মাসের মতো একসঙ্গে ছিলাম আমরা। ভার্জিনিয়ার সব আফগান এনিয়ে আলাপে মশগুল ছিল।

"শেষ পর্যন্ত আমাদের খুঁজে বের করে *পাদর*। দরজার এসে হাজির হয় ও...আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে বাধ্য করে। আমি তখন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। চিৎকার করছিলাম। আর্তনাদ করেছি। ওকে ঘৃণা করার কথা বলেছি...

"যাক, বাড়ি ফিরে আসি আমি। তারপর–" কাঁদছে ও। "মাফ করবে।" ফোন নামিয়ে রাখার আওয়াজ পেলাম ওপাশে। নাক টানল। "বাড়ি ফিরে এসে দেখি মায়ের স্ট্রোক হয়ে গেছে। ওর মুখের ডান পাশ প্যারালিসিস হয়ে গেছে...এমন অপরাধী মনে হল নিজেকে। এটা ওর পাওনা ছিল না।

"এর অল্পদিন পরে আমাদের ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে আসে পাদর।" এর পর নীরবতা নেমে এল।

"এখন বাবার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কেমন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাদের সব সময়ই মতানৈক্য ছিল। তারপরেও চালিয়ে নিচ্ছি। তবে

BanglaBook.org

সেদিন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল বলে ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি আসলেই বিশ্বাস করি আমাকে ও বাঁচিয়েছিল।" একটু থামল ও। "তো, তোমাকে যা বললাম, সেটা কি তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে এখন?"

"খানিকটা," বললাম। এ ব্যপারে ওকে সত্য বলা আমার দায়িত্ব। মিথ্যে বলতে পারলাম না। বলতে পারলাম না যে ও আরেকটা লোকের সঙ্গে ছিল জানার পর আমার গর্ব, আমার *ইফতিখারে* একটুও ঘা লাগেনি, যেখানে আমি কখনও কোনও মেয়েকে নিয়ে বিছানায় যাইনি। ব্যাপারটা একটু হলেও আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। কিন্তু বাবাকে *খাস্তগেরির* কথা বলার আগে এনিয়ে অনেক ভেবেছি। শেষ মেষ আমার মনে যে প্রশ্নটা জেগে উঠেছে সেটা হল: এত লোক থাকতে আমি কী করে কাউকে তার অতীতের জন্যে সাজা দিতে পারি?

"তোমার মত পাল্টানোর মতো যথেষ্ট খারাপ লাগছে কি?"

"না, সুরাইয়া। কাছাকাছিও না," বললাম। "তোমার কোনও কথাই কোনও কিছু বদলাবে না। আমি আমাদের বিয়ে চাই।"

আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল ও।

ওকে ঈর্ষা হল আমার। প্রাণ খুলে বলে মোকাবিলা করেছে। আমি মুখ খুললাম, ওকে প্রায় বলে বসতে যাচ্ছিলাম কীভাবে হাসানের সঙ্গে বেঈমানি করেছি। মিথ্যে বলেছি। ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। বাবা আর আলির চল্লিশ বছরের সম্পর্ক বরবাদ করে দিয়েছি। কিন্তু বললাম না। আমার মনে ভাবনা জাগল, সুরাইয়া তাহেরি অনেক দিক থেকেই আমার চেয়ে ঢের ভালো মানুষ। সাহস হচ্ছে তার একটা।

BanglaBook.org

তের

পরদিন সন্ধ্যায় আমরা যখন—*লাফয*, "পাকা কথা"—দেওয়ার জন্যে তাহেরিদের বাড়িতে পৌঁছলাম, ফোর্ডটা রাস্তার উল্টোদিকে পার্ক করতে হল আমাকে। ওদের ড্রাইভওয়ে আগেই গাড়িতে ভরে গেছে। আগের দিন কেনা একটা নেভী ব্লু স্যুট পরেছি আমি। বাবাকে *খাস্তেগেরি* থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার পরে করেছি কাজটা। রিয়ার ভিউ মিররে টাইটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিলাম।

"দেখতে *খোশতিপ* লাগছে তোমাকে," বলল বাবা। সুদর্শন।

"ধন্যবাদ, বাবা। তুমি ঠিক আছো তো? এখানে এসে তোমার ভালো লাগছে?"

"এখানে এসে? আমির, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিন।" হাসল ও ক্লান্তভাবে।

দরজার ওপাশে হাসি আর কথার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। মৃদু শব্দে আফগান গান বাজছে। উস্তাদ সারাহাংয়ের গাওয়া ক্লাসিক্যাল *গযল* বলে মনে হচ্ছে। বেল বাজালাম আমি। ফয়ের জানালা দিয়ে একটা মুখ উঁকি দিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। "ওরা এসে গেছে!" একটা নারী কণ্ঠের আওয়াজ কানে এল। শোরগোল থেমে গেল। কেউ একজন গান বন্ধ করে দিল।

খানুম তাহেরি দরজা মেলে ধরল। "*সালাম আলাইকুম,*" বলল সে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চেহারা। চুল পার্ম করেছে, দেখতে পেলাম। গোড়ালী পর্যন্ত

BanglaBook.org

লম্বা কালো একটা জাঁকাল পোশাক পরেছে সে। আমি ফয়েতে পা রাখতেই ওর চোখজোড়া জলে ভিজে উঠল। "মাত্র ঘরে পা রেখেছ, আর দেখ এরই মধ্যে কান্না এসে যাচ্ছে আমার, আমির জান," বলল সে। ওর হাতে একটা চুমু খেলাম আমি। গত রাতে ঠিক যেভাবে বাবা বলে দিয়েছিল।

উজ্জ্বল একটা হলওয়ে হয়ে আমাদের লিভিং রুমে নিয়ে এল সে। উড প্যানেল করা দেয়ালে আমার নতুন পরিবার হয়ে উঠতে যাচ্ছে যারা তাদের ছবি দেখতে পেলাম: তরুণ বুফান্ত-চুলের খানুম তাহেরি আর জেনারেল–পেছনে নায়াগ্রা ফলস; একটা সেলাই বিহীন পোশাকে খানুম তাহেরি, জেনারেলের একটা সরু ল্যাপেলঅলা জ্যাকেট আর পাতলা টাই, মাথা ভর্তি কালো চুল; একটা রোলার কোস্টারে উঠতে যাচ্ছে সুরাইয়া, হাসি মুখে হাত নাড়ছে, দাঁতের রুপালী তারে ঠিকরে যাচ্ছে সূর্যের আলো। জেনারেলের একটা ছবি, পূর্ণ মিলিটারি পোশাকে দুর্ধর্ষ দেখাচ্ছে। জর্দানের বাদশাহ হুসেইনের সঙ্গে করমর্দন করছে সে। যাহির শাহ-র একটা পোর্ট্রেট।

দেয়াল বরাবর বসানো চেয়ারে অন্তত দুই ডযেন লোকে ভর্তি লিভিং রুম। বাবা ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল সবাই। সারা ঘরে ঘুরে বেড়ালাম আমরা–বাবা ধীর পায়ে এগোচ্ছে, আমি ওর পেছনে, মেহমানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জেনারেল–তার পরনে সেই ধূসর স্যুট–বাবা কোলাকুলি করল ওর সঙ্গে। একে অন্যের পিঠে আলগোছে চাপড় দিল। শ্রদ্ধামেশানো চাপা কণ্ঠে *সালাম* বিনিময় করল ওরা।

আমার দুহাতে ধরে পরিচিতের হাসি দিল জেনারেল। যেন বলছে, "হ্যাঁ, এটাই ঠিক কায়দা–আফগান *দস্তুর*–একাজ করার, *বাচ্চে*।" তিনবার গালে চুমু খেলাম আমরা।

লোকজনে ঠাসা রুমে জেনারেল আর তার স্ত্রীর উল্টোদিকে বসলাম আমরা, আমি আর বাবা পাশাপাশি। বাবাব শ্বাসপ্রশ্বাস একটু অনিয়মিত হয়ে উঠেছে। বারবার রুমাল দিয়ে কপাল আর চাঁদির ঘাম মুছছে ও। আমাকে ওর দিকে তাকাতে দেখে কোনওমতে একটা হাসি দিল ও। "আমি ঠিক আছি," বলল বিড়বিড় করে।

রেওয়াজ অনুযায়ী সুরাইয়া নেই এখানে।

জেনারেল কেশে গলা পরিষ্কার আগে পর্যন্ত খুচরো আলাপচারিতা আর অলস কথাবার্তা চলল। তারপর পুরো ঘর নীরব হয়ে গেল। সবাই সম্মানের সাথে যার যার হাতের দিকে তাকিয়ে রইল। বাবার উদ্দেশে মাথা দোলাল জেনারেল।

গলা পরিষ্কার করে নিল বাবা। কিন্তু শুরু করার পর দম নেওয়া ছাড়া

BanglaBook.org

কোনও কথাই একবারে শেষ করতে পারছিল না ও। "জেনারেলে সাহিব, খানুম জামিলা জান...আমি আর আমার ছেলে খুব বিনয়ের সঙ্গে...আজ তোমাদের বাড়ি এসেছি। তোমরা...সম্মানিত মানুষ...সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান...গর্বিত ঐতিহ্য রয়েছে। আমি আসলে চরম *ইহতিরাম* ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসিনি...আর তোমাদের জন্যে সর্বোচ্চ সম্মান, তোমাদের পরিবারের নামের প্রতি, তোমাদের...পূর্বপুরুষের স্মৃতির প্রতি।" থেমে গেল ও। দম নেওয়ার চেষ্টা করল। ভুরু মুছল। "আমির জান আমার একমাত্র ছেলে...আমার একমাত্র সন্তান। আমার কাছে সে খুবই ভালো ছেলে বলে নিজেকে প্রমাণ করেছে। আমি আশা করি...ও তোমাদের সুনজর পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। আমি তোমাদের কাছে আমির আর আমাকে সম্মান দেখিয়ে...আমার একমাত্র ছেলেকে তোমাদের পরিবারে অন্তর্ভূক্ত করার অনুরোধ জানাচ্ছি।"

সৌজন্যের সাথে মাথা দোলাল জেনারেল।

"তোমার মতো একজন মানুষের ছেলেকে আমাদের পরিবারে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা নিজেদের সম্মানিত মনে করছি," বলল সে। "তোমার সুখ্যাতি তোমার আগে আগে যায়। কাবুলে আমি তোমার বিনীত ভক্ত ছিলাম। আজও তাই আছি। তোমাদের পরিবার আর আমাদের পরিবার মিলিত হতে যাচ্ছে বলে আমি খুবই খুশী।

"তোমাকে বলছি, আমির জান, তোমাকে, আমার মেয়ের স্বামী হিসাবে নিজের ছেলের মতোই আমার ঘরে স্বাগত জানাই। ও আমার চোখের *নূর।* তোমার দুঃখ হবে আমাদের দুঃখ, তোমার আনন্দ হবে আমাদের আনন্দ। আশা করি আমাকে আর জামিলা খালাকে তুমি তোমার আরেক বাবা-মা হিসেবে দেখতে আসবে। আমি তোমার আর আমাদের প্রিয় সুরাইয়ার জন্যে দোয়া করি যেন তোমরা সুখী হও। তোমাদের দুজনের জন্যেই আমাদের শুভাশীষ রইল।"

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। এই সঙ্কেত পেয়ে সবার চোখ চলে গেল হলওয়ের দিকে। যে মুহূর্তটির অপেক্ষায় ছিলাম আমি।

শেষ মাথায় উদয় হল সুরাইয়া। লম্বা হাতা আর সোনালী কাজ করা চোখ ধাঁধানো একটা আফগানি ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছে ও। আমার হাত ধরল বাবা, শক্ত হয়ে চেপে বসল ওর হাত। আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল খানুম তাহেরি। আস্তে আস্তে আমাদের কাছে এল সুরাইয়া। কম বয়সী মেয়ে আত্মীয়রা রয়েছে ওর পেছনে।

বাবার হাতে চুমু খেল ও। অবশেষে আমার পাশে এসে বসল। নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

চড়ে উঠল হাততালির শব্দ।

রেওয়াজ অনুযায়ী সুরাইয়ার পরিবারের বাগদান অনুষ্ঠান, *শিরিনি-খোরি*–কিংবা "মিষ্টিমুখের অনুষ্ঠানে"র আয়োজন করার কথা। তারপর একটা এনগেজমেন্ট পিরিয়ড পার হবে। কয়েক মাস স্থায়ী হবে সেটা। তারপর বিয়ে। এর খরচা মেটাতে হবে বাবাকে।

আমরা সবাই একমত হলাম যে সুরাইয়া আর আমি *শিরিনি-খোরি* বাদ দেব। কারণটা সবার জানা ছিল। সেজন্যে বিশেষ করে কাউকে বলতে হল না: কারণ বাবা কয়েক মাস বেঁচে থাকবে না।

বিয়ের যোগাড়যন্ত্র চলার সময় আমি আর সুরাইয়া কখনও একসঙ্গে একা কেনাকাটা করতে বের হইনি, কারণ তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি। এমনকি *শিরিনি-খোরি* পর্যন্ত না। সেটা অশোভন মনে করা হত। তো বাবাকে নিয়ে ডিনারে তাহেরিদের বাড়িতে গিয়ে পুষিয়ে নিতে হয়েছিল আমাকে। ডিনার টেবিলে সুরাইয়ার উল্টোদিকে থাকত আমার আসন। ভাবতাম আমার বুকে ওর মাথা রাখতে, ওর চুলের সুবাস নিতে, ওকে চুমু খেতে, ওর সঙ্গে মিলিত হতে কেমন লাগবে।

অরউসি, মানে বিয়ের অনুষ্ঠানে ৩৫,০০০ ডলার খরচ করল বাবা–ওর সারা জীবনের সঞ্চয়ের বলতে গেলে প্রায় পুরোটাই। ফ্রিমন্টে একটা বিশাল আফগান ব্যাঙ্কোয়েট হল ভাড়া করল ও–মালিক ভদ্রলোকে কাবুলে থাকতে বাবাকে চিনত বলে ভালো ডিসকাউন্ট দিল। আমাদের মানানসই বিয়ের ব্যান্ড *চিলার* খরচ দিল বাবা । আমার পছন্দের হীরের আংটির দামও মেটাল ও। *নিকা*–কলমা পড়ার অনুষ্ঠান–উপলক্ষ্যে আমাকে টক্সিডো আর ঐতিহ্যবাহী সবুজ স্যুট কিনে দিল।

বিয়ের রাত পর্যন্ত চলা অসংখ্য জোরাল প্রস্তুতির ভেতর–বেশীর ভাগই খানুম তাহেরি আর তার বন্ধুরা সেরেছে–মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা ঘটনার কথা মনে আছে আমার।

আমাদের *নিকার* কথা মনে আছে। একটা টেবিলে পাশাপাশি বসে ছিলাম আমরা। সুরাইয়ার পরনে ছিল সবুজ পোশাক–ইসলামের রঙ। তবে সেটা বসন্ত আর নতুন আশীর্বাদেরও রঙ। আমার পরনে স্যুট, সুরাইয়া (টেবিলের একমাত্র মহিলা) পরেছে লম্বা হাতার একটা *হিজাব*অলা পোশাক। বাবা, জেনারেল তাহেরি (এসময় পরনে টক্সিডো), আর সুরাইয়ার কয়েকজন চাচাও ছিল টেবিলে। হঠাৎ সমীহের সঙ্গে মাটির দিকে তাকাতে শুরু করেছিলাম আমি আর

BanglaBook.org

সুরাইয়া। কেবল আড়চোখে তাকাচ্ছি পরস্পরের দিকে। মোল্লাহ সাক্ষীদের প্রশ্ন করল, তারপর কোরান থেকে *আয়াত* পাঠ করল। আমরা শপথ বাক্য পড়লাম। সার্টিফিকেটে সই দিলাম। ভার্জিনিয়া থেকে আসা সুরাইয়ার এক মামা খানুম তাহেরির ভাই শরীফ জান উঠে দাঁড়িয়ে গলা খাকারি দিল। সুরাইয়া আমাকে বলেছিল বিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ইউএস-এ আছে সে। আইএনএস-এ কাজ করে। তার স্ত্রী আমেরিকান। একজন কবি সে। পাখির মতো চেহারার ছোটখাট লোক, মাথায় এলোমেলো চুল। সুরাইয়াকে উৎসর্গ করা হোটেলের স্টেশনারি কাগজে লেখা একটা কবিতা আবৃত্তি করল সে। "*বাহ, বাহ,* শরীফ জান!" তার আবৃত্তি শেষ হলে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

টক্সিডো গায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা মনে আছে আমার। শাদা পোশাক পরা ঘোমটা-টানা একটা পরী যেন সুরাইয়া। আমাদের হাত পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। আমার পাশে টলমল পায়ে এগোচ্ছে বাবা, জেনারেল আর স্ত্রী তাদের মেয়ের পাশে। মামা, চাচা, খালা, চাচী আর চাচাত-মামাত-ফুপাত ভাইবোনের একটা মিছিল হল ঘর দিয়ে এগোনোর সময় আমাদের অনুসরণ করে চলল। উল্লাসে মত্ত অতিথিদের সাগর দুভাগ করে এগোচ্ছি আমরা। ঝলসানো ক্যামেরার দিকে চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছি। শরীফ জানের ছেলে আমরা ধীরে পায়ে আগে বাড়ার সময় আমাদের মাথার উপর একটা কোরান শরীফ ধরে রাখল। স্পীকার থেকে গর্জন ছাড়ছে বিয়ের গান, *আহেস্তে বারো*। বাবা আর আমি কাবুল ছেড়ে আসার রাতে মাহিপুর চেকপয়েন্টে রাশিয়ান সেই সৈন্যটা এই একই গান গেয়েছিল:

সকালকে একটা চাবি বানিয়ে কোনও কূপে ফেলে দাও,
ধীরে যাও, হে সুন্দর চাঁদ আমার
সকালের সূর্যকে ভোরে পুবে ওঠার কথা ভুলিয়ে দাও,
ধীরে যাও, হে সুন্দর চাঁদ আমার, ধীরে যাও।

মঞ্চের উপর সিংহসনের মতো করে বসানো চেয়ারে বসে থাকার কথা মনে আছে। আমার হাতে সুরাইয়ার হাত। তিনশো জনের মতো লোক তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। *আয়না মাশাফ* করলাম আমরা: একটা আয়না হাতে দিয়ে আমাদের মাথার উপর একটা পর্দা দিয়ে ঢেকে দিল ওরা, যাতে আমরা একা একে অন্যের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাতে পারি। ঘোমটার মুহূর্তের একান্তে পরিবেশে সুরাইয়ার হাসিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে আমি

BanglaBoi.org

ফিসফিস করে প্রথমবারের মতো ওকে আমার ভালোবাসার কথা বললাম। মেহেদীর মতো লাল একটা ভাব খেলে গেল ওর চেহারায়।

চোপান কাবাব, শোলেহ গোশতি আর বুনো কমলার ভাত ভর্তি রঙিন প্লেটের ছবি ফুটিয়ে তুললাম মনের পর্দায়। বাবাকে দেখলাম আমাদের দুজনের পাশে বসে মৃদু হাসছে। মনে আছে ঘর্মাক্ত লোকজন একটা বৃত্তের ভেতর ঐতিহ্যবাহী *আত্তান* নাচ নাচছিল। তবলার বেড়ে ওঠা তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ক্রমে দ্রুত থেকে দ্রুত লাফাচ্ছিল ওরা। এক সময় কয়েকজন বাদে বেশীর ভাগই বৃত্ত থেকে বের হয়ে এল। মনে আছে রহিম খানকে প্রত্যাশা করছিলাম আমি তখন।

মনে আছে হাসানও বিয়ে করেছে কিনা ভেবেছিলাম। বিয়ে করে থাকলে ঘোমটার নিচে কার চেহারা দেখেছিল ও? কার মেহেদী রাঙানো হাত ধরেছিল ওর হাত?

আনুমানিক রাত ২:০০ টার দিকে ব্যাঙ্কোয়েট হল থেকে বাবার অ্যাপার্টমেন্টে চলে এল পার্টি। আরও একবার চায়ের নহর বইল। পড়শীরা পুলিসে খবর দেওয়ার আগ পর্যন্ত চলল তুমুল গান-বাজনা। সেরাতের শেষের দিকে, তখন সূর্য উঠতে আর মাত্র ঘন্টাখানেক বাকি, অবশেষে মেহমানরা বিদায় নিয়েছে, সুরাইয়া আর আমি প্রথমবারের মতো একসঙ্গে শুলাম। সারা জীবন আমি ছিলাম পুরুষ বেষ্টিত। সে রাতে একজন নারীর কোমলতা আবিষ্কার করলাম।

সুরাইয়াই বাবা আর আমার কছে চলে আসার প্রস্তাব দিল।

"আমি তো ভেবেছিলাম নিজের একটা বাড়ি চাইবে তুমি," বললাম।

"কাকা জানকে এমন অসুস্থ অবস্থায় রেখে?" জবাব দিল ও। ওর চোখ আমাকে বলে দিল এটা বিবাহিত জীবন শুরু করার কোনও সহজ রাস্তা নয়। ওকে চুমু খেলাম আমি। "ধন্যবাদ।"

বাবার যত্নআত্তির ভার নিজের হাতে তুলে নিল সুরাইয়া। সকালে ওকে টোস্ট আর চা করে দেয় ও। বিছানায় উঠতে নামতে সাহায্য করে। ব্যথা দূর কারী ওষুধ খাইয়ে দেয়, কাপড়-চোপড় ধোয়। রোজ বিকেলে খবর কাগজ থেকে আন্তর্জাতিক সংবাদ পড়ে শোনায়। বাবার প্রিয় খাবার আলুর *শুরুয়া* রান্না করে খাওয়ায়। যদিও এখন আর কয়েক চামচের বেশী খেতে পারে না ও। রোজ একটু হাঁটানোর জন্যে ব্লকের আশপাশে নিয়ে যায়। বাবা যখন একেবারে

BanglaBook.org

বিছানায় পড়ে গেল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওকে পাশ ফিরিয়ে দিতে লাগল ও, যাতে ওর বেড-সোর না হতে পারে।

একদিন বাবার মরফিন পিল নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছি। দরজা আটকানোর মুহূর্তে পলকের জন্যে দেখলাম কী যেন বাবার কম্বলের নিচে লুকাচ্ছে সুরাইয়া। "অ্যাই, দেখে ফেলেছি! তোমরা কী করছ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কিছু না," হাসি মুখে বলল সুরাইয়া।

"মিথ্যুক।" বাবার কম্বল উঁচু করে ধরলাম আমি। "এটা কী?" বললাম। যদিও চামড়া মোড়ানো নোটবইটা তোলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেছি। সোনালি সুতোয় সেলাই করা সীমানা বরাবর হাত বোলালাম। রহিম খান এটা আমাকে দেওয়ার সময় আতশবাজি শুরু হওয়ার কথা মনে পড়ল। আমার তেরতম জন্মদিন ছিল সেটা। লাল, সবুজ আর হলদে ফুলের মতো বিস্ফোরিত হচ্ছিল বাজিগুলো।

"তুমি এমন লিখতে পারো, বিশ্বাসই করতে পারছি না," বলল সুরাইয়া।

কোনওমতে বালিশ থেকে মাথা তুলে বাবা বলল, "ওকে আমিই দিয়েছি ওটা। আশা করি তুমি কিছু মনে করোনি।"

নোটবুকটা ফের সুরাইয়াকে ফিরিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম রুম ছেড়ে। কাঁদলে বাবা অপছন্দ করে।

বিয়ের মাসখানেক পরে তাহেরিরা দুজন, শরীফ, তার স্ত্রী সুযি আর সুরাইয়ার কয়েকজন খালা রাতের খাবারের জন্যে আমাদের অ্যাপার্টমেন্টে এল। *সব্জি পোলাও* রান্না করেছিল সুরাইয়া–পুদিনা পাতা আর ভেড়ার মাংস দিয়ে শাদা ভাত। ডিনারের পরে আমাদেরকে চা পরিবেশন করা হল। চারজনের একেকটা দলে ভাগ হয়ে কার্ড খেলতে বসলাম অমরা। কফি টেবিলে শরীফ আর সুযির সঙ্গে খেললাম আমি আর সুরাইয়া। পাশেই কম্বলের নিচে শুয়ে ছিল বাবা। আমি শরীফের সঙ্গে ঠাট্টা করছি লক্ষ করল ও। আমি আর সুরাইয়া একে অন্যের আঙুল জড়িয়ে ধরছি। ওর মনে হাসিটুকু টের পাচ্ছিলাম, কাবুলের আকাশের মতো বিশাল, রাতের বেলায় যখন পপলার গাছে আলোড়ন তুলত আর ঝিঁঝি পোকার দল বাগানে বাজার বসাত।

মাঝরাতের ঠিক আগে বাবা ওকে বিছানায় শুইয়ে দিতে বলল। আমি আর সুরাইয়া আমাদের পিঠের উপর ওর হাত রেখে ওর পিঠ জড়িয়ে ধরলাম। আমাদের সামনে ঝুঁকতে বলে দুজনকে একটা করে চুমু খেল ও।

"আমি তোমার মরফিন আর দুধের গ্লাস নিয়ে আসছি, কাকা জান," বলল

BanglaBook.org

সুরাইয়া।

"আজ রাতে লাগবে না," বলল বাবা, "আজ কোনও ব্যথা নেই।'

"ঠিকাছে," বলল ও। ওর গায়ে কম্বল জড়িয়ে দিল ও। দরজা আটকে দিলাম আমরা।

বাবা আর জেগে ওঠেনি।

হেওয়ার্ডের মসজিদের পার্কিং স্পটগুলো ভরে ফেলল ওরা। দালানের পেছনে ক্ষয়ে আসা ঘাসের উপর কোনওমতে বানানো সারিতে গাড়ি আর সাবগুলো পার্ক করা হল। একটা জায়গার খোঁজে লোকজনকে দুই-তিন ব্লক পর্যন্ত ঢুঁড়ে বেড়াতে হয়েছিল।

মসজিদের পরুষদের অংশটা একটা বিরাট চৌকো রুম, সমান্তরালভাবে বিছানো আফগান গালিচা আর পাতলা ম্যাট্রেসে ঢাকা। দরজা পথে জুতো খুলে রেখে লাইন ধরে ভেতরে ঢুকল পুরুষরা। ম্যাট্রেসের উপর পায়ের উপর পা তুলে বসল। মাইক্রোফোনে কোরান শরীফ থেকে *সুরা* পাঠ করল এক মোল্লাহ। মৃতের পরিবারের জন্যে রীতিমাফিক নির্ধরিত জায়গা, দরজার পাশে বসেছিলাম আমি। আমার পাশে বসেছিল জেনারেল তাহেরি।

খোলা দরজা দিয়ে সারি সারি গাড়ি ঢুকতে দেখতে পাচ্ছিলাম। উইন্ডশিল্ডে রোদের আলো ঠিকরে যাচ্ছে। কালো পোশাক পরা পুরুষ আর কালো শাড়ি পরা মহিলা যাত্রীদের নামিয়ে রেখে যাচ্ছে ওগুলো। রীতিমাফিক *হিযাবে* ঢাকা মহিলাদের মাথা।

সারা ঘরে যখন কোরানের শব্দগুলো গমগম করছে আমি তখন বেলুচিস্তানে একটা কালো ভালুকের সঙ্গে বাবার মল্লযুদ্ধের সেই গল্পের কথা ভাবছিলাম। সারা জীবনই ভালুকের সঙ্গে লড়াই করে কাটিয়েছে বাবা। তরুণী স্ত্রীকে হারিয়েছে। নিজের হাতে একটা ছেলেকে মানুষ করেছে। প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি, *ওয়াতান* ছেড়ে এসেছে। শেষ জীবনে দারিদ্র, অমর্যাদা। এমন একটা ভালুক এসে হাজির হয়েছে শেষে যার মোকাবিলা করতে পারেনি। কিন্তু তারপরেও নিজের মতো করেই হেরেছে ও।

প্রত্যেকবার দোয়ার পালা শেষ হলে একদল শোকপালনকারী উঠে বের হয়ে যাবার সময় আমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। আমি ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কর্তব্য সারছি। ওদের অনেককেই আমি তেমন একটা চিনি না। ভদ্রভাবে হেসে কষ্ট করে এসেছে বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওদের। বাবা সম্পর্কে যার যা বলার ছিল শুনেছি।

BanglaBook.org

"...তায়মানিতে আমাকে বাড়ি বানাতে সাহায্য করেছিল..."

"...দোয়া করছি..."

"কারও কাছে যাবার জো ছিল না, তখন ও আমাকে টাকা ধার দিয়েছিল..."

"...আমাকে একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছিল..."

"...আমার ভাইয়ের মতো ছিল..."

ওদের কথা শুনতে শুনতে আমি বুঝতে পারলাম আমি আসলে কী ছিলাম, কে ছিলাম। বাবাই ছিল আমার সঙ্গী। জীবীত মানুষের উপর কতখানি ছাপ রেখে গিয়েছিল ও। সারা জীবন আমি ছিলাম "বাবার ছেলে"। এখন ও চলে গেছে। আর আমাকে পথ দেখাতে পারবে না বাবা। নিজেকেই নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে।

এই ভাবনাটাই আমাকে আতঙ্কিত করে তুলল।

এর আগে কবরস্থানের ছোট মুসলিম অংশে বাবাকে গর্তে ছুড়ে ফেলতে দেখেছি ওদের। মোল্লাহ আর অন্য এক লোক কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কোরানের কোন *আয়াত* পড়া উচিত সেটা নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছিল। জেনারেল তাহেরি বাধা না দিলে ব্যাপারটা একটা বিশ্রী চেহারা নিতে পারত। অন্য লোকটার দিকে কুৎসিত চোখে তাকাতে তাকাতে মোল্লাই *আয়াত* বাছাই করল, তারপর পড়ল সেটা। কবরে প্রথম কোদালভর্তি মাটি ফেলতে দেখেছি। তারপর চলে এসেছি আমি। কবরস্থানের অন্য পাশে এসেছি হাঁটতে হাঁটতে। একটা লাল ম্যাপল গাছের নিচে বসেছিলাম।

এখন শোককারীদের শেষ দলটা শ্রদ্ধা জানানো শেষে মসজিদ ছেড়ে চলে গেছে। মাইক্রোফোনের প্লাগ খোলা আর কোরান একটা সবুজ কাপড়ে মোড়ানোর কাজে ব্যস্ত মোল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। শেষ বিকেলের আলোয় বাইরে পা রাখলাম আমি আর জেনারেল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এখানে-ওখানে জটলা বেঁধে সিগারেট খেতে থাকা লোকদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওদের কথাবার্তার টুকরো টুকরো অংশ কানে এল। পরের সপ্তাহে ইউনিয়ন সিটিতে একটা সকার গেম হওয়ার কথা। সান্তা ক্লারায় একটা নতুন আফগান রেস্তঁরা খুলতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে জীবন চলতে শুরু করেছে। বাবাকে পেছনে ফেলে।

"কেমন আছো, *বাচ্চে?*" বলল জেনারেল তাহেরি।

দাঁতে দাঁত পিষলাম আমি। সারাদিন হুমকি দিয়ে চলা কান্নাটাকে ঠেকালাম। "সুরাইয়াকে খুঁজতে যাচ্ছি আমি," বললাম।

BanglaBook.org

"ঠিকাছে।"

মসজিদের মহিলাদের অংশের দিকে এগিয়ে গেলাম। মা আর কয়েকজন মহিলার সঙ্গে সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল সুরাইয়া। বিয়ের দিন এদের দেখেছিলাম বলে আবছাভাবে মনে পড়ল। সুরাইয়াকে ইশারা করলাম। মাকে কি যেন বলে আমার কাছে চলে এল ও।

"হাঁটা যাবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"নিশ্চয়ই।" আমার হাত ধরল ও।

নিচু ঝোপের মাঝখান দিয়ে যাওয়া একটা আঁকাবাঁকা নুড়ি বিছানো পথ ধরে আগে বাড়লাম আমরা। একটা বেঞ্চের উপর বসলাম। লক্ষ করলাম কয়েক সারি দূরে একজোড়া বয়স্ক দম্পতি হেডস্টোনের পাশে একতোড়া ফুল নামিয়ে রাখছে। "সুরাইয়া?"

"কী?"

"ওর কথা আমার খুব মনে পড়বে।"

আমার কোলে হাত রাখল ও। বাবার *চিলা* ওর অনামিকায় ঝিলিক মারছে। ওর পেছনে বাবার শোককারীদের মিশন ব্যুলেভার্দ দিয়ে যেতে দেখছি। আমাদেরও একটু পরে চলে যেতে হবে। একেবারে একা হয়ে যাবে বাবা।

আমাকে কাছে টেনে নিল সুরাইয়া। অবশেষে এল কান্না।

আমাদের কোনও এনগেজমেন্ট পিরিয়ড ছিল না বলে বিয়ের পরেই ওদের পরিবার সম্পর্কে যা কিছু জানতে পেরেছি আমি। যেমন, আমি জেনেছি, মাসে একবার জেনারেল অসহনীয় মাইগ্রেনের ব্যথায় আক্রান্ত হয়, সেটা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চলে। মাথাব্যথা শুরু হলে নিজের রুমে গিয়ে কাপড়চোপড় খুলে বাতি নিভিয়ে দরজায় তালা আটকে দেয় জেনারেল। ব্যথা না কমা পর্যন্ত আর বের হয় না। কারও ভেতরে যাবার অনুমতি নেই। কেউ দরজায় নক করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত বের হয়ে আসে সে, আরও একবার ধূসর স্যুট গায়ে দিয়ে; গায়ে ঘুম আর বিছানার গন্ধ লেগে থাকে। সুরাইয়ার কাছে শুনেছি জেনারেল আর খানুম তাহেরিকে ওর যতদূর মনে পড়ে আলাদা রুমেই শুতে দেখে আসছে ও। জেনেছি ছেলেমানুষ হয়ে উঠতে পারে সে। যেমন, স্ত্রী তার সামনে *কুরমা* রাখার পর সে হয়ত এক লোকমা মুখে তুলেই ঠেলে সরিয়ে দেবে। দীর্ঘশ্বাস ফেলবে। খানুম তাহেরি হয়ত বলবে "তোমাকে অন্য কিছু বানিয়ে দিই?" কিন্তু তখন সে ওকে অগ্রাহ্য করে গজগজ করতে করতে স্রেফ

BanglaBook.org

রুটি আর পেঁয়াজ খেয়ে উঠে পড়বে। এমন অবস্থায় সুরাইয়া ক্ষেপে ওঠে, ওর মা কাঁদতে শুরু করে। সুরাইয়া বলেছে সে অ্যান্টিডিপ্রেস্যান্ট খায়। শুনেছি পরিবারকে ওয়েলফেয়ারের টাকায় ভরণ পোষণ করে সে, কখনওই ইউএস-এ কোনও চাকরি নেয়নি। তার স্বভাবের সঙ্গে বেমানান কোনও কাজে যোগ দেওয়ার চেয়ে বরং সরকারের কাছ থেকে পাওয়া নগদ টাকাই বেশী পছন্দ করেছে। মার্কেটকে স্রেফ হবি হিসাবে দেখে সে। স্বদেশী আফগানদের সঙ্গে যোগাযোগের একটা রাস্তা মাত্র। জেনারেল বিশ্বাস করে আগে হোক পরে হোক, আফগানিস্তান মুক্ত হবেই। রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে। তাকে আবার চাকরিতে তলব করা হবে। তো রোজ ধূসর স্যুট গায়ে চাপায় সে, পকেট ঘড়িটা পরে, তারপর অপেক্ষা করতে থাকে।

শুনেছি খানুম তাহেরি-যাকে এখন আমি জামিলা খালা বলে ডাকি—এককালে কাবুলে তার মন মাতানো সুরেলা গলার জন্যে বিখ্যাত ছিল। যদিও কখনও পেশাদারীভাবে গান গায়নি, কিন্তু তার প্রতিভা ছিল-শুনেছি লোকগীতি, *গযল*, এমনকি *রাগ* সঙ্গীত গাইতে পারত সে, যেটা সাধারণত পুরুষের এখতিয়ারের বিষয়। কিন্তু জেনারেল গান শুনতে ভালোবাসলেও-সত্যি বলতে কি তার সংগ্রহে আফগান আর হিন্দি গায়কদের বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্লাসিকাল গান আছে-তার বিশ্বাস, বাইরে গাওয়ার ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত কম প্রতিভাবানদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। সে যে প্রকাশ্যে গান গায় না তার একটা কারণ হচ্ছে বিয়ের সময় এটা জেনারেলের এটা একটা শর্ত ছিল। সুরাইয়া আমাকে বলেছে আমাদের বিয়েতে মা গান গাইতে চেয়েছিল, মাত্র একটা গান, কিন্তু জেনারেল এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়েছিল যে সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেছে। সপ্তাহে একবার লোট্টে খেলে জামিলা খালা, রোজ রাতে জনি কারসন দেখে। বাগানে গোলাপ, জেরানিয়াম, আলু ক্ষেত আর অর্কিডদের পরিচর্যা করে দিন কাটায়।

আমি সুরাইয়াকে বিয়ে করার পর ফুল আর জনি কারসন পেছনের সারিতে পড়ে গিয়েছিল। আমি ছিলাম খালা জামিলার জীবনে নতুন এক আনন্দের বিষয়। জেনারেলের সংযত চাপা আচরণের বিপরীতে-আমি তাকে অবিরাম "জেনারেল সাহিব" ডাকা চালিয়ে গেলেও আমাকে সে শুধরে পর্যন্ত দেয়নি-জামিলা খালা আমাকে কতখানি ভালোবাসে সেটা মোটেও চেপে রাখেনি। তার একটা কারণ হচ্ছে আমি তার আকর্ষণীয় কষ্টের কথা শুনে যাই। জেনালেল অনেক আগেই এসবে কান দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। সুরাইয়া আমাকে বলেছে, মায়ের স্ট্রোকের পর থেকেই ওর বুকের প্রত্যেকটা অস্থিরতাই

BanglaBook.org

হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও হাড়ের সন্ধিতে ব্যথা মানেই আর্থ্রাইরিটিসের আক্রমণ। চোখের প্রত্যেকটা কাঁপুনিই আরেকটা স্ট্রোক। জামিলা খালা প্রথমবার আমাকে ঘাড়ের উপর একটা পিণ্ডের কথা বলেছিল। "কাল স্কুল বাদ দিয়ে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব," বলেছিলাম আমি। শুনে জেনারেল হেসে বলেছিল, "তাহলে সারাজীবনের জন্যে বইপত্রকে বিদায় জানাতে হবে তোমাকে, *বাচ্চে*। তোমার খালার মেডিকেল চার্ট অনেকটা রুমির কবিতার মতো। ঢাউস ঢাউস খণ্ডে বের হয়ে আসে।"

কিন্তু স্রেফ রোগের বর্ণনার একজন মনোযোগী শ্রোতাই পায়নি সে। আমার জোর বিশ্বাস, আমি যদি একটা রাইফেল নিয়ে তাণ্ডবলীলায় মেতে উঠতাম, তাহলেও ওর অটল ভালোবাসার সুবিধা পেয়ে যেতাম। কারণ আমি ওর মনকে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যথা থেকে মুক্তি দিয়েছিলাম। আমি ওকে আফগান মায়েদের সবচেয়ে বড় শঙ্কা থেকে মুক্ত করেছিলাম: কোনও সম্মানীয় *খাস্তোগের* হয়ত তার মেয়ের পাণি-প্রার্থী হবে না। ওর মেয়ে একাই জীবন কাটাবে। স্বামীহীন, সন্তানহীন। প্রত্যেক নারীর স্বামী প্রয়োজন। সে যদি তার প্রাণের ভেতরের গানকে স্তব্ধ করে দেয়, তবুও।

সুরাইয়ার কাছে আমি ভার্জিনিয়ায় কী ঘটেছিল তাও শুনেছি।

একটা বিয়ের দাওয়াতে গিয়েছিলাম আমরা। সুরাইয়ার মামা শরীফ—আইএনএস-এ কাজ করে যে-নিওয়ার্কের এক আফগান মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিচ্ছিল। ছয় মাস আগে আমি আর সুরাইয়া যেখানে *অরাউসি* করেছিলাম, সেই একই হলে হচ্ছিল বিয়েটা। মেহমানদের ভীড়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। কনেকে বরের পরিবারের দেওয়া আংটি নিতে দেখছি। এমন সময় দুই মাঝবয়সী মহিলাকে কথা বলতে শুনলাম। আমাদের দিকে পেছন ফিরে ছিল ওরা।

"খুবই সুন্দর মেয়েটা," বলল ওদের একজন। "ওর চেহারার দিকে একবার তাকাও। এক *মাগবুল*, ঠিক চাঁদের মতো।"

"হ্যাঁ," বলল অন্যজন। "সতীও। গুণী। কোনও বয়ফ্রেন্ড নেই।"

"জানি। আমি বলছি ছেলেটা ওর ফুপাত বোনকে বিয়ে না করে ভালোই করেছে।"

বাড়ি ফেরার পথে ভেঙে পড়ল সুরাইয়া। কার্ব-এ গাড়ি থামালাম আমি। ফ্রিমন্ট ব্যুলেভার্দের একটা স্ট্রিট লাইটের নিচে থামালাম ওটা।

"কোনও অসুবিধে নেই," বললাম। "কে পরোয়া করে?"

"এটা খুবই অন্যায়," ধমকে উঠল ও।

BanglaBook.org

"স্রেফ ভুলে যাও।"

"ওদের ছেলেরা নাইটক্লাবে যায় মাংস আর মেয়েদের খোঁজে। বিয়ে ছাড়াই বাচ্চাকাচ্চা হয় ওদের। গার্ল ফ্রেন্ডদের প্রেগনেন্ট করে, কিন্তু কেউ কোনও টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করে না। উফ, ওরা স্রেফ আনন্দে মশগুল পুরুষ! আমি একটা ভুল করেছি, ব্যস, সবাই *নাঙ* আর *নামুসের* কথা বলতে শুরু করেছে। বাকি জীবন এই জন্যে আমাকে মুখ নিচু করে থাকতে হবে।"

ওর গালের অশ্রু মুছে দিলাম আমি। ঠিক জন্মদাগের উপরে। আমার বুড়ো আঙুলের গোড়া দিয়ে।

"তোমাকে বলিনি," চোখ মুছে বলল সুরাইয়া। "কিন্তু বাবা সেরাতে বন্দুক হাতে হাজির হয়েছিল। ওকে ও বলেছে...বন্দুকের চেম্বারে দুটো বুলেট আছে...আমি বাড়ি না ফিরলে একটা গুলি সে খাবে আরেকটা নিজের জন্যে। আমি আর্তনাদ করছিলাম। বাবাকে যত রকম গালি আছে কোনওটাই বাদ দিচ্ছিলাম না। বলেছি আমাকে সারাজীবন তালা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না ও। আমি ওর মৃত্যু চাই।" নতুন করে আবার চোখের পানি ঝরতে শুরু করল। "আসলে ওকে বলেছিলাম ও মরে গেলেই ভালো ছিল।

"বাবা যখন আমাকে বাড়ি নিয়ে এল, আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরেছিল মা। কাঁদছিল ও। অনেক কথা বলছিল ও, কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কারণ হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছিল সে। তো বাবা আমাকে ওপরে নিয়ে ড্রেসার মিররের সামনে বসাল। আমার হাতে একটা কাঁচি তুলে দিয়ে অটল গলায় চুল কেটে ফেলতে বলল। আমাকে কাজটা করতে দেখল ও।

"অনেকগুলো দিন বাড়ির বাইরে পা রাখিনি আমি। যখন বাইরে এলাম, নানা রকম ফিসফিসানি কানে এল আমার । কিংবা কল্পনা করলাম। এটা চার বছর আগের কথা। তিন হাজার মাইল দূরে। এখনও তা শুনতে পাচ্ছি।"

"ওদের গুলি মারো," বললাম।

আধা হাসি, আধা কান্নার মতো একটা শব্দ করল ও। "*খাস্তেগোরির* রাতে ফোনে তোমাকে একথা বলার সময় তুমি যে মত পাল্টাবে এব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম আমি।"

"তার কোনও সম্ভাবনাই নেই, সুরাইয়া।"

হেসে আমার হাত ধরল ও। "তোমাকে কাছে পেয়ে আমি যারপরনাই ভাগ্যবান। অন্যসব আফগানের চেয়ে তুমি আলাদা।"

"এ নিয়ে আর কখনও কথা বলব না আমরা, কেমন?"

"ঠিকাছে।"

BanglaBook.org

ওর গালে চুমু খেলাম। কার্ব থেকে সরে এলাম গাড়ি নিয়ে। চালানোর সময় কোন দিক থেকে আমি আলাদা বোঝার চেষ্টা করলাম। হয়ত আমি পুরুষের মাঝে বড় হয়েছি বলে। আমি মেয়েদের সাহচর্যে বেড়ে উঠিনি। আফগান সমাজ যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে ওদের দেখে তার মুখোমুখি হইনি। হয়ত বাবা ভিন্ন ধরনের আফগান পুরুষ ছিল বলে। উদারপন্থী মানুষ, নিজের নিয়ম মেনে চলত। নিজের পছন্দ মতো সামাজিক বিধিবিধানকে মেনে নিত বা অগ্রাহ্য করত। সে ছিল একজন মেভেরিক।

তবে সুরাইয়ার অতীত নিয়ে পরোয়া না করার একটা বড় কারণ হচ্ছে আমার নিজেরও একটা অতীত রয়েছে। দুঃখ কী জিনিস আমি জানি।

বাবার মৃত্যুর অল্প পরেই ফ্রিমন্টে জেনারেল এবং জামিলা খালার বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরের একটা এক রুমের অ্যাপার্টমেন্ট উঠে এলাম আমি আর সুরাইয়া। বাড়ি সাজানোর জিনিস হিসাবে সুরাইয়ার বাবা-মা আমাদের একটা বাদামী লেদার কাউচ আর এক সেট মিকাসা ডিশ কিনে দিল। আমাকে একটা বাড়তি উপহার দিল জেনারেল। একটা আনকোরা নতুন আইবিএম টাইপরাইটার। বাক্সের ভেতর ফারসিতে লেখা একটা চিরকুট রেখে দিয়েছিল সে:

আমির জান,
আশা করি এই বোতামগুলোয় অনেক কাহিনী আবিষ্কার করবে তুমি।
জেনারেল ইকবাল তাহেরি।

বাবার ফক্স-ওয়্যাগনটা বিক্রি করে দিয়েছি আমি। আজ পর্যন্ত আর ফ্লি মার্কেটে পা রাখিনি। প্রত্যেক শুক্রবার ওর কবরে যাই আমি। অনেক সময় মাথার কাছে ফ্রিসিয়া ফুলের টাটকা গোছা দেখতে পাই। বুঝতে পারি সুরাইয়াও এসেছিল।

বিবাহিত জীবনের রুটিন–আর টুকটাক বিচ্যুতিতে–অভ্যস্ত হয়ে গেলাম আমি আর সুরাইয়া। আমরা টুথব্রাশ আর মোজা ভাগাভাগি করি, সকালে খবর কাগজ চালান করি। খাটের ডানপাশে শোয় ও, আমি বাম দিকটা পছন্দ করি। নরম বালিশ ওর পছন্দ, আমার পছন্দ ঠাসা বালিশ। শুকনো সিরিয়াল খায় ও; আমি আমি দুধ মিশিয়ে খাই।

সেই গ্রীষ্মে স্যান হোসে স্টেটে ভর্তি হবার অনুমতি পেলাম আমি। ইংরেজিতে মেজর করার ঘোষণা দিলাম। সানি ভিলে একটা ফার্নিচারের দোকানের ওয়্যার হাউসে সিকিউরিটির পালা ক্রমিক চাকরি নিলাম।

BanglaBook.org

মারাত্মকরকম ক্লান্তিকর ছিল কাজটা। তবে সঞ্চয়ের সুযোগ ছিল বেশ ভালো। সন্ধ্যা ৬:০০ টায় সাবাই বের হয়ে যাবার পর সিলিং অবধি স্তূপ বরে রাখা প্লাস্টিকে ঢাকা সোফাগুলোর মাঝের আইলে দীর্ঘায়িত হতে শুরু করত ছায়ারা, আমি আমার বইপত্র বের করে পড়াশোনা করতাম। ওই ফার্নিচার ওয়্যার হাউসের পাইন-সোল-সুবাসিত অফিসেই আমি আমার প্রথম উপন্যাসের কাজ শুরু করেছিলাম।

পরের বছর সুরাইয়া আমার সঙ্গে স্যান হোসে স্টেটে মিলিত হল। বাবার রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে টিচিং ট্র্যাকে নাম লেখাল ও।

"জানি না, কেন এভাবে তোমার মেধা অপচয় করছ," ডিনারের টেবিলে একদিন বলল জনারেল। "তুমি কি জান, আমির জান, হাই স্কুলে 'এ' ছাড়া আর কিছুই পেত না ও?" ওর দিকে তাকাল ও। "তোমার মতো একজন মেধাবী ছাত্র ল-ইয়ার, পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হতে পারে। আফগানিস্তান যখন মুক্ত হবে, *ইনশাল্লাহ*, তুমি নতুন সংবিধান রচনায় সাহায্য করতে পারবে। তোমার পরিবারের খ্যাতির সুবাদে ওরা তোমাকে মন্ত্রীত্বও দিয়ে দিতে পারে।"

সুরাইয়া শক্ত মুখে নিজেকে বিরত রাখছে, বুঝতে পারছিলাম। "আমি কচি খুকি নই , বাবা। আমি বিবাহিতা মহিলা। তাছাড়া, ওদের টিচারও লাগবে।"

"যে কেউ পড়াতে পারে।"

"আর বরফ আছে, মা?" বলল সুরাইয়া।

জেনারেল হেওয়ার্ডে কোনও এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা বলে বিদায় নেওয়ার পর সুরাইয়াকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছে জামিলা খালা। "ও তোমার ভালোই চায়," বলল সে। "তোমাকে সফল হিসাবে দেখতে চায় কেবল।"

"যাতে বন্ধুদের কাছে অ্যাটর্নি মেয়ে নিয়ে গর্ব করতে পারে," বলল সুরাইয়া।

"কী যে বাজে কথা বলো না!"

"সফল," হিসহিস করে বলল সুরাইয়া। "আমি অন্তত ওর মতো নই। অন্য লোকজন যখন *শোরোভি*দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, তখন চুপচাপ বসে আছে সে। ধুলো থিতিয়ে আসার অপেক্ষা করছে, যাতে নিজের বিলাসী সরকারী পদটা আবার দখল করতে পারে। টিচিংয়ে বেশী টাকা না থাকতে পারে, কিন্তু আমি এটাই হতে চাই! একেই আমি ভালোবাসি। এটা ওয়েলফেয়ারের টাকা সংগ্রহ করার চেয়ে ঢের ভালো।"

জিভে কামড় দিল জামিলা খালা। "তোমার এধরনের কাথাবার্তা

BanglaBook.org

কোনওদিন ওর কানে গেলে কথা বলাই বন্ধ করে দেবে সে।"

"চিন্তা করো না," ধমকের সুরে বলল সুরাইয়া, প্লেটের উপর ফেলল ওর ন্যাপকিনটা। "আমি ওর মূল্যবান ইগোতে ঘা দেব না।"

১৯৮৮ সালের গ্রীষ্মে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত প্রত্যাহারের আনুমানিক ছয় মাস আগে শেষ করলাম আমার প্রথম উপন্যাসটা। কাবুলের পটভূমিতে বাবা-আর-ছেলের কাহিনী। জেনারেলের দেওয়া টাইপরাইটারেই মোটামুটি লেখা। গোটা বার এজেন্সির কাছে খোঁজ করে চিঠি পাঠালাম। তারপর অগাস্টের একদিন মেইল বক্স খুলে নিউ ইয়র্কের এক এজেন্সির কাছে থেকে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠানোর অনুরোধ করে পাঠানো চিঠি দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। পরের দিনই পাঠিয়ে দিলাম ওটা। সযত্নে মোড়ানো পাণ্ডুলিপিটার উপর চুমু খেল সুরাইয়া। জামিলা খালা ওটা কোরানের নিচ দিয়ে একবার নিয়ে যেতে জোর করল। আমার জন্যে নয্‌র করার কথা বলল: একটা ভেড়া জবাই করে গরীবদের মাঝে মাংস বিলিয়ে দেওয়ার মানত, যদি আমার বইটা মনোনীত হয়।

"প্লিজ্‌, দয়া করে নয্‌র না," ওর মুখে চুমু খেয়ে বললাম আমি। "খালি *যাকাত* দাও। অভাবী কাউকে বিলিয়ে দাও টাকাটা। ভেড়া-টেড়া জবাই করার দরকার নেই।"

ছয় সপ্তাহ পর মার্টিন ফোন করে জানাল প্রকাশিত উপন্যাসের লেখক হতে যাচ্ছি আমি। সুরাইয়াকে কথাটা জানাতেই চেঁচিয়ে উঠল ও।

সেরাতে সুরাইয়ার বাবা-মাকে নিয়ে ডিনারের ভেতর দিয়ে সুসংবাদটা উদযাপন করলাম আমরা। জামিলা খালা *কোফতা*–শাদা ভাত আর মাংসের বড়া–আর *ফিরনি* রান্না করল। ভেজা ভেজা চোখে জেনারেল বলল আমাকে নিয়ে সে গর্বিত। জেনারেল তাহেরি আর তার স্ত্রী বিদায় নেওয়ার পর আমি আর সুরাইয়া বাড়ি ফেরার পথে কেনা মারলটের একটা দামী বোতল বর করে মজা করলাম। জেনারেল মেয়েদের অ্যালকোহল খাওয়া পছন্দ করে না। তার উপস্থিতিতে সুরাইয়া ড্রিঙ্ক করে না।

"তোমার জন্যে অনেক গর্ব হচ্ছে আমার," আমার গ্লাসের সঙ্গে গ্লাস তুলে বলল ও। "কাকাও খুব গর্ব করত।"

"জানি," বাবার কথা ভাবতে ভাবতে বললাম। ভাবলাম আমাকে এখন ও দেখলে ভালো হত।

সেরাতে আরও পরে সুরাইয়া ঘুমিয়ে যাওয়ারও অনেক পরে–মদ সব

BanglaBook.org

সময়ই ঘুম এনে দেয় ওর–বেলকনিতে দাঁড়িয়ে গ্রীষ্মের ঠাণ্ডা হাওয়া বুকে টেনে নিলাম। রহিম খান আর আমার লেখা প্রথম গল্পটা পড়ার পর ওর দেওয়া ছোট নোট বুকটার কথা ভাবলাম। *একদিন*, ইনশাল্লাহ্, *অনেক বড় লেখক হবে তুমি*, বলেছিল সে, *সারা দুনিয়ের লোক তোমার গল্প পড়বে।* আমার জীবনে কতই না ভালো ঘটনা রয়েছে। আমি সেসবের উপযুক্ত কিনা সেটা ভাবলাম।

পরের বছর গ্রীষ্মে বের হল উপন্যাসটা। ১৯৮৯ সালে। প্রকাশক আমাকে পাঁচটা শহরে বুক ট্যুরে পাঠাল। আফগান কমিউনিটিতে ছোটখাট সেলিব্রিটিতে পরিণত হলাম আমি। সে বছরই *শোরোভিরা* আফগানিস্তান থেকে তাদের প্রত্যাহার শেষ করল। আফগানদের জন্যে এটা একটা মহান সময় হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে যুদ্ধ অব্যহত রইল। এবার আফগান *মুজাহিদদের* সঙ্গে নাযিবুল্লাহর সোভিয়েত পুতুল সরকারের। আফগান রিফিউজিরা পাকিস্তানে আসতে লাগল। সেই বছরই ঠাণ্ডা-যুদ্ধের অবসান ঘটল। বার্লিন প্রাচীরের ধ্বংস হল। তিয়েনআনমেন স্কয়ারের বছর এটা। এসবের ভেতরই আফগানিস্তানের কথা বিস্মৃত হল সবাই। সোভিয়েত প্রত্যাহারের ফলে জেনারেল তাহেরির আশা উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও তা আবার পকেটের ঘড়ির মতোই ফিরে গেল।

সেই বছরই আমি আর সুরাইয়া একটা বাচ্চার জন্যে চেষ্টা শুরু করলাম।

বাবা হওয়ার চিন্তাটা আমার ভেতর আবেগের একটা ঘূর্ণির সৃষ্টি করল। একই সময়ে ব্যাপারটাকে আমার কাছে ভীতিকর, উদ্দীপক, নিরুৎসাহক আর উল্লাসিতকারী বলে মনে হতে লাগল। আমি কেমন বাবা হব, ভাবতে লাগলাম। ঠিক বাবার মতো হতে চাইলাম আমি; আবার ওর মতো হওয়ার কোনওই ইচ্ছে হল না।

কিন্তু এক বছর পেরিয়ে গেলেও কিছুই ঘটল না। প্রত্যেক রক্তচক্রের সঙ্গে সঙ্গে সুরাইয়া ক্রমাগত হতাশ, অধৈর্য আর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। ততদিনে জামিলা খালার শুরু দিকের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতগুলো আরও সোজাসাপ্টা হয়ে উঠল। যেমন, *"খো দেগা!"* তো! "কবে আমি আমার ছোট্ট *নিউসার* জন্যে *আলাহু* গাইব?" বরাবরের মতো পশতুন জেনারেল কখনও কোনও রকম প্রশ্ন করেনি। তার মানে হত নিজের মেয়ে আর একজন পুরুষের যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে আভাস দেওয়া, যদিও সেই পুরুষটি তার অনেক দিনের বিবাহিত স্বামী। কিন্তু জামিলা খালার বাচ্চা সংক্রান্ত প্রশ্ন শুনে চোখ নাচাত সে।

"অনেক সময় একটু সময় লেগে যায়।" এক রাতে সুরাইয়াকে বললাম।

"এক বছর একটু সময় না, আমির!" ওর পক্ষে কিঞ্চিত বেমানান তীক্ষ্ণ

কণ্ঠেই বলল ও। "আমি জানি কোথাও একটা গড়বড় আছে।"

"তাহলে চলো, ডাক্তার দেখাই।"

থলথলে চেহারার পেটমোটা লোক ডাক্তার রোজেন। ছোট ছোট সমান দাঁত, খানিকটা পশ্চিম ইউরোপিয় টানে কথা বলে। অনেকটা স্লাভিক ধরনের। ট্রেইনের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা আছে তার। রেইল রোডের ইতিহাস, মডেল লোকোমোটিভ, ট্র্যাকের উপর দিয়ে সবুজ পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে ছুটে চলা ট্রেইনের ছবিতে ভরা তার অফিস রুম। টেবিলের উপর একটা সাইনে লেখা রয়েছে, **জীবন একটা ট্রেইন, উঠে পড়ো।**

আমাদের জন্যে একটা প্ল্যান করে দিল সে। আগে আমাকে পরীক্ষা করা হল। "পুরুষদের পরীক্ষা করা সহজ," বলল সে। মেহগনি ডেস্কের উপর আঙুল দিয়ে তাল ঠুকতে লাগল সে। "পুরুষের প্লাম্বিং তার মনের মতোই, বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই। অন্যদিকে তোমরা মেয়েরা...বেশ, তোমাদের সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেক ভেবেছেন খোদা।" আমি ভাবলাম লোকটা সব দম্পতিকেই এই প্লাম্বিংয়ের সবক দেয় কিনা।

"আমরা ভাগ্যবান," বলল সুরাইয়া।

ডাক্তার রোজেন হাসল। ঠিক আন্তরিক বলে মনে হল না হাসিটা। আমার হাতে একটা ল্যাব স্লিপ আর একটা জার ধরিয়ে দিল সে। সুরাইয়ার হাতে কয়েকটা রুটিন ব্লাড টেস্টের অনুরোধ তুলে দিল। আমরা হাত মেলালাম। "ওয়েলকাম অ্যাব্রেড," আমাদের বিদায় করার সময় বলল সে।

আমি রঙিন পতাকা নিয়ে পার হয়ে এলাম।

পরের কয়েকটা মাস ছিল সুরাইয়ার জন্যে পরীক্ষার একটা ধারা। বেজাল বডি টেম্পারেচার, যত রকম ক্রোমোজম আছে তার প্রত্যেকটার জন্যে ব্লাড টেস্ট, ইউরিন টেস্ট, "সার্ভিকাল মিউকাস টেস্ট" নামে একটা কিছু, আল্ট্রা সাউন্ডস, আবার ব্লাড টেস্ট, আরও ইউরিন টেস্ট। হিস্টেরোস্কপি নামে একটা প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হল সুরাইয়াকে–ডাক্তার রোজেন সুরাইয়ার ইউটেরাসে একটা টেলিস্কোপ ঢুকিয়ে ভালো করে দেখল। কিছুই পেল না। "প্লম্বিং একেবারে পরিষ্কার," ঘোষণা করল সে। হাত থেকে লেটেক্স গ্লাভস খুলে ফেলল। লোকটা একথা বলা বাদ রাখলে ভালো হত, ভাবলাম। আমরা বাথরুম নই। সব পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর সে বলল আমাদের বাচ্চা না হবার কারণ বুঝতে পারছে না সে। স্পষ্টতই এটা খুবই অস্বাভাবিক। একে বলে, "আনএক্সপ্লেইন্ড ইনফার্টিলিটি।"

BanglaBook.org

এরপর শুরু হল চিকিৎসা-পর্ব। আমরা ক্লোমিফিন আর এইচএমজি নামে একটা ওষুধ নিলাম—অনেকগুলো ইঞ্জেকশন। সুরাইয়া নিজেই নিল। এসব ব্যর্থ হলে ডাক্তার রোজেন ভিট্রো ফার্টিলাইযেশনের পরামর্শ দিল। আমরা এইএমও থেকে একটা ভদ্রভাষায় লেখা চিঠি পেলাম, আমাদের সৌভাগ্য কামনা করে ওরা বলেছে খরচা পোষাতে পারবে না ওরা।

খরচ মেটাতে আমি আমার প্রথম উপন্যাসের জন্যে পাওয়া টাকাটা কাজে লাগালাম। দেখা গেল আইভিএফ একটা সময় সাপেক্ষ, সূক্ষ্ম এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ পরীক্ষা। কয়েক মাস ধরে গুড *হাউজকিপিং* আর *রিডার্স ডাইজেস্টের* মতো ম্যাগাজিন পড়ে ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা, অন্তহীন পেপারগাউন আর ফ্লুরোসেন্ট অলোয় আলোকিত স্টেরাইলড শীতল পরীক্ষাগারে সময় কাটানো আর সম্পূর্ণ অজেনা অচেনা লোকদের কাছে আমাদের যৌনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে ইঞ্জেকশন আর নমুনা সংগ্রহের পর ফের ডাক্তার রোজেন আর তার ট্রেইনের কাছে ফিরে এলাম আমরা।

আমাদের উল্টোদিকে বসে টেবিলের উপর আঙুলে তাল ঠুকতে লাগল সে। প্রথমবারের মতো "দত্তক" নেওয়ার কথা উচ্চারণ করল। সারা পথ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল সুরাইয়া।

ডাক্তার রোজেনের ওখানে শেষ বার যাওয়ার পরের উইক এন্ডে বাবা-মাকে খবরটা জানাল সুরাইয়া। তাহেরিদের পেছনের উঠোনে পিকনিক চেয়ারে বসেছিলাম আমরা। রুই মাছ ভাঁজি আর দইয়ের দফ খচ্ছিলাম। ১৯৯১ সালের মার্চ মাসের সন্ধ্যার ঠিক আগের ঘটনা। জামিলা খালা গোলাপ গাছ আর নতুন লাগানো হানি সাকলস-এ পানি দিয়েছে, রান্না মাছের গন্ধের সঙ্গে মিলিমিশে একাকার হয়ে গেছে ওগুলোর সুবাস। এরই মধ্যে দুবার টেবিলের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুরাইয়ার হাত ধরে সে বলার চেষ্টা করেছে, "খোদাই ভালো জানেন, *বাচ্চে*. হয়ত এমনটা হওয়ার কথা না।"

সুরাইয়া হাতের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ক্লান্ত ও। জানতাম আমি। সব মিলিয়ে ক্লান্ত। "ডাক্তার বলেছে আমরা দত্তক নিতে পারি," বিড়বিড় করে বলল ও।

একথা শুনে তড়াক করে সোজা হয়ে গেল জেনারেল তাহেরির মাথা। বারবিকিউ-র ঢাকনা বন্ধ করল সে। "বলেছে নাকি?"

"বলেছে এটা একটা উপায়," বলল সুরাইয়া।

বাড়িতে দত্তক নেওয়া প্রসঙ্গে আলাপ করেছি আমরা। সুরাইয়াকে বড়জোর দোনোমনো করছিল বলা যেতে পারে। "জানি বাপারটা হাস্যকার আর ব্যর্থও

BanglaBook.org

হতে পারে," বাবা-মায়ের বাড়িতে যাবার পথে আমাকে বলল ও। "কিন্তু আমার আর কোনও উপায় নেই। সব সময় ভেবে এসেছি নিজের কোলে নিয়ে ভাবব নয় মাস ধরে নিজের রক্তে ওকে বড় করে তুলেছি। একদিন ওর চোখের দিকে তাকাব। তোমাকে বা আমাকে দেখে চমকে উঠবে ও। তারপর বাচ্চাটা বড় হবে, তোমার বা আমার হাসিটা পাবে ও। এটা ছাড়া...এটা কি ভুল?"

"না," বললাম আমি।

"আমি কি স্বার্থপরের মতো কথা বলছি?"

"না, সুরাইয়া।"

"কারণ সত্যিই যদি কাজটা করতে চাও..."

"না," বললাম। "আমরা সত্যিই কাজটা করতে চাইলে এখানে কোনও রকম সন্দেহের অবকাশ থাকা চলবে না। আমাদের দুজনকেই একমত হতে হবে। নইলে বাচ্চটার প্রতি অন্যায় করা হবে।"

জানালার উপর মাথা রাখল ও। বাকি পথ আর কিছুই বলেনি।

এখন জেনারেল বসে আছে ওর পাশে। "*বাচ্চে*, দত্তক নেওয়ার ব্যাটারটা...জিনিসটা, আমি নিশ্চিত নাই...আফগানদের জন্যে এটা ঠিক কিনা।" ক্লান্ত চোখে আমার দিকে তাকাল সুরাইয়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"একটা দিক হচ্ছে এরা বড় হয়ে আসল বাবা-মায়ের পরিচয় জানতে চায়," বলল সে। "সেজন্যে ওদের দোষ দিতে পারবে না তুমি। অনেক সময় যেবাড়িতে ওদের অনেক কষ্টে লালানপালন করেছ সেটা ছেড়েই চলে যায়, যারা ওদের জন্ম দিয়েছে তাদের খুঁজে বের করার জন্যে। রক্তের শক্তি অনেক বড়, বাবা, এটা ভুলে যেয়ো না।"

"এনিয়ে আমি আর কথা বলতে চাই না," বলল সুরাইয়া।

"আরেকটা কথা বলতে চাই," বলল সে। বুঝতে পারছিলাম ক্ষেপে উঠেছে সে। জেনারেলের একটা ছোটখাটো বক্তৃতা শুনতে হবে আমাদের। "আমির জানের কথাই ধরো, আমরা সবাই ওর বাবাকে চিনি। আমি জানি ওর দাদা কাবুলে ছিল। তার আগের দাদাকেও চিনি। জিজ্ঞেস করলে এখানে বসেই ওর বাপদাদার সব খবর বলে দিতে পারব আমি। সেজন্যে ওর বাবা যখন–খোদা তাকে শান্তি দিন–*খাস্তেগেরির* জন্যে এল, আমি দ্বিধা করিনি। বিশ্বাস করো, ওর বাবা আমার কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসত না যদি তার জানা না থাকত তুমি কার উত্তরসূরি। রক্তের শক্তি অনেক বেশী, *বাচ্চে*, দত্তক নেওয়ার সময় জানার উপায় থাকে না কার রক্ত ঘরে নিয়ে আসছ তুমি।

"এখন, তোমরা আমেরিকান হলে কোনও সমস্যা ছিল না। এখানকার

BanglaBook.org

লোকজন আনন্দের জন্যে বিয়ে করে। পরিবারের নাম বা বংশধারা কোনও দিনই ওদের হিসাবের মধ্যে নেই। এরা সেভাবে দত্তকও নেয়। বাচ্চা স্বাস্থ্যবান হলে সবাই খুশি হয়। কিন্তু আমরা আফগান, *বাচ্চে*।"

"মাছটা প্রায় হয়ে গেছে না, আমির জান?" জানতে চাইল জামিলা খালা। ওর উপর একটু ক্ষণ স্থির হয়ে থাকল জেনারেল তাহেরির চোখ। ওর হাঁটুতে চাপড় দিল সে। "তোমার যে স্বাস্থ্য ঠিক আছে আর একটা ভালো স্বামী পেয়েছ সেজন্যে শোকর কর।"

গ্লাসটা তাকের উপর নামিয়ে রাখলাম আমি। ওখানে পটে লাগানো জেরানিয়াম থেকে পানি ঝরছে। "আমি মনে হয় জেনারেলের সঙ্গে একমত।"

আশ্বস্ত হয়ে আবার গ্রিলের দিকে মনোযোগ দিল জেনারেল।

দত্তক না নেওয়ার পেছনে আমাদের সবারই নিজস্ব কারণ ছিল। সুরাইয়ার আছে, জেনারেলের আছে, আমার কারণটা হচ্ছে: আমার কর্মকাণ্ডের জন্যে হয়ত কেউ একজন কোথাও কিছু একটা আমার পিতৃত্বকে অস্বীকার করেছে। হয়ত এটাই আমার শাস্তি। হয়ত এটাই ঠিক হয়েছে। *হয়ত এমন হবার কথা না*, বলেছে জামিলা খালা। কিংবা, হয়ত, এমনই হবার কথা।

কয়েক মাস পরে আমার দ্বিতীয় উপন্যাসের অগ্রীম দিয়ে স্যান ফ্রান্সিস্কোর বার্নাল হাইটস-এ একটা দুই বেডরুমের ভিক্টোরিয়ান হাউজের জন্যে ডাউন পেমেন্ট মেটালাম আমরা। সূচাল ছাদ রয়েছে ওটার, হার্ডউড ফ্লোর, পেছনে ছোট একটা উঠোন, একটা সান ডেক আর ফায়ার পিটে শেষ হয়েছে ওটা। ডেস্কটা শেষ করতে আর দেয়ালে রঙ লাগানোর কাজে সাহায্য করল জেনারেল। জামিলা খালা আমরা বের হবার এক ঘণ্টাই আগেই সুরাইয়ার সমস্ত ভালোবাসা আর সাহায্য লাগবে ভেবে চলে এসেছিল। এটা বুঝতে পারেনি যে আসলে তার সদিচ্ছাপ্রসূত অতি সহানুভূতিই ছিল সুরাইয়ার চলে আসার কারণ।

অনেক সময় সুরইয়া আমার পাশে ঘুমিয়ে থাকে আর আমি বিছানায় শুয়ে বাতাসের ধাক্কায় স্ক্রিন ডোরের খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে চলি। উঠোনে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক কানে আসে। সুরাইয়ার জঠরের শূন্যতা যেন অনুভব করি। যেন ওটা জীবন্ত কিছু। আমাদের বিয়েতে, আমাদের হাসি-ঠাট্টায়, আমাদের প্রেম-ভালোবাসায় ঢুকে পড়েছে এই শূন্যতা। শেষ রাতের দিকে আমাদের ঘরের অন্ধকারে আমার মনে হয় ওটা সুরাইয়ার ভেতর থেকে উঠে আসছে, আমাদের মাঝখানে থানা গেড়ে বসছে–সদ্যজাত শিশুর মতো।

BanglaBook.org

চৌদ্দ

জুন ২০০১

ক্রেডলে ফোনটা নামিয়ে রেখে দীর্ঘক্ষণ ওটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আফলাতুন চেঁচিয়ে উঠে আমাকে চমকে দেওয়ার আগ পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি ঘরটা কত নীরব হয়ে গিয়েছিল। সুরাইয়া টিভির সাউন্ড অফ করে রেখেছিল।

"তোমাকে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, আমির," কাউচ থেকে বলল ও। আমাদের প্রথম অ্যাপার্টমেন্টে সাজানোর জন্যে ওর বাবা-মায়ের দেওয়া সেই একই কাউচ এটা। বুকের উপর আফলাতুনের মাথা রেখে ওটায় শুয়ে ছিল ও। ছেঁড়াখোঁড়া বালিশের নিচে পা ঢুকিয়ে রেখেছে। মিনোসোটার নেকড়ে বাঘদের দুর্দশা উপর নির্মিত একটা পিবিএস স্পেশাল দেখছিল আনমনে। অন্যদিকে সামার স্কুল ক্লাসের রচনা শোধরাচ্ছিল। উঠে বসল ও। লাফ দিয়ে কাউচ থেকে নেমে গেল আফলাতুন। জেনারেলই আমাদের ককার স্পেনিয়েলের এই নামটা দিয়েছে। "প্লেটো"র ফারসি নাম। "কারণ," বলেছে সে, "তুমি অনেকক্ষণ ভালো করে কুকুরটার টলটলে কালো চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তোমার মনে হবে বুঝি গভীরভাবে কোনও কিছু ভাবছে সে।"

এখন সরাইয়ার ঠিক থুতনির নিচে লালার একটা আভাস দেখা যাচ্ছে। গত দশটি বছর ওর কোমরের বাঁক কিছুটা ভরাট করে তুলেছে। ওর কালোচুলে কয়েক গোছা রূপালী ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও উড়ন্ত পাখীর ডানার মতো ভুরু আর প্রাচীন আরবি ভাষার কোনও হরফের মতো জাঁকালভাবে

বাঁকা নাকের কারণে ওর চেহারা এখনও গ্র্যান্ড বল প্রিন্সেসের মতোই রয়ে গেছে ।

"তোমাকে ফ্যাকাশে লাগছে," আবার বলল সুরাইয়া, কাগজের স্তূপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

"আমাকে পাকিস্তান যেতে হবে।"

এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল ও। "পাকিস্তান?"

"রহিম খান অনেক অসুস্থ।" কথাগুলো যেন একটা হাত হয়ে আমাকে ভেতর থেকে চিপে ধরেছে।

"কাকার পুরোনো বিজনেস পার্টনার?" রহিম খানের সঙ্গে তখনও ওর দেখা হয়নি, তবে ওর কথা ওকে আমি বলেছি। মাথা দোলালাম।

"ওহ," বলল ও। "আমি দুঃখিত, আমির।"

"আমরা অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলাম," বললাম। "ছোট বেলায় বড়দের মধ্যে একমাত্র ওকেই আমার বন্ধু বলে মনে হয়েছিল।" মনে মনে বাবার স্টাডিতে বাবার সঙ্গে ওকে চা খেতে দেখলাম আমি। জানালার কাছে ধূমপান করছে। বাগান থেকে ধেয়ে আসা একটা হাওয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীজোড়াকে ভেঙে দিচ্ছে।

"ওর কথা আমাকে বলেছ তুমি," বলল সুরাইয়া। একটু থামল। "কতদিনের জন্যে যাবে তুমি?"

"জানি না। আমাকে দেখতে চাইছে ও।"

"এটা কি..."

"হ্যাঁ, নিরাপদ। আমি ঠিকই থাকব, সুরাইয়া।"

সব সময় এই প্রশ্নটাই করতে চাইছিল ও। আমাদের পনের বছরের বিবাহিত জীবন পরস্পরের মনের ভাব বোঝায় দক্ষ করে তুলেছে। "এখন একটু হাঁটতে যাচ্ছি আমি।"

"আমি আসব?"

"না। আমি বরং একাই যাই।"

গাড়ি নিয়ে গোল্ডেন গেইট পার্কে চলে এলাম। পার্কের উত্তর দিকের স্পেকেলস লেকের পার ধরে হাঁটতে লাগলাম। চমৎকার রোববারের বিকেল। জলের উপর ঝিলিক খাচ্ছে রোদ। অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে ওখানে। স্যান ফ্রান্সিস্কোর ঠাণ্ডা শুকনো হাওয়ার টানে ভেসে চলেছে ওগুলো। পার্কের একটা বেঞ্চে বসে এক লোককে ছেলের দিকে একটা বল ছুঁড়ে দিতে দেখলাম। বলটাকে একপাশ দিয়ে না ছুড়ে মাথার উপর দিয়ে ছুড়ে মারতে বলছে। চোখ

তুলে আকাশে এক জোড়া ঘুড়ি উড়তে দেখলাম। লম্বা নীল লেজঅলা লাল ঘুড়ি। গাছপালার অনেক উপরে–পার্কের পশ্চিম প্রান্তে, উইন্ডমিলের উপরে উড়ছে ওগুলো। আমার ফোন রাখার ঠিক আগ মুহূর্তে রহিম খানের বলা একটা মনে পড়ল। প্রায় কথার কথার ঢঙে বলেছে ও। চোখ বন্ধ করে লঙ-ডিসটেন্স লাইনের অপর প্রান্তে ওকে দেখতে পেলাম। ঠোঁটজোড়া একটু ফাঁক হয়ে আছে। একপাশে কাত হয়ে আছে মাথাটা। আবারও ওর তলহীন চোখের দৃষ্টিতে আমাদের গোপন কোনও বিষয় যেন ঝলসে উঠল। এখন আমি জানি যে সে জানে, এই যা। এতগুলো বছর ধরে আমার সন্দেহ ঠিক ছিল। আসেফ, ঘুড়ি, টাকা, বজ্রের ছবির মতো কাটাঅলা ঘড়ি–সব জানে ও। আগাগোড়াই জানত।

এস। আবার ভালো হয়ে ওঠার একটা উপায় আছে। কথার কথা বলেছে ও। যেন হঠাৎ করেই।

ভালো হয়ে ওঠার একটা উপায়।

বাড়ি ফিরে এলাম যখন সুরাইয়া ফোনে ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল। "বেশীদিন না, মাদর জান। এক সপ্তাহ, কিংবা দুই সপ্তাহ...হ্যাঁ, তুমি আর বাবা এসে আমার সঙ্গে থাকতে পারো..."

দুই বছর আগে ডান কোমর ভেঙে ফেলেছে জেনারেল। আবার মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হয়েছিল তার। রক্তচক্ষু আর ঘুমঘুম ভাব নিয়ে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে আসছিল। কার্পেটের একটা আলগা হয়ে থাকা কোনার সঙ্গে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় সে। ওর চিৎকারে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসে জামিলা খালা। "মনে হল যেন একটা *ঝাড়ু* দুটুকরো হয়ে গেছে," তাকে সব সময় এটা বলতে দেখা গেছে। যদিও ডাক্তার বলেছে তার এমন আওয়াজ পাওয়ার কোনও কারণ নেই। জেনারেলের ভাঙা কোমর–তার সঙ্গে যত রকম জটিলতা থাকতে পারে–নিউমোনিয়া, ব্লাড পয়জনিং, নার্সিংহোমে দীর্ঘদিন অবস্থান–জামিলা খালার নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘদিনের একঘেয়ে প্রলাপের অবসান ঘটিয়েছে। এবার জেনারেলের অসুস্থতা নিয়ে নতুন প্রলাপ শুরু হয়েছে। যাকে কাছে পাবে তাকেই সে বলবে ডাক্তার বলেছে তার কিডনি অকেজো হয়ে গেছে। "অবশ্য ওরা তো আর আফগানদের কিডনি দেখেনি, তাই না?" গর্বের সঙ্গে বলবে সে। জেনারেলের হাসপাতালে থাকার যে ব্যাপারটা বেশী মনে আছে সেটা হল জেনারেল না ঘুমানো পর্যন্ত জামিলা খালা অপেক্ষা করত, তারপর ওকে গান গেয়ে শোনাত। বাবার পুরোনো দাগপড়া ট্রানজিস্টর রেডিওতে শোনা সেইসব গান।

BanglaBook.org

জেনারেলের অক্ষমতা–আর সময়–সুরাইয়া আর ওর ভেতরকার সম্পর্কও অনেকটা কোমল করে তুলেছে। একসঙ্গে হাঁটতে যায় ওরা। শনিবারে লাঞ্চে যায়। অনেক সময় ওর কোনও ক্লাসে বসে থাকে জেনারেল। রুমের পেছনে চকচকে ধূসর পুরোনো স্যুট পরে বসে থাকবে সে। কোলের উপর কাঠের ছড়ি, মুখে হাসি। অনেক সময় এমনকি নোটও করে।

সেরাতে আমি আর সুরাইয়া বিছানায় শুয়ে আছি, আমার বুকে পিঠ ঠেকিয়ে রেখেছে ও, ওর চুলে মুখ দাবিয়ে রেখেছি আমি। আমরা যখন কপালে কপালে ঠেকিয়ে শুয়ে থাকতাম সেইসব দিনের কথা ভাবলাম। মিলনের পরের চুমু বিনিময় করে চোখ বুজে আসার আগ পুর্যন্ত ছোট ছোট কোঁকড়ানো আঙুল, প্রথম হাসি, প্রথম আধো আধো বুলি, প্রথম হাঁটতে শেখা নিয়ে ফিসফিস করে কত কত কথা বলতাম। এখনও মাঝে মাঝে বলি। তবে সেসব ওর স্কুল আর আমার নতুন বই নিয়ে, কিংবা কোনও পার্টিতে কারও হাস্যকর পোশাক নিয়ে। এখনও আমাদের মিলন বেশ চমৎকার চলছে। অনেক সময় আগের চেয়ে ঢের ভালো। কিন্তু কোনও কোনও রাতে কাজটা শেষ হওয়ার পর যেন স্বস্তি বোধ করি। মুক্ত হয়ে খানিকক্ষণের জন্যে এইমাত্র যা করেছি সেটার অর্থহীনতা থেকে দূরে ভেসে যেতে পেরে ভালো লাগে। ও কখনও বলেনি এমন কিছু। তবে আমি জানি অনেক সময় সুরাইয়ার মনেও এই ভাবনা খেলে যায়। সেইসব রাতে আমরা খাটের যার যার পাশে সরে যাই। আমাদের উদ্ধারকারীকে সুযোগ করে দিই। সুরাইয়ার বেলায় সেটা ঘুম; আর আমার বেলায় বরাবরই কোনও একটা বই।

রহিম খান ফোন করার সেই রাতে অন্ধকার রাতে শুয়ে শুয়ে ব্লাইন্ডের ফোকর গলে ঢুকে পড়া চাঁদের আলোর নকশার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি। এক সময়, সম্ভবত ভোরের দিকে ঘুমে তলিয়ে গেলাম। তুষারের উপর দিয়ে হাসানের দৌড়ে যাবার স্বপ্ন দেখলাম। ওর সবুজ *চাপানের* প্রান্ত পেছনে গড়াচ্ছে। রাবারের জুতোর নিচে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে বরফ। কাঁধের উপর দিয়ে চিৎকার করছে ও: *তোমার জন্যে হাজার বার!*

এক সপ্তাহ পরে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স-এর একটা ফ্লাইটের জানালার পাশের সিটে উঠে বসলাম আমি। দুজন ইউনিফর্ম পরা কর্মীকে হুইল চেক সরাতে দেখলাম। টার্মিনাল থেকে বের হয়ে এল প্লেনটা। অচিরেই উঠে এল আকাশে। মেঘ ফুঁড়ে উড়ে চলল। জানালার উপর মাথা রেখে ঘুমের আশায় ব্যর্থ অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

BanglaBook.org

পনের

পেশওয়ারে আমার ফ্লাইট ল্যান্ড করার তিন ঘন্টা পর একটা ধোঁয়ায় ভরা ট্যাক্সিক্যাবের পেছনের ছেঁড়াখোঁড়া পেছনের সিটে বসে আছি আমি। নিজেকে গোলাম বলে পরিচয় দেওয়া চেইন স্মোকার ঘর্মাক্ত কলেবর ছোটখাট এক লোক আমার ড্রাইভার নিরাসক্তভাবে গাড়ি চালাচ্ছে। বেপরোয়া সে। অল্পের জন্যে এড়িয়ে যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টগুলো। কিন্তু তার মুখ থেকে ক্রমাগত বেরিয়ে আসা কথার তুবড়ি এতটুকু কমছে না।

"...তোমার দেশে যা ঘটছে তাকে ভয়ঙ্কর বলতে হয়। আফগানিস্তানি আর পাকিস্তানিরা ভাইয়ের মতো। আমি বলছি। মুসলিমদের উচিত মুসলিমদের সাহায্য করা..."

ভদ্রতার সঙ্গে মাথা দুলিয়ে ওকে বাতিল করে দিলাম আমি। ১৯৮১ সালে বাবার সঙ্গে অল্পদিন একানে থাকার সুবাদে পেশওয়ার বেশ ভালোভাবেই চেনা ছিল। এখন জামরুদ রোড দিয়ে আগে বাড়ছি আমরা। ক্যান্টনমেন্ট আর সেটার বিলাসি উঁচু উঁচু দেয়ালঅলা বাড়ি ঘর পেছনে ফেলে এসেছি। আমার পাশ দিয়ে ঝলকের মতো চলে যাওয়া শহরের ব্যস্ততা আমার চেনা অন্য এক কাবুলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। বিশেষ করে *কোচেহ*-মোরগাহ্‌-বা মুরগিবাজারের কথা। ওখানে আমি আর হাসান চাটনিতে ভেজানো আলু আর চেরি ওয়াটার কিনতাম, বাইসাইকল চালক, পথচারী আর নীল ধোঁয়া ছাড়া রিকশায় ঠাসাঠাসি অবস্থা রাস্তাঘাটের। এগুলো সংকীর্ণ গলি আর তস্য গলিপথে এঁকে বেঁকে চলছে। ছোট অথচ একেবারে ঠাসাঠাসি দোকানে বসে

পাতলা চাদর গায়ে দেওয়া দাড়িঅলা ফেরিঅলারা পশুর চামড়ার ল্যাম্পশেড, কার্পেট, এম্ব্রয়ডারি করা শাল আর তামার জিনিস বিক্রি করছে। গোটা শহর শব্দে ফেটে পড়ছে। আমার কানে বাজতে থাকা ফেরিঅলার চিৎকার হিন্দি গান, রিকশার ক্যাঁচকোঁচ, ঘোড়ায় টানা গাড়ির ঘণ্টার অওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। কড়া গন্ধ আসছে। সু আর কু দুটোই আছে। প্যাসেঞ্জার উইন্ডো দিয়ে ভেসে আসছে। *পাকোরার* মসলা মাখা গন্ধ, বাবার অনেক পছন্দের *তন্দুরির* গন্ধ ডিজেলের উৎকট গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে। আর আছে পচা ময়লা বর্জ্যের গন্ধ।

পেশওয়ার ইউনিভার্সিটির লাল দালান পার হয়ে আসার একটু বাদে একটা এলাকায় ঢুকলাম আমরা, আমার বাকোয়াজ ড্রাইভার বলল এটা "আফগান টাউন"। মিষ্টির দোকান আর কার্পেট ফেরিঅলা চোখে পড়ল। *কাবাবের* স্টল, ছোট ছোট বাচ্চাদের সিগারেট বিক্রি করতে দেখলাম। ছোট ছোট রেস্তঁরা–ওগুলোর জানালায় আফগানিস্তানের ম্যাপ লাগানো–ব্যাকস্ট্রিট এইড এজেন্সির সঙ্গে সম্পর্কিত সব। "এখানে তোমার অনেক দেশী ভাই আছে, *ইয়ার*। ব্যবসা খুলে বসেছে ওরা। কিন্তু ওদের বেশীর ভাগই খুব গরীব।" জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দকরল সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "যাকগে, এখন এসে পড়েছি আমরা।"

১৯৮১ সালে রহিম খানকে শেষবার দেখার কথা মনে পড়ল আমার। আমি আর বাবা কাবুল ছেড়ে পালানোর আগের রাতে বিদায় জানাতে এসেছিল ও। মনে আছে বাবা আর ও ফয়েতে এক অন্যকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে। বাবা আর আমি ইউএসএ-তে পৌঁছানোর পর যোগাযোগ রেখেছে রহিম খান। বছরে চারপাঁচবার আলাপ হত ওদের। অনেক সময় বাবা আমাকে দিত রিসিভারটা। বাবার মৃত্যুর অল্পদিন পরে শেষবার রহিম খানের সঙ্গে কথা বলেছিলাম আমি। খবরটা কাবুলে পৌঁছছিল। ফোন করেছিল সে। মাত্র কয়েক মিনিট কথা বলার পর লাইন কেটে গিয়েছিল।

একটা ব্যস্ত বাঁকে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। এখানে দুটো আঁকাবাঁকা পথ মিলিত হয়েছে। ড্রাইভারের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে আমার একমাত্র স্যুটকেসটা বের করে নিলাম। সূক্ষ্ম নকশা আঁকা একটা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। দালানটার কাঠের বেলকনি আর খোলা শাটার রয়েছে। অনেকগুলোতেই কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তোলা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এলাম আমি। একটা ম্লান হলওয়ে হয়ে ডানপাশের শেষ দরজার কাছে চলে এলাম। হাতের তালুতে রাখা ছোট এক টুকরো কাগজে লেখা ঠিকানা

BanglaBook.org

দেখলাম। নক করলাম তারপর।

রহিম খানের ভান করা হাড় আর চামড়ার একটা কিছু দরজা খুলে দিল।

স্যান হোসে স্টেটের এক ক্রিয়েটিভ রাইটিং টিচার ক্লীশে সম্পর্কে বলত আমাদের: "যক্ষ্মার মতো এড়িয়ে যাবে একে।" তারপর নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠত। তার সঙ্গে হাসত ক্লাসের সবাই। কিন্তু আমার সব সময় মনে হত ক্লীশের অপমান করা হচ্ছে। কারণ প্রায়শই এগুলো নির্ভুল হয়ে পড়ে। কিন্তু ক্লীশে প্রবাদের উপযুক্ততা ক্লীশে হিসাবে বলা প্রবাদের ভেতরেই ঢাকা পড়ে যায়। যেমন, "এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম" প্রবাদটা। রহিম খানের সঙ্গে আমার পুনর্মিলনকে এরচেয়ে ভালোভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

দেয়াল ঘেঁষে পাকতা খসখসে জাজিমের উপর বসে আছি আমরা, নিচের শোরগোলময় রাস্তার দিকে খোলা জানালার উল্টোদিকে। তীর্যকভাবে সূর্যের আলো ঢুকে পড়েছে ঘরে, মেঝের উপর বিছানো আফগান গালিচার উপর চৌকো আলোর একটা ঘর তৈরি করেছে। একটা দেয়ালের সঙ্গে দুটো ফোল্ডিং চেয়ার ঠেস দিয়ে রাখা। উল্টোদিকের কোণে একটা ছোট তামার সামোভার রয়েছে। ওটা থেকে আমাদের জন্যে চা ঢেলে নিলাম আমি।

"আমাকে পেলে কীভাবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আমেরিকায় কাউকে খুঁজে বের করা কঠিন নয়। ইউএস-এর একটা ম্যাপ কিনেছি, তারপর নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন শহরের ইনফরমেশন সেন্টারে ফোন করেছি," বলল সে। "তোমাকে এমনি বড় হয়ে যেতে দেখে অবাক লাগছে খুব।"

হেসে চায়ে তিনটা চিনির দলা ফেললাম। মনে পড়ল কড়া আর তেতো চা খেতেই পছন্দ করত ও। "বাবা তোমাকে জানানোর সুযোগ পায়নি, কিন্তু আমি পনের বছর আগে বিয়ে করেছি।" আসল কথা ততদিনে বাবার ব্রেইনের ক্যানসার ওকে ভুলোমন আর অমনোযোগি করে ফেলেছিল।

"তুমি বিয়ে করেছ? কাকে?"

"ওর নাম সুরাইয়া তাহেরি," বাড়িতে আছে ও, মনে পড়ল। আমার কথা ভাবছে। ও একা নয় বলে ভালো লাগল।

"তাহেরি...কার মেয়ে?"

বললাম ওকে। চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। "ও, আচ্ছা। মনে পড়েছে। জেনারেল তাহেরি শরীফ জানের বোনকে বিয়ে করেছিল না? কি যেন ওর নাম..."

BanglaBook.org

"জামিলা জান।"

"*বালে!* " হেসে বলল সে। "কাবুলে থাকতে শরীফ জানকে চিনতাম। অনেক দিন আগের কথা। সে আমেরিকায় চলে যাবার আগে।"

"অনেক বছর ধরে আইএনএস-এ কাজ করছে সে। অনেক আফগান কেস সামাল দিয়েছে।"

"*হাইইই!*" হাই তুলল সে। "তোমার আর সুরাইয়ার বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে?"

"*নাহ।*"

"ওহ," চায় চুমুক দিল সে। এ নিয়ে আর কোনও কথা বলল না। রহিম খান বরাবরই আমার দেখা সবচেয়ে বুঝদার লোক।

বাবার সম্পর্কে অনেক কিছু বললাম ওকে। ওর কাজ, ফ্লি মার্কেটের কথা, শেষ পর্যন্ত কীভাবে সুখী হয়ে উঠেছিল ও। আমার লেখাপড়া, লেখালেখি, বই বেরুনোর কথা বললাম। এপর্যন্ত চারটে বই বের হয়েছে আমার। শুনে মৃদু হাসল ও। বলল এ ব্যাপারে ওর মনে কখনওই কোনও রকম সন্দেহ ছিল না। বললাম ওর দেওয়া চামড়ায় বাঁধানো সেই নোটবইটাতে ছোট গল্প লিখেছি আমি। কিন্তু নোট বইটার কথা মনে করতে পারল না ও।

অনিবার্যভাবেই তালিবানদের দিকে বাঁক নিল আলাপ।

"যেমন শুনছি অবস্থা কি আসলেই তেমন খারাপ?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না, তারচেয়েও খারাপ। অনেক বেশী খারাপ।" বলল ও। "ওরা তোমাকে মানুষের মতো থাকতে দেবে না।" ওর ডান চোখের ঠিক ওপরে একটা ক্ষত চিহ্নের দিকে ইঙ্গিত করল। ঘন ভুরুর ভেতর একটা আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করেছে ওটা। "১৯৯৮ সালে গাযনি স্টেডিয়ামে একটা সকার গেম দেখতে গিয়েছিলাম। বোধ হয় কাবুলের বিরুদ্ধে মাযার-ই-শরীফের খেলা হবে। ও হ্যাঁ, খেলোয়াড়দের শর্টস পরার অনুমতি দেওয়া হয়নি। মনে হয় ইনডিসেন্ট এক্সপোজার হয়।" ক্লান্ত হাসি দিল ও। "যাক গে, কাবুল একটা গোল দিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশের লোকটা খুশীতে চিৎকার করে উঠল। আইলে টহল দিচ্ছিল বড়জোর আঠার বছর বয়সী একটা ছেলে, চেহারা দেখে তাই মনে হয়, হঠাৎ আমার দিকে এগিয়ে এসে ক্লাশনিকভের বাঁট দিয়ে আমার কপালে ধাঁই করে একটা বাড়ি মেরে বসল। 'আবার অমন করলে তোমার জিভ কেটে ফেলব, বুড়ো গাধা কোথাকার!' বলল সে।" গ্রন্থিল একটা আঙুলে ক্ষত চিহ্নটা স্পর্শ করল ও। "আমি ওর দাদার বয়সী হব। মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল, আমি বসে ছিলাম। কুত্তার বাচ্চাটার কাছে আমাকে মাফ চাইতে হয়েছে।"

BanglaBook.org

ওকে আবার চা ঢেলে দিলাম। আরও খানিকক্ষণ কথা বলল রহিম খান। তার অনেকটাই আগে থেকেই জানা ছিল আমার। কিছুটা জানা ছিল না। ও আমাকে বলল, বাবা আর ওর মধ্যে সমঝোতা অনুযায়ী ১৯৮১ সাল থেকে বাবার বাড়িতেই থাকছে ও। এটা জানতাম। আমরা কাবুল ছেড়ে পালাবার অল্পদিন আগে রহিম খানের কাছে বাড়িটা "বিক্রি" করে দিয়েছিল বাবা। বাবা সেই সব দিনকে যেভাবে দেখেছে, আফগানিস্তানের সমস্যাগুলো আমাদের জীবনযাত্রায় সাময়িক বাধামাত্র-ওয়াযির আকবার খান এলাকার পার্টি আর পাঘমানে পিকনিকের দিনগুলো আবার ফিরে আসবে। তাই সেই দিন পর্যন্ত দেখভাল করার জন্যে বাড়িটা রহিম খানকে দিয়েছিল ও।

১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে নর্দার্ন অ্যালায়েন্স কাবুল অধিকার করে নেওয়ার পর কীভাবে বিভিন্ন উপদল কাবুলের বিভিন্ অংশ দাবী করে বসেছিল জানাল আমাকে রহিম খান। "একটা কার্পেট কিনতে শার-এ-নও থেকে কার্থে-পারওয়ানে যেতে হলেও কোনও স্নাইপারের গুলিতে বা মর্টারের গোলার আঘাতে মারা পড়ার ঝুঁকি ছিল। মানে যদি চেকপোস্ট পার হয়ে যেতে পারো আরকি। বলতে গেলে এক মহল্লা থেকে আরেক মহল্লায় যেতেও ভিসা লাগত। তো লোকজন স্রেফ ঘরে বসে থাকত। দোয়া করত যাতে পরের রকেটটা এসে তাদের বাড়ির ওপর না পড়ে।" ও বলল লোকে কীভাবে বাড়ির দেয়ালে গর্ত খুঁড়ে নিয়েছিল যাতে বিপজ্জনক রাস্তা এড়িয়ে ওই ফুটোর ভেতর দিয়েই এক ব্লক থেকে আরেক ব্লকে যাওয়া আসা করা যায়। অন্যান্য অংশে লোকে মাটির নিচের টানেল দিয়ে চলাফেরা করত।

"পালিয়ে যাওনি কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কাবুল আমার বাড়ি ছিল। এখনও তাই আছে।" নাক টানল ও। "তোমাদের বাসা থেকে *কিশলার* মিলিটারি ব্যারাকের দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটার কথা মনে আছে? ইশতিকবাল স্কুলের পাশে?"

"হ্যাঁ।" স্কুলে যাবার শর্টকাট রাস্তা ছিল ওটা। আমি আর হাসান ওদিক দিয়ে যাবার সময় সৈন্যরা ওর মাকে নিয়ে টিটকারি মারার কথা মনে পড়ল আমার। পরে সিনেমা হলে কেঁদেছিল হাসান। আমি ওর গলা জড়িয়ে ধরেছিলাম।

"তালিবানরা এসে অ্যালায়েন্সকে যখন লাথি দিয়ে তাড়িয়ে দিল, আমি আসলে রাস্তার উপর নেচেছিলাম," বলল রহিম খান। "বিশ্বাস করো, আমি একা ছিলাম না। চামানে, দেহ-মাযাঙ-এ লোকজন ফূর্তি করেছে। রাস্তায় রাস্তায় তালিবানদের সাথে কোলাকুলি করেছে। ওদের ট্যাঙ্কে উঠে পড়েছে। ওদের সঙ্গে

banglabook.org

পোজ দিয়েছে ছবি তোলার জন্যে। লোকজন লাগাতার যুদ্ধ করেছে, রকেট-বন্দুকের গোলাগুলি, বিস্ফোরণ, নড়াচড়া করে এমন যেকোনও কিছুর দিকে গুলবুদ্দিন আর তার চ্যালাদের গুলি ছোঁড়া দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। *শোরোভিদের* চেয়ে কাবুলের ঢের বেশী ক্ষতি করেছে অ্যালায়েন্স। তোমার বাবার এতীমখানা ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা। এটা জানো?"

"কেন?" জানতে চাইলাম আমি। "এতীমখানা কেন ধ্বংস করতে চাইবে ওরা?" এতীমখানার উদ্বোধনের দিন বাবার পেছনে বসে থাকার কথা মনে পড়ল আমার। হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল ওর কারাকুল হ্যাট। সবাই হেসে উঠেছিল। তারপর বাবা বক্তৃতা দেওয়ার সময় উঠে দাঁড়িয়ে তালি দিয়েছে। এখন সেটা আরেকটা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। বাবার খরচ করা সব টাকা, নকশার পেছনে কাটানো সব রাত, প্রত্যেকটা ইট, প্রত্যেকটা বীম, ঠিকমতো লাগানো হয়েছে নিশ্চিত করার জন্যে বারবার কন্সট্রাকশন সাইটে যাওয়া...

"কোল্যাটারাল ড্যামেজ," বলল রহিম খান। "আমির জান, ওই এতীমখানার ধ্বংসস্তূপের ভেতর খোঁজ করাটা যে কেমন ছিল জানতে চেয়ো না। ছোটছোট বাচ্চাদের দেহের অংশ পড়ে ছিল..."

"তো, তালিবানরা যখন এল..."

"ওরা ছিল বীর," বলল রহিম খান।

"অবশেষে শান্তি।"

"হ্যাঁ, আশা এক বিচিত্র জিনিস। অবশেষে শান্তি। কিন্তু তার বিনিময়ে চুকানো দাম?" প্রবল কাশিতে কেঁপে উঠল রহিম খানের পুরো শরীর। ওর শীর্ণ শরীরটা সামনে পেছনে দোল খেতে লাগল। রুমালে কফ মোছার পর দেখা গেল সেখানে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। আমার মনে হল এটাই আমাদের সঙ্গে একই ঘরে ঘামতে থাকা হাতিটাকে সম্বোধন করার উপযুক্ত সময়।

"তুমি কেমন আছ?" জিজ্ঞেস করলাম। "মানে, *সত্যি সত্যি* কেমন আছ তুমি?"

"আসলে মরতে বসেছি," ঘরঘরে গলায় বলল ও। আবার শুরু হল কাশি। রুমালে আরও রক্ত। মুখ মুছল ও। জামার হাতায় একটা শীর্ণ ভুরুর ঘাম মুছল। ও মাথা দোলালে বুঝে গেলাম আমার চেহারা থেকেই পরের প্রশ্নটা বুঝে নিয়েছে। "বেশী দিন না।" দম নিল ও।

"কতদিন?"

BanglaBook.org

কাঁধ ঝাঁকাল ও। আবার কাশল। "মনে হয় না এবারের গ্রীষ্মের শেষ দেখে যেতে পারব।"

"আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে দাও তোমাকে। ভালো কোনও ডাক্তার দেখাব। সারাক্ষণই নতুন নতুন চিকিৎসার উপায় বের করছে ওরা। নতুন ওষুধ আর পরীক্ষামূলক নানা ওষুধ রয়েছে। তোমাকে কোনও..." জানি আবোল তাবোল বকছিলাম আমি। কিন্তু কান্নার চেয়ে এটা ঢের ভালো ছিল। অবশ্য সেটাই হয়ত করতে যাচ্ছি আমি এমনিতেও।

প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ল ও। দাঁতহীন নিচের পাটি বের হয়ে পড়ল। এমন ক্লান্ত হাসি আর দেখিনি আমি। "বুঝতে পারছি আমেরিকা তোমাকে তার আশাবাদ দিয়ে প্রভাবিত করেছে। এটাই তাকে এত বড় করে তুলেছে। এটা খুবই ভালো। আমরা আফগানরা আবার বিষণ্ন মানুষ, তাই না? আমরা প্রায়ই *গামখোরি* আর নিজের উপর করুণা করে বিলাপ করি। আমরা ক্ষতি, ভোগান্তির কাছে হার স্বীকার করে নিই, একে জীবনের বাস্তবতা হিসাবে মেনে নিই। একে এমনকি অনিবার্য *যেন্দাগি মিগযারা* বলি আমরা। জীবন এগিয়ে চলে। কিন্তু আমি এখানে নিয়তির কাছে হার মেনে নেব না। আমি বাস্তববাদী। এখানে বেশ কয়েকজন ভালো ডাক্তার দেখিয়েছি। ওরা একই জবাব দিয়েছে। আমি ওদের বিশ্বাস করেছি। ওদের উপর আমার আস্থা আছে। এটা আল্লাহর ইচ্ছের মতোই একটা ব্যাপার।"

"তুমি কী করছ আর কী করছ না, এছাড়া আর কিছুই নেই," বললাম।

হাসল রহিম খান। "এখন ঠিক বাবার মতো কথা বলছ তুমি। ওর কথা অনেক মনে পড়ে। কিন্তু এটা আল্লাহরই ইচ্ছে, আমির জান। সত্যিই।" একটু থামল সে। "তাছাড়া, তোমাকে এখানে আসতে বলার পেছনে আরেকটা কারণ আছে। আমি চলে যাবার আগে তোমাকে দেখতে চেয়েছি বটে, তবে অন্য ব্যাপারও আছে।"

"যে কোনও কিছু।"

"তুমি তো জান তোমরা চলে যাবার পর এতগুলো বছর তোমাদের বাড়িতেই ছিলাম আমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি একেবারে একা ছিলাম না। হাসান ছিল আমার সঙ্গে।"

"হাসান," বললাম। শেষ কবে ওর নাম উচ্চারণ করেছি আমি? সেই পুরোনো অপরাধের কাঁটাগুলো আবার আঘাত হানল আমাকে। যেন ওর নাম উচ্চারণ করামাত্র একটা ঘোর কেটে গেছে, আমাকে আবার নতুন করে নির্যাতন

BanglaBook.org

করার জন্যে মুক্ত করে দিয়েছে ওগুলোকে। হঠাৎ করেই রহিম খানের ফ্ল্যাটের হাওয়া বাতাস যেন অসম্ভব ভারি হয়ে উঠল। রাস্তার গন্ধ আর গরমে বড় বেশী কড়া।

"আমি আগেও চিঠি লিখে তোমাকে জানানোর কথা ভেবেছি। কিন্তু তুমি জানতে চাও কিনা নিশ্চিত ছিলাম না। আমার কি ভুল হয়েছে?"

সত্যি কথা হচ্ছে, না। মিথ্যে হচ্ছে, হ্যাঁ। মধ্যবর্তী একটা কিছু বেছে নিলাম আমি। "জানি না।"

কেশে রুমালে আরেক দফা রক্ত ফেলল ও। থুতু ফেলার জন্যে যখন সমানে ঝুঁকল, তার চাঁদিতে মৌচাকের মতো ঘা দেখতে পেলাম। "তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব বলে তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি। আমার জন্যে একটা কাজ করতে বলব তোমাকে। কিন্তু তার আগে তোমাকে হাসানের কথা বলতে চাই। বুঝতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ," বিড়বিড় করে বললাম।

"তোমাকে ওর কথা বলতে চাই। সব কিছু বলতে চাই। শুনবে?"

মাথা দোলালাম।

আরেকটু চা খেল রহিম খান। দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে তারপর বলতে শুরু করল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ষো ল

১৯৮৬ সালে আমার হাসানের খোঁজে হাযারাজাতে যাবার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। সবচেয়ে বড় কারণ, আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেন, আমি ছিলাম একা। ততদিনে বেশীর ভাগ আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব হয় খুন হয়ে গেছে নয়ত দেশ ছেড়ে পাকিস্তান বা ইরানে পালিয়ে গেছে। কাবুলের আর কাউকে তেমন একটা চিনতাম না আমি। অথচ এই শহরেই গোটা জীবন কাটিয়েছি আমি। সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। কার্থে-পারওয়ান এলাকায় হাঁটতাম আমি–আগের দিনে এখানে তরমুজঅলাদের আনাগোনা ছিল। জায়গাটার কথা মনে আছে তোমার? কিন্তু ওখানে কাউকেই চিনতে পারতাম না। সম্বোধন করার মতো কেউ নেই। *চায়ে* খাওয়ার জন্যে একসঙ্গে বসবে এমন কেউ ছিল না। কারও সঙ্গে গল্প করার উপায় নেই। কেবল *রাউসি* সৈনিকরা রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। তো শেষ পর্যন্ত ওখানে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম আমি। তোমার বাবার বাড়িতেই দিন কাটাতাম। তোমার মায়ের বইগুলো পড়তাম। খবর শুনতাম। টেলিভিশনে কমিউনিস্ট প্রপাগান্ডা শুনতাম। তারপর *নামায* পড়তাম। একটা কিছু রান্না করে খেতাম। আরও কিছু পড়াশোনা করে ফের *নামায* পড়তাম। শুতে যেতাম তারপর। সকালে ঘুম থেকে উঠে *নামায* পড়তাম। এই কাজই করতে হত বারবার।

আর্থ্রাইটিসের কারণে বাড়ি দেখেশুনে রাখা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছিল। আমার হাঁটু আর পিঠে সারাক্ষণই ব্যথা করত। সকালে ঘুম থেকে উঠতাম আমি, তারপর গায়ের জোড়া থেকে আড়ষ্টতা দূর করতে কমপক্ষে

BanglaBook.org

একটা ঘণ্টা লেগে যেত। বিশেষ করে শীতের দিনে। তোমার বাবার বাড়িটাকে পচে যেতে দিতে যেতে চাইনি আমি। ওই বাড়িতে আমরা সবাই অনেক ভালো সময় কাটিয়েছি। অনেক স্মৃতি আছে বাড়িটাকে ঘিরে, আমির জান। এটা ঠিক ছিল না-তোমার বাবা নিজের হাতে বাড়িটার নকশা করেছিল। ওর কাছে অনেক মূল্যবান ছিল এটা। তাছাড়া, ওকে আমি কথা দিয়েছিলাম তুমি আর ও পাকিস্তানে চলে যাবার পর আমি বাড়িটা দেখে রাখব। এখন কেবল আমি আর বাড়িটা...আমি আমার সাধ্যমতো করেছি। কয়েকদিন পর পর গাছে পানি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। লনের ঘাস কেটেছি। ফুলের দেখভাল করেছি। মেরামতের দরকার ছিল যেসবের, মেরামত করেছি। কিন্তু তখনও আমি আর যুবক ছিলাম না।

কিন্তু তারপরেও হয়ত সামলে উঠতে পারতাম। অন্তত আরও কিছুদিন। কিন্তু তোমার বাবার মৃত্যুর খবর যখন কানে এল...প্রথমবারের মতো ওই বাড়িতে প্রচণ্ড এক ধরনের নৈঃসঙ্গ বোধ হল আমার। অসহনীয় এক শূন্যতা।

তো একদিন আমি বুইকে তেল ভরে হাযারাজাতে চলে গেলাম। আলি বাড়ি থেকে স্বেচ্ছায় চলে যাবার পর তোমার বাবার কাছে শুনেছিলাম সে আর হাসান বামিয়ানের বাইরেই একটা ছোট গ্রামে বসতি করেছে। কথাটা আমার মনে ছিল। মনে ছিল আলির এক চাচাত ভাই থাকত ওখানে। হাসান তখনও ওখানে থাকবে এমন কোনও ধারণা ছিল না আমার। শতহোক, আলি আর হাসান তোমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর দশ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। ১৯৯৬ সালে হাসানের তাগড়া জোয়ানমর্দ হয়ে ওঠার কথা। বাইশ-তেইশ বছর বয়স। মানে যদি বেঁচে থাকে আরকি। *শোরোভিরা*-ওরা আমাদের *ওয়াতানকে* যা করেছে সেজন্যে যেন অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়ে মরে-আমাদের এত যুবক হত্যা করেছে। এসব তোমাকে বলার দরকার নেই আমার।

কিন্তু খোদার রহমতে ওখানেই পেয়ে গেলাম ওকে। তেমন একটা খোঁজ-খবর করার দরকার পড়েনি। বামিয়ানে কয়েকজনকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে হয়েছে, ব্যস। ওরাই ওদের গ্রাম চিনিয়ে দিয়েছে। গ্রামটার নাম পর্যন্ত মনে নেই আমার। কিংবা আদৌ কোনও নাম ছিল কিনা। কিন্তু এটা মনে আছে দিনটা ছিল গ্রীষ্মের এক গা পোড়ানো দিন। একটা মেঠো পথে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। দুপাশে ঝোপঝাড়, গ্রন্থিল কাঁটাঅলা গাছের গুঁড়ি, শুকনো ঘাসের মতো খড় ছাড়া আর কিছু নেই। রাস্তার পাশে একটা পচতে থাকা গাধার মরদেহ পার হলাম আমি। তারপর একটা বাঁক ঘুরলাম। ঘরবাড়ির একটা জটলা চোখে পড়ল। ওগুলোর ওপাশে আকাশ আর পাহাড়ের কাঁটার মতো চূড়া ছাড়া

আর কিছু নেই।

বামিয়ানের লোকজন আমাকে বলেছিল ওকে সহজেই খুঁজে পাব আমি–গ্রামের দেয়াল ঘেরা একমাত্র বাগানঅলা বাড়িতে থাকে ও। খাট, ফুটোয় ভর্তি কাদার দেয়াল ছোট বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। আসলে সুন্দর করে তোলা একটা কুঁড়ে ছাড়া আর কিছু নয় ওটা। নগ্ন পায়ের ছেলেরা রাস্তায় খেলছিল। একটা লাঠি দিয়ে বিধ্বস্ত একটা টেনিস বলে বাড়ি হাঁকাচ্ছিল ওরা। আমি গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করতেই চোখ তুলে তাকাল ওরা। আমি কাঠের দরজায় নক করে উঠোনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। উঠোনে একটা শুকনো স্ট্রবেরির কেয়ারি আর একটা নগ্ন লেবু গাছ ছাড়া তেমন কিছু নেই। একটা বাবলা গাছের ছায়ায় একটা তন্দুর চোখে পড়ল, একজন লোক বসে আছে ওটার পাশে। একটা বড় কাঠের হাতার উপর ময়দার তাল রেখে তন্দুরের ভেতরের দেয়ালে সেঁটে দিচ্ছে সেটা। আমাকে দেখে ময়দার তালটা রেখে দিল সে। ওকে আমার হাতে চুমু খেতে বাধ্য করলাম।

“তোমাকে একটু দেখতে দাও,” বললাম। একদম পিছিয়ে গেল ও। এখন লম্বা হয়েছে–পায়ের আঙুলের উপর দাঁড়িয়েও ওর চিবুকের কাছে পৌঁছেছি কোনওমতে। বামিয়ানের সূর্য ওর চামড়া কঠিন করে তুলেছে। আমার যেমন মনে পড়ে তারচেয়ে বেশ কয়েক পোচ ঘন হয়ে উঠেছে। সামনের কয়েকটা দাঁত খুইয়েছে ও। থুতনিতে অল্প কয়েক গোছা দাড়ি দেখা যাচ্ছে। এছাড়া সেই আগের মতোই আছে ওর পাতলা সংকীর্ণ চোখ, উপরের ঠোঁটে কাটাদাগ, গোল চেহারা, অমায়িক হাসি, এসব সেই আগের মতোই আছে। আমির জান তুমিও ওকে চিনতে পারতে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।

ভেতরে গেলাম আমরা। রুমের এক কোণে শ্যামলা বর্ণের এক হাযারা মেয়ে একটা শাল সেলাই করছিল। স্পষ্টই অন্তঃসত্ত্বা ছিল সে। “এটা আমার বউ, রহিম খান,” গর্বের সঙ্গে বলল হাসান। “ওর নাম ফারজানা জান।” লাজুক ধরনের মহিলা, এত ভদ্র যে যখন কথা বলল ফিসফিস করে কথা বলছে বলে মনে হল, শোনা যায় কি যায় না। আমার দিকে সুন্দর কটা চোখ তুলে তাকায়নি পর্যন্ত। কিন্তু হাসানের দিকে তাকানোর সময় মনে হচ্ছিল যেন *আর্গ*-এর সিংহাসনে বসে আছে ও।

“কবে আসছে বাচ্চাটা?” অ্যাডোবের রুমে বসার পর জানতে চাইলাম। একটা ক্ষয়ে যাওয়া গালিচা, গোটা কয়েক থালাবাসন, একজোড়া তক্তপোষ আর একটা হারিকেন ছাড়া আর কিছু নেই ঘরে।

“*ইনশাল্লাহ*, এবারের শীতে,” বলল হাসান। “বাবার নাম বইবার জন্যে

BanglaBook.org

একটা ছেলের জন্যে দোয়া করছি আমি।"

"আলির কথা বলছ, সে কোথায়?"

দৃষ্টি নামিয়ে নিল হাসান। বলল, আলি আর ওর চাচাত ভাই–এই বাড়ির মালিক ছিল–দুবছর আগে ল্যান্ড মাইনের আঘাতে মারা গেছে। বামিয়ানের ঠিক বাইরে। ল্যান্ড মাইন। মরার আর কোনও আফগান কায়দা আছে, আমির জান? কেন যেন আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, আলির ডান পা–পোলিও আক্রান্ত বাঁকা ডান পাটাই–শেষ পর্যন্ত ওর সঙ্গে বেঈমানি করেছে। মাইনে পা দিয়ে ফেলেছে ও। আলি মারা গেছে শুনে খুব দুঃখ লাগল আমার। তুমি জান, তোমার বাবা আর আমি এক সঙ্গে বেড়ে উঠেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে আলিকে ওর সঙ্গেই দেখেছি আগাগোড়া। মনে আছে, আমরা যখন খুব ছোট, পোলিওতে পড়ে আলি। মরতে বসেছিল প্রায়। তোমার বাবা সারা বাড়ি কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াত।

সিম, শালগম আর আলুর *শুরুয়া* বানিয়ে দিল আমাদের ফারজানা। আমরা হাত ধুয়ে *তন্দুর* থেকে টাটকা *নান* বের করে ঝোলে ডুবিয়ে খেলাম। কয়েক মাসের ভেতর এত ভালো খাবার জোটেনি আমার কপালে। এই সময় হাসানকে আমার সঙ্গে কাবুলে যাবার কথা বললাম আমি। বাড়ির কথা জানালাম ওকে, বললাম কীভাবে একা ওটার দেখাশোনা করছি। বললাম ওকে ভালো মজুরি দেব। সে আর তার খানুম ভালো থাকবে। ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, কিন্তু জবাব দিল না। পরে আমরা হাত মুখ ধুলে ফারজানা আমাদের আঙুর পরিবেশন করার পর হাসান বলল *এখন গ্রামই* ওর বাড়ি। এখানে ও আর ফারজানা একটা জীবন গড়ে নিয়েছে।

"বামিয়ান এত নিবিড়। এখানকার লোকজনকে আমরা চিনি। আমাকে মাফ করবে, রহিম খান। আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ।"

"নিশ্চয়ই," বললাম আমি। "মাফ চাইবার কিছুই নেই তোমার। আমি বুঝতে পেরেছি।"

শুরুয়া খাওয়া শেষে চা খাওয়া অর্ধেক শেষ হয়েছে, ওকে তোমার আমেরিকায় চলে যাবার কথা বললাম। তবে এর বেশী আর কিছু জানি না আমি। তোমার সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন ছিল হাসানের মনে। তুমি বিয়ে করেছ কিনা? এখনও ঘুড়ি ওড়াও কিনা? সিনেমায় যাও কিনা? তোমরা সুখে আছ কিনা? আমাকে ও বলল বামিয়ানে এক বুড়ো ফারসি টিচারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে ওর। ওকে সে লিখতে আর পড়তে শিখিয়েছে। একটা চিঠি লিখলে আমি সেটা তোমার কাছে পাঠাতে পারব কিনা। তুমি পাল্টা জবাব দেবে কিনা। তোমার

BanglaBook.org

বাবার সাথে অল্প কয়েকটা ফোনালাপের ভিত্তিতে যা যা জানতাম বললাম ওকে, কিন্তু বেশীরভাগেরই উত্তর কীভাবে দিতে হবে জানা ছিল না । তারপর তোমার বাবার কথা জানতে চাইল ও। যখন বললাম, দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল হাসান। বাকি রাত ছোট শিশুর মতো কাঁদল ও।

ওদের সাথে রাত কাটানোর জন্যে জোর করল ওরা। ফারজানা আমার জন্যে একটা খাটিয়ায় বিছানা পেতে দিল, যদি পিপাসা লাগে, সেজন্যে এক গ্লাস পানিও দিল ও। সারা রাত হাসানের ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ পেলাম। ফারজারা ওকে ফিসফিস করে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল।

সকালে হাসান আমাকে বলল সে আর ফারজানা আমার সঙ্গে কাবুলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

"আমার এখানে আসাই উচিত হয়নি," বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছ, হাসান জান। এখানে তোমার একটা *যিন্দেগী* আছে। হুট করে এসে তোমাকে সব কিছু ফেলে আমার সঙ্গে যেতে বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। আমাকেই মাফ করে দিয়ো।"

"এখানে এমন কিছু নেই আমাদের, রহিম খান," বলল হাসান। তখন লাল আর ফোলা ফোলা ছিল ওর চোখজোড়া। "আমরা তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। বাড়িটার দেখভাল করার কাজে তোমাকে সাহায্য করব আমরা।"

"তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত তো?"

মাথা দুলিয়ে নিচের দিকে তাকাল ও। "আগা সাহিব আমার কাছে দ্বিতীয় বাবার মতো ছিল...খোদা তার আত্মাকে শান্তি দিন।"

একটা জীর্ণ চাদরের উপর সামান্য জিনিসপত্র জড়ো করল ওরা, তারপর চারকোনা একসঙ্গে জুড়ে গিঁট মারল। বান্ডিলটা বুইকের পেছনে তুলে দিলাম আমরা। বাড়ির চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মাথার উপর কোরান শরীফ ধরে রাখল হাসান। আমরা সবাই সেটায় চুমু খেলাম। বের হয়ে এলাম ওটার নিচ দিয়ে। তারপর কাবুলের পথ ধরলাম। মনে আছে আমরা যখন চলে আসছি, ওদের বাড়ি দেখার জন্যে পেছনে তাকিয়ে ছিল হাসান।

কাবুলে পৌঁছানোর পরে দেখলাম বাড়ির ভেতরে ঢোকার কোনওই ইচ্ছে নেই হাসানের। "কিন্তু সবগুলো রুম তো খালিই পড়ে আছে, হাসান জান। ওখানে তো কেউই আর থাকতে যাচ্ছে না," বললাম আমি।

কিন্তু কিছুতেই ভেতরে গেল না ও। বলল এটা একটা *ইহতিরাম*-সম্মান-এর ব্যাপার। ফারজানা আর ও জিনিসপত্র পেছনের সেই কুড়েটায় নিয়ে গেল, যেখানে ওর জন্ম হয়েছিল। ওপরতলার একটা গেস্টরুমে

BanglaBook.org

উঠে আসার জন্যে অনেক অনুরোধ করেছি ওদের। কিন্তু কিছুতেই আমার কথা শুনতে রাজি হল না হাসান। "আমির আগা কী ভাববে?" আমাকে বলেছে ও। "যুদ্ধের পর কাবুলে ফিরে এসে আমাদের এখানে দেখলে কী ভাববে ও? ভাববে না যে আমি ওর জায়গা দখল করে নিয়েছি?" তারপর তোমার জন্যে শোকে পরের চারদিন কালো পোশাক পরেছিল হাসান।

আমি চাইনি, কিন্তু ওরা দুজনই সব রান্নাবান্নার কাজ করতে লাগল। ধোয়ামোছার কাজও। বাগানের দেখাশোনা করল হাসান। শেকড়গুলোকে আবার ভিজিয়ে তুলল। হলদে হয়ে আসা পাতা ফেলে দিল। নতুন করে গোলাপ গাছ লাগাল। দেয়াল রঙ করল ও। বাড়ির ভেতরে অনেক বছর কেউ ঘুমায় না এমন রুমগুলোও ঝাড়ু দিল। কেউ গোসল করে না সেইসব বাথরুমও পরিষ্কার করে রাখতে লাগল। যেন কারও ফিরে আসার জন্যে বাড়িটাকে তৈরি করছিল। আমির জান, তোমার বাবা যে ভূট্টা লাগিয়েছিল সেটার পেছনের দেয়ালের কথা তোমার মনে আছে? তুমি আর হাসান যেন কী বলতে ওটাকে? "রোগা ভূট্টার দেয়াল"? সেই ফলের গোড়ার দিকে একটা রকেট পুরো দেয়ালটাকে শেষ করে দিয়েছিল। নিজের হাতে ইটের পর ইট বসিয়ে আবার সেই দেয়ালটা বানায় হাসান। পুরো দেয়ালটা ফের না দাঁড়ানো পর্যন্ত। ও না থাকলে আমি যে কী করতাম জানি না।

তারপর সেই ফলের শেষের দিকে ফারজানা একটা মরা বাচ্চার জন্ম দিল। হাসান বাচ্চাটার প্রাণহীন মুখে চুমু খেয়ে ওটাকে পেছনের উঠোনে সুইটব্রাইয়ার ঝোপের কাছে কবর দিল। পপলার পাতায় ছোট ঢিবিটাকে ঢেকে দিয়েছিলাম আমরা। মেয়েটার জন্যে দোয়া করেছি আমি। সারা দিন ঘরের ভেতরে থেকে বিলাপ করে কাঁদল ফারজানা। কোনও মায়ের বিলাপের হৃদয় বিদারক আওয়াজ ছিল সেটা, আমির জান। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তোমাকে যেন কোনও দিন এই আওয়াজ শুনতে না হয়।

ওই বাড়ির দেয়ালের বাইরে একটা যুদ্ধ চলছিল। কিন্তু তোমার বাবার বাড়ির ভেতরে আমরা তিনজন নিজেদের একটা আশ্রয় গড়ে নিয়েছিলাম। ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে আমার নজর কমে আসতে শুরু করল। তো হাসানের মুখে তোমার মায়ের বইগুলো শুনতাম আমি। ফয়েতে চুলোর পাশে বসতাম আমরা। আমাকে খৈয়াম বা মসনাবি থেকে পড়ে শোনাত হাসান। অন্যদিকে রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত থাকত ফারজানা। রোজ সকালে সুইটব্রাইয়ার ঝোপের সেই ঢিবিটার উপর ফুলের তোড়া রেখে আসত হাসান।

১৯৯০ সালের গোড়ার দিকে ফারজ্যানা আবার প্রেগনেন্ট হল। সেই বছরই

BanglaBook.org

গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি একদিন সকালে আকাশী নীল রঙের *বুরকা* পরা এক মহিলা এসে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ল। আমি সামনের গেইটে গিয়ে দেখি টলছে মহিলা। যেন দাঁড়িয়ে থাকার শক্তিটুকুও নেই তার। কী চায় সে, জানতে চাইলাম। কিন্তু জবাব দিল না সে।

"কে তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু দোরগোড়াতেই স্রেফ লুটিয়ে পড়ল সে। চিৎকার করে হাসানকে ডাকলাম আমি। তারপর ঘরের ভেতর নিয়ে গেলাম ওকে। লিভিং রুমে নিয়ে এলাম। ওকে সোফায় শুইয়ে দিয়ে *বুরকা*টা খুলে ফেললাম। দেখলাম পাকাচুল দাঁতহীন এক মহিলা। হাতে ক্ষত চিহ্ন রয়েছে তার। দেখে মনে হচ্ছিল যেন কয়েকদিন ধরে পেটে দানাপানি পড়েনি। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ দশা ছিল তার চেহারার। কেউ একজন ছুরি দিয়ে...আমির জান, ছুরি দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটা হয়েছে। একটা দাগ চলে গেছে হনুর হাড় থেকে চুল পর্যন্ত, যাবার পথে বাম চোখটাকে রেহাই দেয়নি। ভয়াবহ দৃশ্য। ভেজা কাপড় কপালের উপর বোলাতেই চোখ মেলে তাকাল সে। "হাসান কোথায়?" ফিসফিস করে জানতে চাইল।

"আমি এখানে," বলল হাসান। ওর হাত ধরে চাপ দিল সে।

ভালো চোখটা ফিরল ওর দিকে। "অনেক দূর থেকে এসেছি আমি তোমাকে দেখতে, তুমি স্বপ্নে যেমন সুন্দর বাস্তবেও তেমন সুন্দর কিনা দেখতে। আসলেও তাই। আরও বেশী।" হাতটা টেনে নিয়ে বিক্ষত মুখে ছোঁয়াল সে। "আমার জন্যে একটু হাসো।"

হাসল হাসান। কেঁদে উঠল মহিলা। "তোমার হাসিটা আমার মতো। কথাটা তোমাকে কেউ বলেছে কখনও? অথচ আমি কখনও তোমাকে কোলে পর্যন্ত নিইনি। আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে দেন। আমি তোমাকে কোলে পর্যন্ত নিইনি।"

১৯৬৪ সালে একদল গায়ক আর নাচিয়ের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর আমরা কেউই আর সানোবারকে দেখিনি। হাসানকে জন্ম দেওয়ার পরপরই পালিয়ে যায় সে। আমির, তুমি তাকে কখনও দেখনি। কিন্তু যুবা বয়সে দেখার মতো ছিল সে। হাসলে ওর গালে টোল পড়ত। ওর হাঁটা দেখলে বহু লোকের মাথা খারাপ হয়ে যেত। পুরুষ হোক বা মেয়ে হোক কেউই ওর দিকে দ্বিতীয়বার না তাকিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে পারত না। অথচ এখন...

হাসান তার হাত ছেড়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেল। ওর পেছন পেছন গেলাম আমি। কিন্তু খুব জোরে ছুটছিল ও। ওকে দৌড়ে পাহাড়ে উঠে যেতে দেখলাম। ওখানে তোমরা খেলতে। ওর পায়ের ঘায়ে ধুলো

BanglaBook.org

উড়ছিল। ওকে যেতে দিলাম। সানোবারের সঙ্গে সারাদিন বসে রইলাম আমি। এদিকে উজ্জ্বল নীল থেকে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করল আকাশ। তখনও ফেরেনি হাসান। রাত নেমে এল, চাঁদের আলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল মেঘের দল। সানোবার কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল ফিরে আসাটাই ভুল হয়েছে। হয়ত বেঁচে থাকার চেয়েও খারাপ। কিন্তু ওকে আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে রেখে দিলাম। হাসান ফিরে আসবে। জানতাম।

পরের দিন সকালে ফিরে এল ও। ক্লান্ত আর পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল ওকে। যেন সারা রাত ঘুমায়নি। দুই হাতে সানোবারের হাত তুলে নিল ও। বলল চাইলে সে কাঁদতে পারে, কিন্তু কাঁদতে পারল না। এখন বাড়ি ফিরে এসেছে সে, বলল হাসান, বাড়িতে নিজের পরিবারের কাছে। ওর ক্ষতবিক্ষত মুখ স্পর্শ করল ও; ওর চুলে হাত বোলাল।

হাসান আর ফারজানা যত্নআত্তি করে আবার ওর স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনল। ওকে খাইয়ে দিল ওরা। ওর কাপড়চোপড় ধুয়ে দিল। ওকে ওপরতলার একটা গেস্ট রুম ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি। অনেক সময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতাম হাসান আর ওর মা এক সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে টমেটো বা ঢেঁড়শ তুলছে আর কথা বলছে। আমার মনে হয়েছে, শেষের এই বছরগুলো পূর্ণ করে নিচ্ছিল ওরা। আমার যতদূর জানা আছে, সে কোথায় ছিল বা কেন চলে গিয়েছিল কখনও ওকে জিজ্ঞেস করিনি হাসান। সেও বলেনি। আমার ধারণা কিছু কিছু কথা আছে যেগুলো না বলাই ভালো।

১৯৯০ সালের শীতে সানোবারই হাসানের ছেলেকে পৃথিবীর আলো দেখাল। তখনও তুষার শুরু পাত হয়নি, তবে উঠোনে শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ফলের কেয়ারি নুয়ে পড়ছে, পাতায় ঝিরঝির শব্দ তুলছে। মনে আছে নাতীকে কোলে করে কুঁড়ে থেকে বের হয়ে এসেছিল সানোবার। একটা উলের চাদরে মুড়ে রেখেছিল তাকে। ম্লান ধূসর আকাশের নিচে উজ্জ্বল চেহারায় দাঁড়িয়েছিল সে। ওর গাল বেয়ে জল গাড়চ্ছিল। সুইয়ের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া ওর চুল উড়িয়ে নিচ্ছিল। বাচ্চাটাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছিল সে যেন কখনও ছেড়ে দেবে না। ওকে হাসানের কোলে তুলে দিল সে। হাসান দিল আমার কাছে। ছোট ছেলেটার কানে *আয়াত-উল-কুরসি* তেলাওয়াত করলাম আমি।

হাসানের প্রিয় নায়ক *শাহনামার* সোহরাবের নামে ছেলেটার নাম রাখল ওরা। তুমি জান সেটা, আমির জান। খুবই সুন্দর ছিল ছেলেটা, একেবারে চিনির মতো মিষ্টি। বাবার মতোই মেজাজ-মর্জি। বাচ্চাটাকে নিয়ে সানোবারের কাজকারবার যদি দেখতে, আমির জান। ওর জীবনের মূল বিষয়ে পরিণত হল

BanglaBook.org

ছেলেটা। ওর জন্যে জামা সেলাই করেছে সে, কাঠের টুকরো, ন্যাকড়া, আর শুকনো ঘাস দিয়ে খেলনা বানিয়ে দিয়েছে। একবার ছেলেটার জ্বর হলে সারারাত জেগে ছিল সে। তিনদিনের জন্যে *রোজা* রেখেছে। *নজর* লাগা ঘোচাতে একটা স্কিলেটের উপর *ইসফান্দ* জ্বালিয়েছে। সোহরাবের বয়স দুই বছর হতে হতে ওকে *সে সাসা* বলে ডাকতে শুরু করল। ওরা দুজন ছিল মানিকজোড়ের মতো।

ছেলেটার বয়স চার বছর হওয়া পর্যন্ত বেঁচে ছিল সে। তারপর একদিন সাকালে আর ঘুম থেকে জাগল না। ওকে দেখে খুবই শান্ত মনে হয়েছে। যেন এই অবস্থায় মরতে তার খারাপ লাগেনি। ওকে পাহাড়ের উপরে ডালিম গাছের পাশের কবরস্থানে মাটি দিয়েছি আমরা। ওর জন্যেও দোয়া করেছি আমি। হাসানের জন্যে এই ক্ষতিটা ছিল মারাত্মক। গোড়াতে না পেয়ে পরে পেয়ে হারানোর দুঃখ সব সময়ই বেশী হয়। কিন্তু ছোট্ট সোহরাবের পক্ষে ক্ষতিটা ছিল আরও বেশী কঠিন। সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াত ও। *সাসাকে* খুঁজত। কিন্তু বাচ্চারা কেমন হয়, জানো তো, খুব তাড়াতাড়িই ভুলে যায় ওরা।

ততদিনে–১৯৯৫ সালের দিকে হবে–*শোরোভিরা* পরাস্ত হয়েছে, বেশ আগেই বিদায় হয়ে গেছে ওরা। কাবুলের দখল এখন মাসুদ, রাব্বানি, আর *মুজাহিদিনদের* হাতে। বিভিন্ন উপদলের মধ্যে সংঘাত ছিল ভয়ঙ্কর। কারও জানার উপায় ছিল না দিনের শেষ দেখার জন্যে সে বেঁচে থাকবে কিনা। পড়ন্ত শেলের শব্দ আর বন্দুকের অবিরাম গর্জনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল আমাদের কান। ধ্বংস স্তূপের ভেতর থেকে মানুষের দেহাবশেষ বের করে আনার দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল আমাদের চোখ। সেই সব দিনে কাবুল, আমির জান, গল্পের সেই নরকতুল্য পৃথিবীর একেবারেই কাছাকাছি একটা দৃশ্য ছিল। তবে আল্লাহ আমাদের উপর *রহম* করেছেন। ওয়াযির আকবার খান এলাকা তেমন একটা আক্রান্ত হয়নি। তো আমাদের অন্যান্য পড়শীর মতো অত খারাপ অবস্থা হয়নি আমাদের।

সেইসব দিনে রকেট ফায়ার থেমে গেলে আর গুলির শব্দ একটু কমে এলে সোহরাবকে মারজানকে দেখানোর জন্যে চিড়িয়াখানায় চলে যেত বা সিনেমা দেখতে যেত হাসান। ওকে গুলতি চালানোর কায়দা শিখিয়েছিল ও। পরে, সোহরাবের বয়স যখন আট, ওটা নিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল সোহরাব। টেরেসে দাঁড়িয়ে উঠোনের উল্টোদিকে মাঝামাঝি কোথাও বালতির উপর রাখা পাইনের মোথাকে লাগাতে পারত ও। হাসান ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। নিজের মতো অশিক্ষিত হয়ে বেড়ে উঠবে না ওর ছেলে। ওকে প্রথম হাঁটতে শিখতে দেখেছি,

BanglaBook.org

প্রথম কথা বলতে দেখেছি। সিনেমা পার্কের পাশের বুকস্টোর থেকে সোহরাবের জন্যে বই কিনে এনে দিয়েছি আমি। ওটাও এখন ধ্বংস করে দিয়েছে ওরা। আনা মাত্র সেগুলো শেষ করে ফেলত সোহরাব। ছেলেটা আমাকে তোমার কথা মনে করিয়ে দিত, আমির জান। অনেক সময় রাতে ওকে পড়ে শোনাতাম আমি। ওর সঙ্গে ধাঁধার খেলা খেলতাম। ওকে কার্ডের খেলা শেখাতাম। ওর কথা অনেক মনে পড়ে আমার।

শীতকালে ছেলেকে ঘুড়ির পেছনে দৌড়ানো শেখাত হাসান। আগের দিনের মতো তত ঘুড়ি ওড়ানোর টুর্নামেন্ট হত না। কেউই বেশীক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ মনে করে না। তবে কয়েকটা বিচ্ছিন্ন টুর্নামেন্ট হত বটে। সোহরাবকে কাঁধে তুলে নিত হাসান, তারপর রাস্তায় রাস্তায় দৌড়ে বেড়াত ওরা। ঘুড়ির পেছনে ছুটত। ঘুড়ি পড়েছে এমন সব গাছে উঠে বসত। তোমার মনে আছে আমির জান, হাসান কত ভালো ঘুড়ি ধাওয়াকারী ছিল? এখনও আগের মতোই আছে ও। শীতের শেষে হাসান আর সোহরাবরা শীতে ওদের কুড়োনো ঘুড়িগুলো মূল হলওয়ের দেয়ালে সাজিয়ে রাখত। পেইন্টিংয়ের মতো ঝুলিয়ে রাখত ওগুলো।

তোমাকে বলেছি, ১৯৯৬ সালে তালিবানরা আসার পর যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর আমরা কীভাবে উৎসব করেছিলাম। মনে আছে সেরাতে বাড়ি ফিরে হাসানকে রান্নাঘরে পেয়েছিলাম আমি। রেডিও শুনছিল ও। চোখে ছিল গম্ভীর দৃষ্টি। ওকে জিজ্ঞেস করলাম সমস্যা কী। স্রেফ মাথা নাড়ল ও। "এবার আল্লাহ ছাড়া হাযারাদের আর বাঁচানোর কেউ নেই, রহিম খান সাহিব," বলল ও।

"যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, হাসান," বললাম আমি। "এবার শান্তি নেমে আসবে, *ইনশাল্লাহ*। সুখ আর শান্তি। আর রকেট না, আর খুনখারাবি না, আর *কুলখানি* না!" কিন্তু স্রেফ রেডিওটা বন্ধ করে দিল ও। জিজ্ঞেস করল শুতে যাবার আগে আমাকে কিছু খেতে দেবে কিনা।

কয়েক সপ্তাহ পরে তালিবানরা ঘুড়ির লড়াই নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। এবং দুই বছর পর, ১৯৯৮ সালে মাযার-ই-শরীফে হাযারাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালাল।

সতের

পায়ের উপর থেকে পা নামাল রহিম খান, তারপর এমন সতর্ক আর হিসেবি কায়দায় পেছনের দেয়ালে হেলান দিল যেন জানে তার প্রত্যেকটা নড়াচড়াই তীব্র বেদনার কাঁটা ছড়িয়ে দেয়। বাইরে একটা গাধা হাঁক ছাড়ছে। উর্দুতে কি যেন চিৎকার করে বলছে কেউ। সূর্য পাটে যেতে বসেছে। জরাজীর্ণ দালানকোঠার ফাঁক-ফোকরে লাল আভা ঝলমল করছে।

সেই শীত আর পরের গ্রীষ্মে আমি কী করেছি তার বিশালত্ব আবার আঘাত করল আমাকে। নামগুলো আমার কানে বাজতে লাগল: হাসান, সোহরাব, আলি, ফারজানা আর সানোবার। রহিম খানের মুখে আলি নাম শোনাটা যেন ছিল অনেক দিন না-খোলা কোনও মিউজিক বক্স খুঁজে পাওয়া। নিমেষে সুরেলা ধ্বনি বের হতে শুরু করেছে: *আজ কি করেছ তুমি, বাবালু? কী খেয়েছ, চোখা চোখের বাবালু?* মনে মনে আলির শক্ত চেহারাটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। সত্যিই সত্যিই ওর অটল মুখটা দেখার জন্যে! কিন্তু সময় লোভী জিনিস হতে পারে—অনেক সময় জীবনের সমস্ত বিস্তার শুষে নেয়।

"হাসান কি এখনও ওই বাড়িতেই আছে?" জিজ্ঞেস বলাম।

চেপে বসা ঠোঁটের কাছে চায়ের কাপটা তুলে আনল রহিম খান। চুমুক দিল। তারপর বুক পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে আনল। আমার হাতে দিল ওটা। "তোমার জন্যে।"

মুখ বন্ধ খামটা খুললাম আমি। একটা পোলারয়েড ফটোগ্রাফ আর একটা ভাঁজ কার চিঠি পেলাম। ঝাড়া একটা মিনিট ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম আমি।

একটা রট আয়রন গেইটের সামনে ছোট একটা ছেলেকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী শাদা পাগড়ী আর সবুজ *চাপান* পরা এক লোক। বাম দিক থেকে তীর্যকভাবে এসে পড়েছে সূর্যের আলো। তার মোটাসোটা চোহারার অর্ধেক আলোকিত করে তুলেছে। চোখ কুঁচকে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে সে। এমনকি এই ঝাপসা পোলারয়েডেও *চাপান* পরা লোকটা আত্মবিশ্বাস আর অনায়াস একটা ভাব প্রকাশ করছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, সামান্য ফাঁক করে রেখেছে ও পাজোড়া, বুকের উপর আয়েসি ভঙ্গিতে আড়াআড়ি ভাঁজ করে রেখেছে দুই হাত, সূর্যের দিকে কিঞ্চিত কাত হয়ে আছে তার মুখটা। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তার হাসার ভঙ্গি। ছবির দিকে তাকিয়ে এখন যে কারও মনে হবে বুঝি এই লোকটার জীবন বেশ ভালোই কেটেছে। ঠিকই বলেছিল রহিম খান: রাস্তায় হুট করে দেখা হয়ে গেলেও চিনতে পারতাম ওকে। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছেলেটা। এক হাতে লোকটার উরু জড়িয়ে ধরে আছে, মোড়ানো মাথা বাবার কাঁধের উপর রাখা। সেও চোখ কুঁচকে হাসছে।

চিঠির ভাঁজ খুললাম আমি। ফারসিতে লেখা। কোনও বিন্দু বাদ পড়েনি, কোনও কাটা দাগ ভুলে যাওয়া হয়নি। কোনও শব্দ মিলে যায়নি। পরিচ্ছন্নতার বিচারে হাতের লেখা একেবারেই ছেলেমানুষের মতো। আমি পড়তে শুরু করলাম:

> পরম করুণাময়, পরম দাতা আল্লাহর নামে,
>
> আমির আগা, আমার গভীরতম শ্রদ্ধা জানাই তোমাকে।
>
> ফারাজানা জান, সোহরাব আর আমি দোয়া করি যেন এই শেষ চিঠিটা তোমাকে সুস্থ আর আল্লাহর করুণাময় আলোয় দেখতে পায়। এই চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে রহিম খানকে দয়া করে আমার ধন্যবাদ জানিয়ো। আমি আশায় আছি একদিন তোমার লেখা একটা চিঠি আমার হাতে আসবে। আমি আমেরিকায় তোমার জীবনের কথা পড়ব। এমনকি হয়ত তোমার একটা ফটোগ্রাফ আমার চোখজোড়াকে সার্থক করে তুলবে। তোমার সম্পর্কে ফারজানা জান আর সোহরাবকে অনেক কিছু বলেছি। আমাদের একসঙ্গে বেড়ে ওঠা, খেলাধুলা করা, রাস্তায় দৌড়ানো। আমি আর তুমি মিলে যতরকম দুষ্টুমি করেছি সেইসব গল্প!
>
> আমির আগা,
>
> দুঃখের কথা তোমার সেই ছেলেবেলার আফগানিস্তান অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এই দেশ থেকে দয়ামায়া উঠে গেছে। খুনখারাবি এড়ানোর আর

কোনও উপায় নেই। সারাক্ষণ খুনজখম চলছেই। কাবুলের সর্বত্র কেবল ভয়। স্টেডিয়ামে, মার্কেটে, এটা এখন আমাদের জীবনের একটা অংশে পরিণত হয়েছে। আমাদের *ওয়াতানকে* যেসব অসভ্যরা শাসন করছে, তারা মানুষের সম্ভ্রমকে কোনও মূল্য দেয় না। সেদিন ফারজানা জানকে নিয়ে বাজারে গিয়েছিলাম কিছু আলু আর *নান* কিনব বলে। ফেরিঅলাকে ও জিজ্ঞেস করল আলুর দাম কত পড়বে। কিন্তু আমাদের কথা কানেই তুলল না সে। আমার ধারণা কানে কম শোনে লোকটা। তো আবার তাকে দাম জিজ্ঞেস করল ও। তখন ছুট করে এক তালিব ছুটে এসে কাঠের লাঠি দিয়ে ওর উরুর উপর একটা বাড়ি মারল। এত জোরে যে, মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল ও। চিৎকার করে মুখ খিস্তি করে সে বলছিল অপরাধ আর সদগুনের মন্ত্রণালয় কোনও মেয়ের উঁচু গলায় পুরুষের সঙ্গে কথা বলা অনুমোদন করে না। বেশ কয়েক দিন পায়ে একটা পিঙ্গল দাগ রয়ে গিয়েছিল ওর। কিন্তু নিজের বউকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে দেখা ছাড়া আর কী করার ছিল আমার? আমি মারপিট করলে কুত্তাটা নির্ঘাত আমার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিত। খুশী মনেই কাজটা করত সে! তখন আমার সোহরাবের কী হত? রাস্তাঘাট এখনই *এতীম* ছেলেমেয়েতে ভরে গেছে। রোজ আল্লাহর কাছে শোকর করি, আমি বেঁচে আছি। আমি মৃত্যুকে ভয় পাই বলে নয়, বরং আমার স্ত্রীর একটা স্বামী আর আমার ছেলে *এতীম* নয় বলে।

তুমি সোহরাবকে দেখতে যদি। খুব ভালো ছেলে। রহিম খান সাহিব আর আমি ওকে লিখতে-পড়তে শিখিয়েছি। তো বাপের মতো নির্বোধ হয়ে বেড়ে ওঠেনি সে। আর যা ভালো গুলতি চালাতে পারে না! অনেক সময় কাবুলের বিভিন্ন জায়গায় সোহরাবকে নিয়ে যাই। ওকে ক্যান্ডি কিনে দিই। এখনও শার-ই-নওতে একটা বানর নাচিয়ে আছে। ওটার দেখা পেয়ে গেলে, সোহরাবের জন্যে ওকে বানর নাচাতে বলি। ওর হাসি যদি দেখতে তুমি! আমরা দুজন অনেক সময় টিলা বেয়ে কবরস্থানে উঠে যাই। ওখানে ডালিম গাছের নিচে বসে আমরা কেমন করে *শাহনামা* থেকে পড়তাম সেকথা তোমার মনে আছে? খরায় পাহাড় টাহাড় সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। অনেক বছর ধরে এখন আর গাছে ফল ধরে না। কিন্তু আমি আর সোহরাব এখনও ছায়ায় বসি। আমি ওকে ওর নামের সঙ্গে মিলঅলা সেই গল্পটা পড়ে শোনাই। অচিরেই নিজেই বই থেকে পড়তে পারবে ও। আমি খুবই গর্বিত। খুবই ভাগ্যবান বাবা।

আমির আগা,

রহিম খান সাহিব বেশ অসুস্থ। সারাদিন কাশে। মুখ মোছার সময় তার জামার হাতায় রক্তের দাগ দেখেছি। অনেক ওজন হারিয়েছে ও। ফারজানার রান্না করা *শুরুয়া* আরেকটু বেশী খেত যদি সে। কিন্তু এক বা দুই লোকমার বেশী মুখে তোলে না। কিন্তু সেটাও আমার ধারণা ফারজানার প্রতি ভদ্রতা দেখানোর জন্যে। আমি আমার এই প্রিয় মানুষটার জন্যে চিন্তায় মরে যাচ্ছি। ওর জন্যে রোজ দোয়া করছি। কয়েকদিনের মধ্যেই কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করতে পাকিস্তান যাচ্ছে ও। *ইনশাল্লাহ*, সুখবর নিয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু মনের গভীরে ওকে নিয়ে ভয় হচ্ছে আমার। সোহরাবকে আমি আর ফারজানা বলেছি রহিম খান ঠিক হয়ে যাবে। কী করতে পারি আমরা? মাত্র দশ বছর বয়স ওর, রহিম খান সাহিবকে অনেক পছন্দ করে ও। অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে ওরা। রহিম খান সাহিব ওকে বাজারে নিয়ে যেত, বেলুন কিনে দিত, বিস্কুট কিনে দেয়। কিন্তু এখন দুর্বলতার জন্যে সেটাও করতে পারছে না।

ইদানীং অনেক স্বপ্ন দেখছি আমি, আমির আগা। কোনও কোনওটা আবার দুঃস্বপ্ন। যেমন সকার মাঠের রক্তলাল ঘাসে ফাঁসিতে মারা যাওয়া লাশ পচছে। আমি রুদ্ধশ্বাসে ঘেমে নেয়ে উঠে এই ধরনের স্বপ্ন থেকে জেগে উঠি। যদিও বেশীর ভাগ স্বপ্নই ভালো কিছু নিয়ে। সেজন্যে আল্লাহর শোকর করি আমি। স্বপ্ন দেখি রহিম খান সাহিব ভালো হয়ে যাবে। স্বপ্ন দেখি আমার ছেলেটা ভালো স্বাধীন এবং গণ্যমান্য মানুষ হিসবে বেড়ে উঠবে। স্বপ্ন দেখি আবার কাবুলের রাস্তায় *লাওলা* ফুল ফুটবে। সামোভার হাউসে গানবাজনা শুরু হবে। আকাশে আবার ঘুড়ি উড়বে। আর স্বপ্ন দেখি কোনও একদিন তুমি কাবুলে ফিরে আসবে আমাদের ছেলেবেলার দেশকে দেখার জন্যে। যদি আস, একজন পুরোনো বিশ্বস্ত বন্ধুকে অপেক্ষা করতে দেখবে তুমি।

আল্লাহ সব সময় তোমার সহায় থাকুন,

হাসান

দুবার চিঠিটা পড়লাম আমি। চিঠিটা ভাঁজ করে আবার কয়েক মিনিট তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। দুটোই পকেটে ঢোকালাম তারপর। "কেমন আছে ও?" জিজ্ঞেস করলাম।

"চিঠিটা লেখা হয়েছে ছয় মাস আগে, আমি পেশওয়ারের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার কয়েক দিন আগে," বলল রহিম খান। "পোলারয়েডটা নিয়েছি রওয়ানা হওয়ার আগের দিন। পেশওয়ারে পৌঁছার এক মাস পরে কাবুলের এক পড়শীর

কাছ থেকে ফোন পাই। সে আমাকে এই গল্পটা বলেছে: আমি বিদায় নেওয়ার পরপরই গুজব রটে যায় যে একটা হাযারা পরিবার ওয়াযির আকবার খান-এর বিশাল বাড়িতে একা বাস করছে, কিংবা তালিবানরা তেমনই দাবী করেছে। তালিব অফিসিয়ালদের দুজন অফিসার তদন্ত করতে এসে হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। হাসান আমার সঙ্গে থাকছে বলায় ওরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযোগ করে, যদিও পাড়াপড়শীদের অনেকেই, এমনকি আমাকে যে ফোন করেছিল সে পর্যন্ত, হাসানকে সমর্থন করেছে। তালিবরা বলল ও বাকি হাযারাদের মতোই মিথ্যুক আর চোর। সন্ধ্যার আগেই ওকে সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দিল ওরা ওকে। প্রতিবাদ করল হাসান। কিন্তু আমার পড়শী বলেছে তালিবরা বিশাল বাড়িটার দিকে-কীভাবে যেন কথাটা বলেছিল সে-হ্যাঁ, "ভেড়ার পালের দিকে তাকিয়ে থাকা নেকড়েপালের" মতো তাকিয়েছিল। ওরা বলল আমি না ফেরা পর্যন্ত বাড়িটার নিরাপত্তার জন্যে ওরা এসে থাকবে। আবার প্রতিবাদ করল হাসান। তো ওরা ওকে রাস্তায় নিয়ে গেল-"

"না," রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম আমি।

"-হাঁটু গেড়ে বসতে হুকুম দিল ওকে-"

"না, খোদা, না।"

"-মাথার পেছনে গুলি করে মেরে ফেলল ওকে-"

"না।"

"-চিৎকার করে ছুটে এল ফারজানা, ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর-"

"না।"

"-ওকেও গুলি করে মারে ওরা, আত্মরক্ষা বলে দাবী করেছে শেষে-"

কিন্তু আমি কেবল ফিসফিস করে "না, না, না," বলে যেতে লাগলাম অবিরাম।

হাসানের হেয়ারলিপ সার্জারির ঠিক পর পর ১৯৭৪ সালের হাসপাতালের সেইদিনের কথা বারবার ভাবতে লাগলাম। বাবা, রহিম খান, আলি আর আমি হাসানের বিছানার চারপাশে জড়ো হয়েছিলাম। একটা হাতলঅলা আয়নায় ওকে নতুন ঠোঁট পরখ করতে দেখছিলাম। এখন ওই রুমের সবাই হয় মারা গেছে নয়তো মরতে বসেছে। একমাত্র আমি ছাড়া।

এবার অন্যকিছু দেখতে পেলাম আমি: নকশা করা ভেস্ট পরা এক লোক হাসানের মাথার পেছনে কালাশনিকভের মাযল চেপে ধরেছে। বাবার বাড়ির

BanglaBook.org

রাস্তায় রাস্তায় গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল। হাসান লুটিয়ে পড়ল অ্যাসফল্টের উপর। ওর অটল বিশ্বস্ততার জীবন হাওয়ায় ওড়া ঘুড়ির মতোই-যেই ঘুড়ির পেছনে ছুটত ও-বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে দেহ থেকে।

"তালিবানরা বাড়ির দখল বুঝে নিল," বলল রহিম খান। "অজুহাতটা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়েছে ওরা। হাসান আর ফারজানার কেসটা আত্মরক্ষার খাতিরে হত্যা হিসাবে খারিজ হয়ে গেল। এনিয়ে কেউ টুঁ শব্দটিও করেনি। মনে হয় তালিবানদের ভয়েই হবে। তবে একজোড়া হাযারা চাকরের জন্যে কেউই কোনও ঝুঁকি নিতে যেত না।"

"সোহরাবের কী করেছে ওরা?" জানতে চাইলাম। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল নিজেকে। রহিম খানের কাশি শুরু হল। অনেক ক্ষণ স্থায়ী হলে সেটা। শেষে আবার যখন চোখ তুলে তাকাল, ওর চেহারা লাল হয়ে গেছে, চোখজোড়া রক্তলাল। "শুনেছি কার্তেহ-সেহ-র কোথাও কোনও এতীমখানায় আছে ও। আমির জান-" আবার কাশতে শুরু করল ও। যখন থামল, আগের চেয়ে অনেক বয়স্ক দেখাল ওকে। যেন প্রতিবার কাশির সঙ্গে বয়স বেড়ে যাচ্ছে ওর। "আমির জান, তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি, কারণ মরার আগে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু সেটাই সব নয়।"

কিছু বললাম না আমি। মনে হচ্ছিল ও কী বলতে চায় আগেই বুঝে গিয়েছিলাম।

"আমি চাই তুমি কাবুল যাও। সোহরাবকে এখানে নিয়ে এসো," বলল ও।

কথা খুঁজে ফিরলাম আমি। হাসান মারা গেছে এই সত্যিটুকু মেনে নেওয়ার সময়ও পাইনি এখন পর্যন্ত।

"দয়া করে আমার কথা শোন। এখানে, পেশওয়ারে এক আমেরিকান দম্পতিকে চিনি আমি। ওদের নাম টমাস আর বেটি কল্ডওয়েল। ওরা খ্রিশ্চান। ব্যক্তিগত দানে একটা ছোটখাট দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালায়। বাবা-মা হারানো আফগান শিশুদেরই আশ্রয় আর খাবারের ব্যবস্থা করে। ওদের জায়গাটা আমি দেখেছি। পরিষ্কার, নিরাপদ। বাচ্চাদের ভালোই যত্ন নেওয়া হয়। মিস্টার আর মিসেস কল্ডওয়েল দয়ালু মানুষ। ওরা আমাকে বলেছে, সোহরাব ওদের ওখানে স্বাগত। আর-"

"রহিম খান, নিশ্চয়ই তুমি সিরিয়াস নও।"

"বাচ্চারা নাজুক হয়, আমির জান। কাবুল এরই মধ্যে ভেঙে পড়া শিশুতে ভরে গেছে। আমি চাই না সোহরাব তাদের আরেকজনে পরিণত হোক।"

"রহিম খান, আমি কাবুলে যেতে চাই না! আমি পারব না!" বললাম।

BanglaBook.org

"সোহরাব মেধাবী ছেলে। এখানে ওকে আমরা ওকে নতুন জীবন দিতে পারব। নতুন আশা, ওকে ভালোবাসবে এমন লোকদের কাছে তুলে দিতে পারব। টমাস আগা ভালো মানুষ। বেটি খানুমও খুব মায়াবতী। ওই এতীম বাচ্চাদের সঙ্গে ওদের ব্যবহার যদি দেখতে।"

"আমাকে কেন? আর কাউকে টাকা দিয়ে পাঠাচ্ছ না কেন? টাকা পয়সার ব্যাপার হলে বলো, আমি টাকা দিচ্ছি।"

"এটা টাকা-পয়সার ব্যাপার না, আমির!" গর্জে উঠল রহিম খান। "আমি মরতে বসেছি। আমি অপমানিত হতে রাজি নই! আমার কাছে কখনওই এটা টাকা-পয়সার ব্যাপার ছিল না! সেটা তুমি জান। তুমি কেন? আমার মনে হয় আমরা দুজনই জানি কেন তোমাকেই যেতে হবে। নাকি?"

এই কথাটা বুঝতে চাইলাম না আমি। কিন্তু বুঝতে পারছিলাম। খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলাম। "আমেরিকায় আমার বউ আছে, একটা বাড়ি, ক্যারিয়ার, একটা পরিবার আছে। কাবুল বিপজ্জনক জায়গা। তুমি সেটা জান। আর তুমি কিনা চাইছ আমি এত বড় একটা ঝুঁকি নিই এক..." থেমে গেলাম আমি।

"তুমি জান," বলল রহিম খান, "একবার তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বাবা আর আমি আলাপ করছিলাম। তুমি সেটাও জান, সেইসব দিনে আমরা তোমাকে নিয়ে কেমন চিন্তিত ছিলাম। মনে আছে, ও আমাকে বলেছিল, 'রহিম, যে ছেলে নিজের পক্ষে রুখে দাঁড়ায় না সে কখনওই কোনও কিছুর পক্ষে রুখে দাঁড়াতে পারবে না।' ভাবছি তুমি তেমনই হয়ে গেছ কিনা?"

চোখ নামিয়ে নিলাম আমি।

"তোমার কাছে আমি এক মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছেটুকু পূরণ দেখতে চাইছি," গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে।

নিজের এই মন্তব্য নিয়ে জুয়া খেলেছে ও। সেরা কার্ডটা খেলেছে। কিংবা তখন তাইই ভেবেছি আমি। আমাদের দুজনের মাঝখানে শূন্যে ঝুলে রইল ওর কথাগুলো। অবশেষে কী বলতে হবে বুঝতে পারল ও। অথচ ওই ঘরে আমিই ছিলাম লেখক। অবশেষে এই রফায় এলাম আমি: "হয়তো বাবাই ঠিক ছিল।"

"তুমি এমন ভাবছ দেখে দুঃখ পেলাম, আমির।"

ওর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। "তুমি ভাবনি?"

"ভাবলে তোমাকে এখানে ডেকে পাঠাতাম না।"

বিয়ের আংটি নিয়ে খেলতে লাগলাম আমি। "তুমি আমার সম্পর্কে সব সময়ই উঁচু ধারণা করেছ, রহিম খান।"

BanglaBook.org

"আর তুমি সব সময় নিজের উপর অনেক বেশী কঠোর ছিলে।" একটু ইতস্তত করল সে। "কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আছে, তুমি জান না, এমন কিছু।"

"প্লিজ, রহিম খান-"

"সানোবার আলির প্রথম স্ত্রী ছিল না।"

এবার চোখ তুলে তাকালাম আমি।

"আগে একবার বিয়ে করেছিল ও। জাঘোরি এলাকার এক হাযারা মহিলাকে। সেটা তোমার জন্মের অনেক আগের কথা। তিন বছর ছিল ওদের বিবাহিত জীবন।"

"এর সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?"

তিন বছর পর আলিকে নিঃসন্তান রেখে চলে যায় সে। খোস্ত নামে এক লোককে বিয়ে করে। সেই ঘরে তিনটা মেয়ে হয় তার। একথাই তোমাকে বলার চেষ্টা করছি আমি।"

ও কোন দিকে যাচ্ছে এবার বুঝতে পারলাম। কিন্তু বাকিটুক আর শুনতে ইচ্ছে করল না। ক্যালিফোর্নিয়ায় সুন্দর একটা জীবন কাটাচ্ছি আমি। সূচাল ছাদের চমৎকার একটা ভিক্টোরিয়ান বাড়ি রয়েছে। চমৎকার একটা বউ, সম্ভাবনাময় সাহিত্যিকের জীবন। আমাকে ভালোবাসে এমন শ্বশুর আর শাশুড়ি। এইসব আবোলতাবোল কথা শুনতে চাই না আমি।

"আলি নপুংসক ছিল," বলল রহিম খান।

"না, ছিল না। সানোবার আর তার হাসান ছিল। তাই না? হাসান ছিল ওদের-"

"না ছিল না," বলল রহিম খান।

"হ্যাঁ, ছিল!"

"না ছিল না, আমির।"

"তাহলে কে-"

"মনে হয় সেটা তুমি জান।"

মনে হল খাড়া কোনও ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছি যেন। খড়কুটো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুই লাগছে না হাতে। গোটা ঘরটা উপর নিচে ওঠানামা করছে। "হাসান জানত?" যেন অন্য কারও ঠোঁট দিয়ে কথা বলছি। চোখ বন্ধ করল রহিম খান। মাথা নাড়ল।

"হারামজাদা," বিড়বিড় করে বললাম। উঠে দাঁড়ালাম তারপর। "শালা হারামজাদা!" আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। "তোমরা সবাই একদল মিথ্যুক!"

"দয়া করে বসো," বলল রহিম খান।

BanglaBook.org

"কীভাবে এমন একটা কথা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারলে? লুকিয়ে রাখলে ওর কাছ থেকে?" গর্জে উঠলাম।

"প্লিজ, একটু ভাব, আমির জান। লজ্জাকর একটা অবস্থা ছিল এটা। লোকের মুখে কথার খই ফুটত। তখন কোনও লোকের ছিল কেবল তার ঘর, তার সম্মানই ছিল সব। লোকে কথা বলতে শুরু করলে...আমরা কাউকে বলতে পারিনি। নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝতে পারছ।" আমার দিকে হাত বাড়াল সে। কিন্তু আমি হাতটা সরিয়ে দিলাম। দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

"আমির জান, প্লিজ, চলে যেয়ো না।"

দরজা খুলে ওর দিকে তাকালাম। "কেন? আমাকে আর কী বলবে তুমি? আমার বয়স এখন আটত্রিশ বছর। এখন আমি জানতে পারছি আমার গোটা জীবনটা একটা বিরাট বেজন্মা মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে আছে! অবস্থা ভালো করতে আর কী বলতে পারবে তুমি? কিছু না। কিছুই না!"

এ কথা বলে ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আঠার

ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে। লাল আর পিঙ্গল একটা আভায় ভরিয়ে রেখে গেছে আকাশটা। রহিম খানের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়া ব্যস্ত সংকীর্ণ রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছি। পথচারী, বাইসাইকল, রিকশায় ঠাসাঠাসি গলি তস্য গলির একটা গোলকধাঁধা যেন রাস্তাঘাট। কোণে কোণে বিল বোর্ড ঝুলছে। কোকাকোলা আর সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে। ললিউড মুভি পোস্টার সাঁটানো রয়েছে দেয়ালে। উদ্ভট নায়িকাদের দেখা যাচ্ছে সুদর্শন শ্যামলা পুরুষদের সঙ্গে গাঁদা ফুলের বাগানে নাচছে।

একটা ছোট ধোঁয়ায় ভরা সামোভার হাউসে এসে এক কাপ চায়ের ফরমাশ দিলাম আমি। ফোল্ডিং চেয়ারের পেছনের পায়ার উপর ভর দিয়ে মুখ মুছলাম। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ার সেই অনুভূতিটা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু তার জায়গায় মনে হচ্ছে নিজের ঘরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছি আমি, দেখতে পাচ্ছি সব আসবাবপত্র নতুন করে সাজানো হয়েছে। ফলে পরিচিত প্রত্যেকটা আনাচকানাচ এখন অচেনা ঠেকছে। বেদিশা অবস্থায় আশপাশের জিনিসত্র ফের পরখ করতে হবে আমাকে। নিজেকে আবার জায়গামতো বসাতে হবে।

কীভাবে এমন অন্ধ হতে পারলাম আমি? সারাক্ষণই আমার চোখের সামনেই ছিল সমস্ত চিহ্ন। এখন সেগুলো যেন উড়ে এল আমার কাছে। বাবা ডাক্তার কুমারকে ডেকে এনেছে হাসানের ঠোঁট ঠিক করার জন্যে। বাবা কখনও হাসানের জন্মদিন বাদ দিত না। টিউলিপ বীজ লাগানার কথা মনে পড়ল আমার। বাবাকে যখন কখনও নতুন কাজের লোক রাখার কথা ভেবেছে কিনা

BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করেছি, গর্জে উঠেছিল ও, *হাসান কোথাও যাচ্ছে না। এখানে আমাদের সঙ্গেই থাকবে ও। এখানেই ওর ঘর। এটা ওর ঘর। আমরা ওর পরিবার।* আলি যখন বলল সে আর হাসান আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বাবা কেঁদেছিল।

ওয়েটার আমার সামনে টেবিলের উপর এক কাপ চা রেখে গেল। টেবিলের পায়াগুলো যেখানে ইংরেজি 'এক্স' হরফের মতো পরস্পরকে কেটেছে, সেখানে ওয়ালনাট আকৃতির ব্রাসবলের একটা রিং রয়েছে। একটা বল খুলে গেছে। সামনে ঝুঁকে ওটা টাইট করে দিলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমার জীবনও যদি এত সহজে ঠিক করে ফেলা যেত। বহু বছরের মধ্যে সবচেয়ে কড়া চায়ে চুমুক দিলাম। সুরাইয়ার কথা, জেনারেলের কথা, জামিলা খালার কথা, এখনও শেষ হবার অপেক্ষায় থাকা উপন্যাসটার কথা ভাববার প্রয়াস পেলাম। রাস্তা দিয়ে ছুটে চলা ট্রাফিক, ছোটখাট মিষ্টির দোকানে ঢুকতে আর বেরুতে থাকা লোকজনের দিকে তাকাতে চাইলাম। যেকোনও কিছু। কিন্তু বারবার আমার গ্র্যাজুয়েশনের রাতের বাবাকে দেখতে লাগলাম। মাত্র আমাকে উপহার দেওয়া ফোর্ডের ভেতর বসে আছে। ওর গা থেকে বিয়রের গন্ধ ভেসে আসছে, বলছে, *আজ হাসান আমাদের সঙ্গে থাকলে ভালো হত।*

এতগুলো বছর কেমন করে আমাকে মিথ্যা বলতে পারল ও? হাসানের কাছে? আমি ছোট থাকতে আমাকে কোলে তুলে সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, *গুনাহ আসলে মাত্র একটা। সেটা হচ্ছে চুরি করা...যখন মিথ্যা কথা বল তখন কারও সত্যি জানার অধিকার চুরি করলে তুমি।* আমাকে কি এই কথাগুলো বলেনি ও? আর এখন, ওকে কবর দেওয়ার পনের বছর পরে জানতে পারছি যে বাবা নিজেই একজন চোর ছিল। সবচেয়ে খারাপ ধরনের চোর। কারণ তার চুরি কারা জিনিসগুলো ছিল পবিত্র:

আমার একটা ভাই ছিল সেটা জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে আমাকে, হাসানের পরিচয় চুরি করেছে, আলিকে তার সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে। তার *নাঙ*। তার *নামুস*।

বারবার প্রশ্নটা ফিরে ফিরে আসতে লাগল আমার কাছে: বাবা কীভাবে আলির চোখের দিকে তাকাত? কীভাবে ওই বাড়িতে থাকতে পেরেছিল আলি? দিনের পর দিন। যেখানে সে জানত আফগান কোনও পুরুষকে অসম্মান করার সবচেয়ে জঘন্য উপায়ে তাকে বেইজ্জতি করেছে তার মনিব? আর আমিই বা কীভাবে বাবার এই নতুন চেহারার সঙ্গে এতদিন ধরে আমার মনে খোদাই হয়ে থাকা চেহারার খাপ খাওয়াব? সেই পুরোনো বাদামী স্যুট পরে তাহেরির ড্রাইভওয়ে ধরে টলমল পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে সুরাইয়ার বিয়ের প্রস্তাব দেবে বলে?

BanglaBOOK.org

এটা আরেকটা ক্লীশে যেটা কিনা আমার ক্রিয়েটিভ রাইটিং টিচারের ভর্ৎসনার মুখোমুখি হত: বাপক বেটা সেপাইকা ঘোড়া। কিন্তু সেটা সত্যি, তাই না? যেমন দেখা গেছে, বাবা আর আমি আমার যতখানি জানা ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী কাছাকছি। আমরা দুজনই এমন সব লোকদের সঙ্গে বেঈমানি করেছি যারা আমাদের জন্যে জীবন দিতে তৈরি ছিল। সেই সঙ্গে এই উপসংহারও এল: রহিম খান আমাকে এখানে কেবল আমার নিজের নয় বরং বাবার পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে তলব করেছে।

রহিম খান বলেছে আমি বরাবর নিজের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করে এসেছি। কিন্তু আমি ভাবলাম, ঠিক, আমি আলিকে ল্যান্ড মাইনের উপর পা দিতে বাধ্য করিনি। হাসানকে গুলি করে মারার জন্যে তালিবানদের বাড়ি ডেকে আনিনি। কিন্তু হাসান আর আলিকে আমিই বাড়ি ছাড়া করেছিলাম। এটা কী কষ্ট কল্পনা যে সেটা না করলে অবস্থা ভিন্ন হতে পারত? হয়ত বাবা ওদের সঙ্গে করে আমেরিকায় নিয়ে আসত। এতদিনে হাসানের হয়ত নিজের একটা বাড়ি থাকত। একটা কাজ, একটা পরিবার থাকত। এমন এক দেশে, এমন এক জীবন যেখানে সে হাযারা কিনা সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। যেখানে বেশীরভাগ লোকই হাযারা মানে কী সেটাই জানে না। হয়ত না। আবার হয়ত হতেও পারত।

আমি কাবুল যেতে পারব না, রহিম খানকে বলেছি। *আমেরিকায় আমার বউ আছে, একটা বাড়ি আছে, পরিবার আছে।* কিন্তু কীভাবে আমি তল্পিতল্পা গুটিয়ে ঘরে ফিরে যাব যেখানে আমার কাজের ফলে হাসান ঠিক এই সুবিধাগুলো পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে?

রহিম খান আমাকে ফোন না করলেই ভালো ছিল, ভাবলাম। আমাকে সে অন্ধকারে থাকতে দিলেই পারত। কিন্তু আমাকে ফোন করেছে ও। রহিম খান আমার কাছে যেসব কথা বলেছে তাতে করে অবস্থা বদলে গেছে। আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে কীভাবে আমার গোটা জীবন, ১৯৭৫ সালের শীতের অনেক আগে থেকেই, সেই হাযারা মহিলা আমাকে গান শোনাবার সময় থেকেই মিথ্যা, বেঈমানি আর গোপনীয়তার একটা চক্রে পরিণত হয়েছিল।

আবার ভালো হওয়ার একটা উপায় আছে, বলেছিল সে।

সেই চক্রটাকে ভাঙার একটা উপায়।

একটা ছোট ছেলের কাছে। একটা এতীম। হাসানের ছেলে। কাবুলের কোথাও আছে।

BanglaBook.org

রিকশায় করে আবার রহিম খানের অ্যাপার্টমেন্টে যাবার পথে বাবার বলা সেই কথাটা মনে পড়ল: আমার সমস্যাটা হচ্ছে সব সময়ই অন্য কেউ আমার কাজ করে দিচ্ছে। এখন আমার বয়স আটত্রিশ বছর। মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে। ইদানীং চোখের চারপাশে কুঞ্চন চোখে পড়েছে আমার। এখন অনেক বড় হয়েছি। কিন্তু নিজের লড়াই শুরু করার মতো যথেষ্ট বড় হয়ত না। দেখা যাচ্ছে বাবা অনেক বিষয়েই মিথ্যে বলেছে আমাকে। কিন্তু এই সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি।

আবার পোলারয়েডের গোলগাল চেহারাটার দিকে তাকালাম। ওটার উপর রোদ এসে পড়ার ভঙ্গিটা খেয়াল করলাম। আমার ভাইয়ের চেহারা। একবার আমাকে ভালোবেসেছিল হাসান। এমনভাবে ভালোবেসেছিল যেভাবে আর কখনও কেউ কোনওদিন বাসবে না। এখন নেই ও। কিন্তু ওর একটা ছোট অংশ রয়ে গেছে। বেঁচে আছে। কাবুলে।

অপেক্ষা করছে।

রুমের এক কোণে রহিম খানকে *নামায* পড়তে দেখলাম। রক্তাক্ত আকাশের পটভূমিতে স্রেফ একটা অন্ধকার ছায়ামূর্তি। ও শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি।

তারপর ওকে বললাম আমি কাবুলে যাচ্ছি। সকালে কল্ডওয়েলদের ফোন করতে বললাম।

"তোমার জন্যে আমি দোয়া করব, আমির জান," বলল সে।

BanglaBook.org

উ নি শ

আবার সেই কার সিকনেস। বুলেটের ঘায়ে ঝাঁঝড়া হয়ে যাওয়া খাইবার পাস আপনাকে স্বাগত জানায় লেখা সাইনবোর্ডটা পার হয়ে আসার সময় জলে ভরে উঠতে শুরু করল আমার মুখ। আমার পেটের ভেতরে কি যেন মোচড় খাচ্ছে, পাক দিচ্ছে। শীতল চোখে আমার দিকে তকাল ড্রাইভার, তার চোখে সহানুভূতির লেশমাত্র নেই।

"জানালার কাঁচ নামানো যাবে?" জিজ্ঞেস করলাম।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাম হাতের অবশিষ্ট দুই আঙুলের ফাঁকে আটকাল সেটা। স্টিয়ারিং হুইলের উপর ফেলে রেখেছে ওটা। কালো চোখজোড়া রাস্তার দিকে স্থির রেখে সামনে ঝুঁকে এল সে। দুপায়ের মাঝখানে পড়ে থাকা একটা স্ক্রু-ড্রাইভার তুলে আনল। আমার হাতে দিল ওটা। দরজার যেখানটায় হ্যান্ডল ছিল সেখানকার ফুটোয় স্ক্রু-ড্রাইভারটা ঢুকিয়ে দিয়ে আমার পাশের জানালার কাচ নামোনার জন্যে ঘোরাতে লাগলাম।

আরেকবার নাকচ করার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল ফরিদ। চাপা বৈরিতার আভাস সেখানে। সিগারেটে টান দেওয়া অব্যাহত রাখল সে। আমরা জামরুল ফোর্ট থেকে বের হয়ে আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত মুখ দিয়ে গোটা বার শব্দের বেশী বের করেনি সে।

"*তাশাকোর,*" বিড়বিড় করে বললাম আমি। জানালা দিয়ে বাইরে মাথা বের করে মাঝ বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়াকে মুখের উপর দিয়ে সবেগে সরে দিতে দিলাম। শেইল আর লাইমস্টোনের আঁকাবাঁকা অসংখ্য ক্লিফের ভেতর দিয়ে

BanglaBook.org

খাইবার পাসের গোত্রীয় এলাকা দিয়ে যাত্রার ব্যাপারটা ঠিক আগের মতোই আছে। ১৯৭৪ সালে বাবা আর আমি এই ভাঙাচোরা এলাকার উপর দিয়ে গিয়েছিলাম। চেপে আসা উষর পাহাড়গুলো গভীর গহবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ভাঙাচোরা চূড়ার দিকে উঠে গেছে ওগুলো। ভেঙে পড়ার উপক্রম অ্যাডোবে দেয়ালঅলা প্রাচীন সব দুর্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি উত্তরের বরফঢাকা হিন্দুকুশ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করলাম। কিন্তু যখনই পেটের ভেতরটা স্থির হয়ে আসছে, ট্রাকটা ফের কোনও বাঁকে এসে পিছলে যাচ্ছে; ফলে আবার তীব্র করে দিচ্ছে বমির উদ্বেগ।

"একটা লেবু খেয়ে দেখ।"

"কী?"

"লেবু। অসুস্থতার জন্যে ভালো," বলল ফরিদ। "এই ড্রাইভের সময় বরাবর লেবু রাখি আমি।"

"না, ধন্যবাদ," বললাম। পেটের ভেতর আরও এসিড ঢালার ভাবনা বমির ভাব আরও বাড়িয়ে দিল। নাক সিঁটকাল ফরিদ। "জানি এটা আমেরিকান ওষুধের মতো মজাদার নয়, মায়ের শেখানো পুরোনো একটা প্রতিশেধক।"

লোকটার সঙ্গে খাতির জমানোর এমনি সুযোগটা হেলায় হারানোর জন্যে খারাপ লাগল। "তাহলে একটু দিতে পার।"

খাবলা মেরে পেছনের সিট থেকে একটা কাগজের ব্যাগ তুলে নিল সে। আর্ধেকটা লেবু বের করল ওটা থেকে। ওটায় কামড় বসালাম আমি। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম। "ঠিকই বলেছ তুমি। অনেক ভালো লাগছে এখন।" মিথ্যা বললাম। আফগান হিসাবে আমি জানি রুষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং কষ্ট করা ভালো। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললাম।

"পুরোনো *ওয়াতানি* কায়দা, ফুটানির ওষুধের কোনও দরকার নেই," বলল সে। রুক্ষতার প্রান্তে তার কণ্ঠস্বর। সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ফেলে রিয়র ভিউ মিররে আত্মতুষ্ট ভঙ্গিতে তাকাল সে। লোকটা তাজিক, হ্যাংলা, শ্যামবর্ণের মানুষ, রোদেপোড়া পোড় খাওয়া চেহারা, সরু কাঁধ তার। লম্বা গলা। উঁচু হয়ে থাকা কণ্ঠমণির কারণে ছেদ পড়েছে তাতে। কেবল ঘাড় ফেরালেই দাড়ির আড়াল থেকে উঁকি দেয় সেটা। আমার মতোই পোশাক পরে আছে। যদিও আমার ধারণা সেটা আসলে উল্টোটাই হবে: কর্কশভাবে বোনা একটা উলের কম্বল, ধূসর *পিরহান-তাম্বানের* উপর ফেলে রেখেছে। আর একটা ভেস্ট। মাথায় একটা বাদামী *পাকোল*, একপাশে কিঞ্চিত কাত হয়ে আছে, তাজিক বীর আহমেদ শাহ মাসুদের কায়দায়-তাজিকরা তাকে

BanglaBook.org

"পানশিরের সিংহ" বলে ডাকে।

পেশওয়ারে রহিম খানই ফরিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে আমাকে। বলেছে ফরিদের বয়স উনত্রিশ বছর, যদিও চেহারায় আরও বিশ বছর বেশী বয়সী কারও মতো বলী-রেখা ফুটে আছে। মাযার-ই-শরীফে তার জন্ম। দশ বছর বয়সে তার বাবা সপরিবারে জালালাবাদে চলে আসার আগ পর্যন্ত সেখানেই ছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে সে আর তার বাবা *শোরোভিদের* বিরুদ্ধে *জিহাদে* যোগ দেয়। বাবা হেলিকপ্টার গানফায়ারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার আগ পর্যন্ত দুই বছর পানশির উপত্যকায় লড়াই করেছে ওরা। ফরিদের স্ত্রী দুজন, পাঁচ মেয়ে। "সাতটা মেয়ে ছিল ওর," বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেছিল রহিম খান। কিন্তু ওর ছোট দুই মেয়ে জালালাবাদের ঠিক বাইরে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে আগেই মারা গিয়েছিল। সেই একই বিস্ফোরণে তার বাম হাতের তিনটা আঙুল উড়ে যায়। এরপর বউ বাচ্চাকে নিয়ে পেশওয়ারে চলে আসে সে।

"চেক পয়েন্ট," গজগজ করে বলল ফরিদ। বুকের উপর আড়াআড়িভাবে হাত বেঁধে সীটে এলিয়ে পড়লাম আমি । মুহূর্তের জন্যে বমির কথা বিস্মৃত হলাম। তবে উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার ছিল ন। আমাদের জারজীর্ণ ল্যান্ডক্রুজারের দিকে এগিয়ে এল দুজন পাকিস্তানি মিলিশিয়া। ভেতরে একটু দেখল, তারপর ইশারায় আগে বাড়তে বলল।

আমি আর রহিম খান মিলে যে ফর্দ করেছিলাম সেটার এক নম্বরে ছিল ফরিদ। সেই লিস্টে কাল্‌দার আর আফগানি টাকার জন্যে ডলার ভাঙানো, আমার পোশাক আর *পাকোল* কেনার কথা ছিল–পরিহাসের ব্যাপার হচ্ছে সত্যিকার অর্থে আফগানিস্তানে থাকতে আমি কখনওই এই দুটো জিনিস পরিনি–হাসান আর সোহরাবের পোলারয়েড আর সবশেষে, সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ছিল কালো আর বুক পর্যন্ত লম্বা নকল দাড়ি, *শরী'য়া*-সুলভ, কিংবা অন্তত *শরী'য়ার* তালিবান ভাষ্যের কাছাকাছি। পেশওয়ারে রহিম খানের পরিচিত এক লোক ছিল যে এসব বানানোয় বেশ পটু। অনেক সময় যুদ্ধ কাভার করতে আসা বিদেশী সাংবাদিকদের জন্যে এসব বানায় সে।

আরও কয়েকদিন ওর কাছে থাকতে বলেছিল আমাকে রহিম খান, যাতে আরও ভালো করে পরিকল্পনা করা যায়। কিন্তু আমি জানতাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা করতে হবে আমাকে। ভয় হচ্ছিল হয়ত মত পাল্টে ফেলতে পারি। ভয় পাচ্ছিলাম হয়ত ভাবব, খুটিয়ে চিন্তা করব, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠব, যুক্তি বানাব, তারপর না যাওয়ার জন্যে নিজেকে বোঝাব। ভয় ছিল আমেরিকায় আমার জীবনের আবেদন পিছু টানবে আমাকে। আমি আবার বিশাল নদীতে নেমে

BanglaBook.org

যাব। ভুলে যেতে দেব নিজেকে। এই কয়েকদিনে শেখা কথাগুলোকে স্থির হতে দেব। ভয় পাচ্ছিলাম আমাকে আমার কর্তব্য থেকে নদীর জল অনেক দূরে নিয়ে যাবে। হাসানের কাছ থেকে, আমাকে ডেকে চলা অতীত থেকে এবং নিষ্কৃতি পাওয়ার শেষ একটা সুযোগ থেকে দূরে। সেজন্যেই তেমন কিছু ঘটার আগেই চলে এসেছি আমি। সুরাইয়াকে আফগানিস্তানে যাওয়ার কথা বলার কোনও উপায় ছিল না, তাহলে পরের ফ্লাইটেই পাকিস্তানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যেত ও।

সীমান্ত পেরিয়ে এসেছি আমরা। সর্বত্র দারিদ্রের চিহ্ন। রাস্তার উল্টোদিকে এখানে ওখানে ছোট ছোট গ্রাম মাথা তুলে দাঁড়াতে দেখলাম। যেন পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফেলে দেওয়া খেলনা, ভাঙা মাটির আর কুঁড়ে ঘর। মোটামুটি চারটে খুঁটি আর ছেঁড়া ফাটা কাপড়ের ছাদ রয়েছে এগুলোর। কুঁড়েগুলোর বাইরে ন্যাকড়া গায়ে একটা ছেলেকে একটা বলের পেছনে ছুটতে দেখলাম। কয়েক মাইল আগে বাড়ার পরে গরুর পালের মতো একদল লোককে একটা পুরোনো রাশান ট্যাঙ্কের লাশের উপর হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে দেখলাম। বাতাসে পতপত করে উড়ছে ওদের গায়ে জড়ানো চাদর। ওদের পেছনে বাদামী *বুরকা* পরা এক মহিলা এবড়োখেবড়ো পথে কাঁধের উপর একটা বিরাট মাটির পট নিয়ে এক সারি মাটির ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

"অদ্ভুত," বললাম আমি।

"কী?"

"নিজের দেশেই নিজেকে ট্যুরিস্ট বলে মনে হচ্ছে আমার," রাস্তার এক পাশ দিয়ে গোটা ছয় ছাগলের একটা পালকে নিয়ে এগিয়ে চলা একটা ছেলেকে দেখালাম আমি। নাক সিটকালো ফরিদ। সিগারেটটা ফেলে দিল। "এজায়গাটাকে এখনও নিজের বলে ভাবছ তুমি?"

"মনে হয় আমার একটা অংশ সব সময়ই তাই-ই ভাববে," যতটা চেয়েছিলাম তার চেয়ে আত্মরক্ষামূলক শোনাল আমার কণ্ঠস্বর।

"বিশ বছর আমেরিকায় কাটানোর পর," বলল সে, একটা বীচবল আকৃতির গর্ত এড়ানোর জন্যে গাড়ি ঘুড়িয়ে নিল।

মাথা দোলালাম। "আমি আফগানিস্তানেই বড় হয়েছি।"

আবার নাক সিঁটকাল ফরিদ।

"কেন অমন করলে?"

"বাদ দাও," বিড়বিড় করে বলল সে।

"না, আমি জানতে চাই। কেন অমন করলে তুমি?"

BanglaBook.org

রিয়ার ভিউ মিররে ওর চোখে একটা কিছু ঝলসে উঠতে দেখলাম। "জানতে চাও?" খেঁকিয়ে উঠে বলল সে। "আমাকে একটু ভাবতে দাও, আগা সাহিব। তুমি বোধ হয় দুই বা তিনতলা বাড়িতে ছিলে, পেছনে বাগান ছিল ওটার। তোমাদের মালি সেখানে ফুল গাছ আর ফল গাছ লাগিয়েছিল। তোমার বাবা-মা ফুটানি করার জন্যে *মেহমানির* আয়োজন করত। সেখানে ভাড়া করা লোক কাজ করত যাতে ওদের বন্ধুরা এসে মদ খেতে খেতে ইউরোপ আর আমেরিকায় তাদের ঘুরে বেড়ানোর গল্প করতে পারে। আমি আমার প্রথম ছেলের চোখজোড়া বাজি ধরে বলতে পারি, এবারই প্রথম তুমি একটা *পাকোল* পরেছ।" আমার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। অসময়ে পচে যাওয়া দুপাটি দাঁত বের হয়ে পড়ল। "ঠিক বলেছি না?"

"কেন এসব কথা বলছ তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কারণ তুমি জানতে চেয়েছ," বলল সে। মাটির রাস্তা ধরে এগিয়ে চলা ছেঁড়া কাপড় পরা এক লোকের দিকে ইঙ্গিত করল সে, তার পিঠে ঠেসে ঘাস ভরে রাখা একটা বারল্যাপ ব্যাগ। "এটাই আসল আফগানিস্তান, আগা সাহিব। এই আফগানিস্তানই চিনি আমি। তুমি? তুমি আগাগোড়াই ট্যুরিস্ট ছিলে এখানে। কোনও ধারণাই ছিল না তোমার।"

রহিম খান আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল আমি যেন যারা আফগানিস্তানে রয়ে গিয়ে লড়াই করেছে তাদের কাছ থেকে উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা না করি। "তোমার বাবার জন্যে আমি দুঃখিত," বললাম আমি। "তোমার মেয়েদের জন্যেও দুঃখিত। তোমার হাতের জন্যেও দুঃখিত।"

"আমার কাছে এর কোনও মানে নেই," বলল সে। মাথা নাড়ল। "কী কারণে ফিরে আসছ তুমি বলো তো? বাপের সম্পত্তি বিক্রি করতে? টাকাপয়সা পকেটে ভরে আমেরিকায় মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্যে?"

"মা আমাকে জন্ম দিতে গিয়েই মারা গেছে," বললাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আরেকটা সিগারেট ধরাল সে। কিছু বলল না।

"থামাও।"

"কী?"

"ধেত্তের, থামাও!" বলে উঠলাম আমি। "বমি করব।" ট্রাকটা রাস্তার পাশে থামার সময়ই হাছড়েপাছড়ে বের হয়ে এলাম আমি।

BanglaBook.org

শেষ বিকেল নাগাদ চারপাশের এলাকা রোদে পোড়া চূড়া আর বিরান ক্লিফ থেকে আরও সবুজতর আর গ্রমীণ পরিবেশে বদলে গেল। মূল পাসটা লান্ডি

কোটাল থেকে নেমে শিনওয়ারি এলাকার উপর দিয়ে গিয়ে লান্ডি খানাতে শেষ হয়েছে। তোরখামে আফগানিস্তানে ঢুকেছি আমরা। রাস্তার দুপাশে পাইন গাছের সারি, আগের চেয়ে অনেক কম। অনেক কটাই ন্যাড়া। তবে খাইবারের ভেতর দিয়ে কষ্টকর যাত্রার পর আবার গাছের দেখা পেয়ে ভালো লাগল। জালালাবাদের কাছাকাছি চলে আসছি আমরা। ফরিদের এক ভাই আছে ওখানে, আমাদের রাতের মতো আশ্রয় দেবে সে।

আমরা যখন নঙগরহরের রাজধানী জালালাবাদে ঢুকলাম তখনও সূর্য পুরোপুরি ডুবে যায়নি। এককালে ফলফলারি আর উষ্ণ আবহাওয়ার কারণে বিখ্যাত ছিল এ শহরটা। শহরের মূল এলাকার দালান-কোঠা আর পাথুরে বাড়িঘর পেরিয়ে এল ফরিদ। আমার যেমন মনে আছে তত খেজুর গাছ চোখে পড়ল না। কয়েকটা ঘর ছাদবিহীন দেয়াল আর দোমড়ানো মোচড়ানো কাদার স্তূপে পরিণত হয়েছে।

একটা রুক্ষ পথে গাড়ি ঘোরাল ফরিদ। একটা শুকনো নালার পাশে থামাল সে ল্যান্ড ক্রুজারটা। ট্রাক থেকে পিছলে নেমে এসে আড়মোড়া ভাঙলাম আমি, লম্বা করে দম নিলাম। আগের দিনে জালালাবাদের আশপাশের সেচ দেওয়া জমির উপর দিয়ে হাওয়া খেলে যেত। এখানে কৃষকরা আখের চাষ করত, গোটা শহর মিষ্টি একটা গন্ধে ভরে উঠত। চোখ বন্ধ করে সেই মিষ্টি সুবাসের সন্ধান করলাম আমি। পেলাম না।

"চলো," অধৈর্য কণ্ঠে বলল ফরিদ। এক সারি ভাঙা দেয়াল বরাবর জন্মানো পাতাহীন পপলার পেছনে ফেলে মাটির রাস্তা ধরে আগে বাড়লাম আমরা। একটা জীর্ণ একতলা বাড়ির কাছে নিয়ে এল আমাকে ফরিদ। কাঠের পাটাতন দিয়ে বানানো দরজায় টোকা দিল সে।

সাগরের মতো সবুজ চোখের এক তরুণী দরজা খুলে দিল। শাদা স্কার্ফে মুখ ঢেকে রেখেছে সে। আগে আমাকে দেখে কুকড়ে গেল। তারপর ফরিদকে দেখে তার চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "*সালাম আলাইকুম*, ফরিদ কাকা!"

"*সালাম*, মরিয়ম জান," বলে তাকে এমন একটা জিনিস দিল আমাকে যা সারাদিন দেয়নি: একটা উষ্ণ হাসি। মেয়েটার কপালে একটা চুমু খেল সে। পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল মেয়েটা। ফরিদের পেছন পেছন আমাকে ছোট ঘরে ঢুকে পড়তে দেখে ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল আমার দিকে।

অ্যাডোবির ছাদটা অনেক নিচু। মাটির দেয়ালগুলো একেবারেই নাঙা। এক কোণে রাখা একজোড়া হারিকেন থেকেই যা একটু আলো আসছে। পায়ের জুতো খুলে মেঝেতে বিছানো খড়ের জাজিমের উপর উঠে পড়লাম আমরা।

BanglaBook.org

একপাশের দেয়াল বরাবর বিছানো কিনারা ক্ষয়ে যাওয়া তক্তপোষের উপর পায়ের উপর পা তুলে তিনটা ছেলে বসে আছে। দাড়িঅলা দীর্ঘদেহী একলোক আমাদের স্বাগত জানাতে উঠে দাঁড়াল। ফরিদ আর সে কোলাকুলি করে একে অপরকে গালে চুমু খেল। তাকে ওর বড় ভাই ওয়াহিদ বলে পরিচয় করিয়ে দিল ফরিদ। "আমেরিকা থেকে এসেছে ও," ওয়াহিদকে বলল সে। বুড়ো আঙুলে ইঙ্গিত করল আমার দিকে। আমাদের একা রেখে ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে গেল সে।

ছেলেগুলোর উল্টোদিকে দেয়ালের সঙ্গে *ঠেস* দিয়ে আমাকে বসাল ওয়াহিদ। ছেলেগুলো ফরিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর কাঁধে উঠে বসেছে। আমার আপত্তি সত্ত্বেও ওয়াহিদ ছেলেদের একজনকে হুকুম করল আমার জন্যে আরেকটা কম্বল নিয়ে আসতে যাতে আমি মেঝেতে আরেকটু আরাম করে বসতে পারি। মরিয়মকে বলল আমাকে চা দিতে। পেশওয়ার থেকে আসা আর খাইবার পাস পার হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইল সে।

"আশা করি কোনও *দোযদদের* পাল্লায় পড়তে হয়নি তোমাকে," বলল সে। খাইবার পাস চোর-ডাকাতদের অভয়ারণ্য বলে বিখ্যাত, এরা লোকজনের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়ার জন্যে ওত পেতে থাকে। আমি জবাব দেওয়ার আগেই চোখ টিপল সে। চড়া গলায় বলল, "অবশ্য কোনও ডাকাতই আমার ভাইয়ের ওই বিশ্রী চেহারার গাড়ির পেছনে অযথা সময় নষ্ট করতে যাবে না।"

সবচেয়ে ছোট ছেলেটাকে মাটিতে ফেলে অক্ষত হাতে তাকে সুড়সুড়ি দিতে লাগল ফরিদ। হাসতে হাসতে হাত-পা ছুড়তে লাগল ছেলেটা। "আমার তো তাও একটা গাড়ি আছে," হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ফরিদ। "তোমার গাধাটা আজকাল কেমন আছে?"

"আমার গাধাটা তোমার গাড়ির চেয়ে ঢের ভালো।"

"খার খারা মিশনাশা," পাল্টা জবাব দিল ফরিদ। *গাধাই গাধা চেনে।* সবাই হাসতে হাসতে যোগ দিল ওদের সঙ্গে। লাগোয়া ঘর থেকে মেয়েদের গলার অওয়াজ পেলাম আমি। মারিয়াম আর বাদামী *হিযাব* পরা অন্য এক মহিলা-বোঝাই যাচ্ছে মা-নীচু কণ্ঠে কথা বলছে। একটা কেতলি থেকে কাপে চা ঢালছে ওরা।

"তা আমেরিকায় কী কর তুমি, আমির জান?" জানতে চাইল ওয়াহিদ।

"আমি লেখক," বললাম। মনে হল কথাটা শুনে হেসে উঠেছে ফরিদ।

"লেখক?" বলে উঠল ওয়াহিদ, বোঝা যাচ্ছে অভিভূত হয়ে গেছে। "তুমি আফগানিস্তানকে নিয়ে লেখ?"

Banglabook.org

"ইয়ে, লিখেছি, তবে খুব বেশী না," বললাম। আমার শেষ উপন্যাস *আ সিজন ফর অ্যাশেস* ছিল এক ইউনিভার্সিটি প্রফেসরকে নিয়ে লেখা, স্ত্রীকে এক ছাত্রের সঙ্গে বিছানায় আবিষ্কার করার পর একদল জিপসির সঙ্গে যোগ দেয় সে। বইটা খারাপ না। কোনও কোনও সমালোচক ওটাকে "ভালো" বই বলে অ্যাখ্যা দিয়েছে। এমনকি একজন তো "রিভেটিং" শব্দটা ব্যবহার করেছে। কিন্তু হঠাৎ করে বিব্রত বোধ করলাম আমি। মনে মনে আশা করলাম ওয়াহিদ যেন বইটার বিষয় বস্তু সম্পর্কে জানতে না চায়।

"হয়ত আবার আফগানিস্তান নিয়ে লেখা শুরু করা উচিত তোমার," বলল ওয়াহিদ। "সারা দুনিয়ার মানুষকে জানিয়ে দিতে পারবে তালিবানরা আমাদের দেশের কী দুর্গতি করেছে।"

"ইয়ে, আমি আসলে...ঠিক ওই ধরনের লেখক না।"

"ওহ্," বলল ওয়াহিদ। মাথা দোলাল সে, একটু লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা। "তোমারই ভালো জানার কথা । আমার এখানে কিছু বলা উচিত নয়..."

ঠিক এইসময় মরিয়াম আর অন্য মহিলা ছোট প্ল্যাটারে করে এক জোড়া কাপ আর একটা কেতলি নিয়ে রুমে ঢুকল। সম্মান দেখাতে উঠে দাঁড়ালাম আমি, বুকে হাত রাখলাম। মাথা নোয়ালাম। "*সালাম আলাইকুম,*" বললাম।

মহিলা এখন তার *হিযাবটা* চেহারার নিচের অংশ ঢাকতে কাজে লাগিয়েছে। মাথা নোয়াল সেও। "*সালাম,*" জবাব দিল। কণ্ঠস্বর শোনা গেল কি গেল না। চোখে চোখে তাকাল না একবারও। আমি দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই চা ঢালল সে।

ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ আমার সামনে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল মহিলা। অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় তার নগ্ন পায়ে এতটুকু শব্দ হলো না। আমি বসে কড়া চায়ে চুমুক দিলাম, এরপরে নেমে আসা বিব্রতকর নীরবতা ভাঙল ওয়াহিদ।

"তো আফগানিস্তানে কেন আসা তোমার?"

"ওদের *সবাইকে* কোন জিনিসটা আফগানিস্তানে ফিরিয়ে আনছে, পেয়ারা ভাই আমার?" বলল ফরিদ। ওয়াহিদের উদ্দেশে কথা বললেও আমার দিকে অসন্তোষের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে।

"*ব্যস!*" ধমক দিল ওয়াহিদ।

"আগাগোড়াই এমন," বলল ফরিদ। "জমি, বাড়ি বেচে দিয়ে টাকা নিয়ে ইঁদুরের মতো সটকে পড়া। আমেরিকায় ফিরে গিয়ে মেক্সিকোয় ফ্যামিলি

BanglaBook.org

ভ্যাকেশনে সেই টাকা ওড়ানো।"

"ফরিদ!" গর্জে উঠল ওয়াহিদ। ওর ছেলেরা, এমনকি ফরিদও চমকে উঠল। "ভদ্রতা ভুলে গেলে নাকি? এটা আমার বাড়ি! আমির আগা আজ রাতে আমার মেহমান। আমি এভাবে আমাকে বিইজ্জতি করতে দেব না!"

মুখ খুলল ফরিদ, কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তারপর কী ভেবে চুপ করে রইল। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল সে। চাপা গলায় বিড়বিড় করে বলল কিছু একটা। বিক্ষত পাটা ভালো পায়ের উপর তুলে দিল। তার অভিযোগের দৃষ্টি আমার উপর থেকে সরল না মুহূর্তের জন্যেও।

"আমাদের মাফ করবে, আমির আগা," বলল ওয়াহিদ। "ছেলেবেলা থেকেই আমার এই ভাইটির মুখ তার মাথা থেকে দুই কদম আগে থাকে।"

"দোষটা আমার," বললাম। ফরিদের অটল নজরের সামনে হাসার চেষ্টা করলাম। "আমি কিছু মনে করিনি। আফগানিস্তানে আসার কারণ ওর কাছে খুলে বলা উচিত ছিল আমার। এখানে সম্পত্তি বিক্রি করতে আসিনি আমি। একটা ছেলেকে খুঁজতে কাবুলে যাচ্ছি।"

"একটা ছেলে," ফিসফিস করে বলল ওয়াহিদ।

"হ্যাঁ।" শার্টের পকেট থেকে পোলারয়েড ছবিটা বের করলাম। হাসানের ছবিটা আবার দেখতে গিয়ে ওর মৃত্যুর পুরোনো শোক চাগিয়ে উঠল। জোর করে ওটার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে হল আমাকে। ওয়াহিদের হাতে দিলাম ওটা। ছবিটা জরিপ করল সে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে ফের ছবিটার দিকে চোখ ফেরাল। "এই ছেলেটা?"

মাথা দোলালাম।

"এই হাযারা ছেলেটা।"

"হ্যাঁ।"

"সে তোমার কী এমন?"

"ওর বাবা আমার কাছে অনেক কিছু ছিল। ছবির ওই লোকটা। এখন আর বেঁচে নেই ও।"

চোখ পিটপিট করল ওয়াহিদ। "তোমার বন্ধু?"

আমার সহজাত প্রবৃত্তি হ্যাঁ বলার জন্যে মুখিয়ে ছিল, যেন বাবার গোপন কথা রক্ষা করতে চাইছিলাম। কিন্তু অনেক মিথ্যাচার হয়েছে। "আমার সৎ ভাই ছিল ও," ঢোক গিললাম আমি। "আমার অবৈধ সৎভাই।" চায়ের কাপের দিকে নজর দিলাম। হাতল ধরে নাড়াচাড়া করতে থাকলাম।

"আমি নাক গলাতে চাইনি।"

BanglaBook.org

"নাক গলাচ্ছ না তুমি," বললাম।

"ওকে নিয়ে কী করবে?"

"আবার পেশওয়ারে নিয়ে যাব। ওখানে ওর দেখাশোনা করার মতো লোক আছে।"

ছবিটা ফিরিয়ে দিল ওয়াহিদ। আমার কাঁধে মোটা একটা হাত রাখল। "তুমি একজন সম্মানিত লোক, আমির আগা। সত্যিকারের আফগান।"

তলে তলে কুঁকড়ে গেলাম আমি।

"তোমাকে আজ রাতে আমাদের বাড়িতে পেয়ে গর্বিত বোধ করছি," বলল ওয়াহিদ। ওকে ধন্যবাদ দিয়ে চোরা চোখে একবার ফরিদের দিকে তাকালাম। এখন নিচে তাকিয়ে আছে ও। জাজিমের ক্ষয়ে যাওয়া কিনারা নিয়ে খেলছে।

অল্প কিছুক্ষণ পরে মরিয়াম আর ওর মা ধূমায়িত দুই পেয়ালা সব্জির *শুরুয়া* আর দুই টুকরো রুটি নিয়ে এল। "তোমাকে মাংস দিতে পারছি না বলে আমরা দুঃখিত," বলল ওয়াহিদ। "এখন শুধু তালিবানরাই মাংস খাওয়ার যোগ্যতা রাখে।"

"এটাই তো বেশ চমৎকার লাগছে," বললাম। আসলেও তাই। ওকে, বাচ্চাদের সাধলাম আমি। কিন্তু ওয়াহিদ বলল ওর পরিবার আমরা আসার একটু আগেই খেয়েছে। ফরিদ আর আমি জামার হাতা গুটিয়ে নিলাম। *শুরুয়ায়* রুটি ডুবিয়ে হাত দিয়ে খেতে লাগলাম।

খাওয়ার সময় লক্ষ করলাম কিস্তি টুপির নিচে ছোট করে ছাটা বাদামী চুল আর কাদামাটিতে ভরে থাকা ওয়াহিদের তিন ছেলে চোরা চোখে বারবার আমার ডিজিটাল হাত ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। সবচেয়ে ছোটটি তার ভাইয়ের কানে কানে কি যেন ফিসফিস করে বলল। মাথা দোলাল তার ভাই। আমার ঘড়ির ওপর থেকে চোখ সরাল না। ছেলেগুলোর ভেতর সবচেয়ে বড়টি-মনে হয় বছর বার হবে তার বয়স-সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে, আমার ঘড়ির উপর আঠার মতো লেপ্টে আছে তার চোখ। ডিনারের পর একটা মাটির গামলায় মরিয়ামের ঢেলে দেওয়া পানি দিয়ে হাত মুখ ধোয়ার পর ওয়াহিদকে বললাম আমি ওর ছেলেদের একটা কিছু *হাদিয়া* মানে উপহার দিতে চাই। নিষেধ করল সে। কিন্তু আমি জোর করলে অনীহার সঙ্গে সায় দিল। আমি হাতঘড়ির বেল্ট খুলে সবচেয়ে ছোটটির হাত তুলে দিলাম ওটা। বোকার মতো "*তাশাকোর*" বলে উঠল সে।

"এটা বিভিন্ন শহরের সময় বলবে তোমাকে," ওকে বললাম। ভদ্রভাবে

BanglaBook.org

মাথা দোলাল ছেলেরা। একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে চালান করছে ঘড়িটা। কিন্তু অচিরেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, তারপর পরিত্যক্ত ঘড়িটা খড়ের জাজিমের উপর পড়ে রইল।

"আমাকে কথাটা বলতে পারতে," পরে বলেছিল ফরিদ। ওয়াহিদের স্ত্রী আমাদের জন্যে খড়ের জাজিম পেতে দিয়েছে, তারই উপর পাশাপাশি শুয়ে আছি আমরা।

"কোন কথা?"

"তোমার আফগানিস্তানে আসার কারণ," কণ্ঠস্বর থেকে কর্কশ ভাব বিদায় নিয়েছে। ওর সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকেই সুরটা কানে আসছিল আমার।

"তুমি জিজ্ঞেস করোনি," বললাম আমি।

"তোমারই বলা উচিত ছিল।"

"তুমি জিজ্ঞেস করোনি।"

আমার মুখোমুখি হতে কাত হল ও। "আমি হয়ত ছেলেটাকে খুঁজে বের করতে তোমাকে সাহায্য করব।"

"ধন্যবাদ, ফরিদ," বললাম।

"আমাকে ভুল বুঝেছ।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। "ভেব না। তুমি কতখানি ঠিক বলেছ সেটা তুমি নিজেও জান না।"

ওর হাতজোড়া কোনওমতে *বোনা দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বাঁধা, কব্জির উপর চেপে বসেছে বাঁধন। একটা কালো কাপড়ে চোখজোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে ওর। জমাট পানিতে ভরা একটা নালার কিনারে রাস্তার উপর হাঁটু গেড়ে বসে আছে ও। দুই কাঁধের মাঝখানে ঝুলে পড়েছে ওর মাথা। কঠিন জমিনে পিছল যাচ্ছে ওর পাজোড়া, দোল খেয়ে দোয়া করছে। কাপড় চুইয়ে রক্ত বের হয়ে আসছে। শেষ বিকেল। নুড়ি পাথরের উপর দীর্ঘ ছায়া পড়েছে ওর। নিচু স্বরে কী যেন বিড়বিড় করে বলছে ও। আরেক কদম কাছে। হাজার বার, বিড়বিড় করছে ও।* তোমার জন্যে হাজার বার। *সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে। মুখ তুলল ও। ওর ওপরের ঠোঁটে একটা ক্ষীণ ক্ষত চিহ্ন দেখতে পেলাম।*

আমরা একা নই।

প্রথমেই ব্যারেলটা চোখে পড়ল আমার। তারপর ওটার পেছনের লোকটাকে দেখলাম। লম্বা, ছিট কাপড়ের একটা জোব্বা পরেছে। মাথায় কালো

BanglaBook.org

পাগড়ি। বিশাল অন্ধকার শূন্যতা ভরা চোখে সামনে চোখবাঁধা মানুষটার দিকে তাকাল সে। এক পা পেছনে গিয়ে ব্যারেল উঁচু করে ধরল। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা লোকটার মাথার পেছনে ঠেকাল। এক মুহূর্ত মৃয়মান রোদ ধাতব শরীরের উপর পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল।

প্রবল শব্দে গর্জে উঠল রাইফেলটা।

ব্যারেলটার ঢালু গতিপথ অনুসরণ করলাম আমি। মাযল থেকে বের হয়ে আসা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ওপাশে চেহারটা দেখতে পেলাম। ছিট কাপড়ের জোব্বা পরা লোকটা আমিই।

গলায় আটকে যাওয়া একটা আর্তনাদ নিয়ে জেগে উঠলাম আমি।

বাইরে পা রখলাম আমি। আধখানা চাঁদের রূপালি নিষ্প্রভ অলোয় দাঁড়িয়ে তারায় তারায় খচিত আকাশের দিকে তাকালাম। খানখান হয়ে যাওয়া অন্ধকারে ঝিঁঝি পোকারা ডেকে চলেছে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে হাওয়া বইছে। খালি পায়ের নিচে জমিন ঠাণ্ডা ঠেকছে। সীমানা পেরিয়ে আসার পর এই প্রথম হঠাৎ করে আমার মনে হল আমি ফিরে এসেছি। এতগুলো বছর পরে আবার বাড়ি ফিরে এসেছি আমি। পূর্বপুরুষের জমিনে দাঁড়িয়ে আছি। এই মাটিতেই আমার দাদার দাদা কাবুলে ১৯১৫ সালে ছড়িয়ে পড়া কলেরা মাহমারীতে মারা যাওয়ার এক বছর আগে তিন নম্বর বিয়ে করেছিল। আগের দুই স্ত্রী তাকে যা দিতে পারেনি, সে তাই দিয়েছিল তাকে: অবশেষে একটা ছেলে। এই মাটিতেই আমার দাদা বাদশাহ নাদির শাহ-র সঙ্গে এক শিকার অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিল। একটা হরিণ শিকার করেছিল সে। এই মাটিতে মারা গেছে আমার মা। এই মাটিতেই বাবার ভালোবাসা পেতে লড়াই করেছি আমি।

একটা বাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লাম। পুরোনো দেশের প্রতি বোধ করা এই টানে বিস্মিত হয়েছি। অনেক দিন আগেই এখান থেকে চলে গিয়েছি, ভুলে যাওয়া আর চুকিয়ে দেওয়ার জন্যে লম্বা সময়। এমন এক দেশে এখন আমার ঘর আছে যেটা আমার এই দেয়ালের ওপাশে যারা ঘুমাচ্ছে তাদের পক্ষে ভিন্ন কোনও গ্রহের বলে মনে হবে। ভেবেছিলাম এই দেশের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আসলে ভুলিনি। আধখানা চাঁদের শাদাটে আভার নিচে মনে হল আফগানিস্তান যেন আমার পায়ের নিচে গুনগুন করে গান গাইছে। হয়ত আফগানিস্তানও আমাকে ভুলে যায়নি।

পশ্চিমে চোখ ফেরালাম আমি, মনে মনে ভাবলাম ওই যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলোর ওপাশে কোথাও এখন আছে কাবুল। সত্যি ওটা

BanglaBook.org

অস্তিত্ববান, কেবল স্মৃতি বা *স্যান ফ্রান্সিস্কো ক্রনিকলস*-এর ১৫ পাতায় *এপির* কোনও খবরের শিরোনামে নয়। ওই পাহাড়গুলোর ওপাশে পশ্চিমে কোথাও আছে সেই শহর যেখানে আমি আর আমার ঠোঁটকাটা ভাইটি ঘুড়ির পেছনে ছুটে বেরিয়েছি। ওখানে কোথাও আমার স্বপ্নে দেখা চোখ বেঁধে রাখা লোকটা খামোকা মরণকে বরণ করে নিয়েছে। একবার ওই পাহাড়গুলোর ওপাশে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম আমি। এখন পঁচিশ বছর পরে সেই সিদ্ধান্তই আমাকে ঠিক এই মাটিতে ফিরিয়ে এনেছে।

ঘরে ফিরে যাব এমন সময় ভেতর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর কানে এল। একটা গলা ওয়াহিদের বলে চিনতে পারলাম।

"–বাচ্চাদের জন্যে কিছু বাকি নেই।"

"ক্ষুধার্ত হলেও আমরা অসভ্য নই! ও একজন মেহমান! আমার কী করার ছিল?" চাপা গলায় বলল সে।

"–আগামীকাল একটা কিছু খুঁজে বের করতে..." কাঁদে কাঁদো শোনাল মহিলার কণ্ঠস্বর। "কী খাওয়াব আমি–"

পা টিপে টিপে সরে এলাম আমি। এখন বুঝতে পারলাম ছেলেরা ঘড়ির দিকে কেন তেমন একটা আগ্রহ দেখায়নি। আসলে মোটেই ঘড়ির দিকে তাকায়নি ওরা। আমার খাবারের দিকে তাকিয়ে ছিল।

পরদিন বেশ সকাল সকাল বিদায় নিলাম আমরা। ল্যান্ডক্রুজারে ওঠার ঠিক আগ মুহূর্তে ওয়াহিদকে তার আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। পেছনের ছোট বাড়িটার দিকে ইশারা করল সে। "এটা তোমারই বাড়ি," বলল। ওর তিন ছেলে দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছিল। ছোটটির হাতে ঘড়িটা। ওর সরু হাতে ঝুলছিল ওটা।

চলে আসার সময় সাইড ভিউ মিররের দিকে তাকালাম আমি। ট্রাকের চাকার ঘায়ে ওড়া ধূলোর মেঘের ভেতর ছেলেদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওয়াহিদ। আমার মনে হল ভিন্ন কোনও জগতে এই ছেলেরা গাড়ির পিছু নেওয়ার মতো তেমন ক্ষুধার্ত হবে না।

সেদিনই আরও সকালে কেউ দেখছে না নিশ্চিত হয়ে ছাব্বিশ বছর আগে করেছিলাম এমন একটা কাজ করেছি আমি: একটা জাজিমের নিচে একমুঠো টাকা রেখে দিয়েছি।

বি শ

ফরিদ সাবধান করে দিয়েছিল আমাকে। করেছিল বটে। কিন্তু দেখা গেল অযথা কথা খরচ করেছে সে।

জালালাবাদ থেকে কাবুলের দিকে চলে যাওয়া ক্ষত-বিক্ষত রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। শেষবার যখন এই পথে গিয়েছি, তখন একটা তারপুলিন ঢাকা ট্রাকে ছিলাম, উল্টো দিকে যাচ্ছিল সেটা। আরেকটু হলেই গান গাইতে থাকা পাথরের মতো এক *রাউসি* সৈন্যর হাতে গুলি খেয়ে মরতে বসেছিল বাবা। সেরাতে আমাকে অনেক খেপিয়ে দিয়েছিল বাবা, ভয়ও পেয়েছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত গর্ব বোধ করেছি। কাবুল থেকে জালালাবাদে যাওয়ার সেই ঘটনা পাহাড়ের ভেতরে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া পাসের ভেতর দিয়ে হাড়মাংস কিমা করে দেওয়া সেই স্মৃতি এখন রেলিকে পরিণত হয়েছে। দুটো যুদ্ধের রেলিক। বিশ বছর আগে প্রথম যুদ্ধের খানিকটা নিজের চোখে দেখেছি আমি। তারই কিছু ভয়াবহ স্মৃতি চিহ্ন এখনও পড়ে আছে রাস্তায়: পুরোনো সোভিয়েত ট্যাঙ্কের পোড়া অবশেষ, উল্টে পড়া মিলিটারি ট্রাকে মরচে পড়তে চলেছে, পাহাড়ের উপর থেকে উল্টে পড়া একটা রাশিয়ান জীপ। দ্বিতীয় যুদ্ধ টিভির পর্দায় দেখেছি আমি। এখন ফরিদের চোখে সেটা দেখতে পাচ্ছি।

অনায়াসে ভাঙা-চোরা রাস্তার মাঝখানে নানা গর্ত এড়িয়ে যাচ্ছে ফরিদ, কোনও বিকার নেই। ওয়াহিদের বাড়িতে রাত কাটানোর পর আগের চেয়ে ঢের বেশী কথা বলছে সে এখন। আমাকে প্যাসেঞ্জার সিটে বসিয়েছে, কথা বলার সময় পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। আমার দিকে ফিরে দু-একবার হেসেছেও। পঙ্গু

BanglaBook.org

হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে মাটির ঘরের গ্রামের দিকে ইঙ্গিত করছে সে। ওখানকার লোকজনকে অনেক বছর আগে থেকেই চেনে সে। বেশীরভাগ লোকই, বলেছে সে, হয় মারা গেছে, কিংবা পাকিস্তানের রিফিউজি ক্যাম্পে আছে। "অনেক সময় যারা মারা যায় তারাই ভাগ্যবান," বলল সে।

একটা ছোট গ্রামের দোমড়ানো মোচড়ানো পোড়া অবশেষের দিকে ইশারা করল সে। এখন স্রেফ ছাদহীন কালো দেয়ালের এক চিলতে জায়গা মাত্র। একটা দেয়ালের পাশে শুয়ে আছে একটা কুকুর। "এখানে এককালে আমার এক বন্ধু ছিল," বলল ফরিদ। "বেশ ভালো বাইসাইকল মেরামত করতে পারত সে। তবলাও ভালো বাজাত। তালিবানরা ওকে আর ওর পরিবারকে খুন করেছে। পুড়িয়ে দিয়েছে গোটা গ্রাম।"

পোড়া গ্রাম পেছনে ফেলে এলাম আমরা। কুকুরটা নড়ল না।

আগের দিনে জালালাবাদ থেকে কাবুল যেতে দুই ঘণ্টা বা সামান্য বেশী সময় লাগত। ফরিদ আর আমার কাবুলে পৌঁছতে চার ঘণ্টারও বেশী লেগে গেল। যখন পৌঁছালাম...আমরা মাহিপুর ড্যাম পার হওয়ার পরপরই আমাকে সতর্ক করে দিল ফরিদ।

"কাবুল এখন আর তোমার সেই পুরোনো শহরটি নেই," বলল সে।

"সেরকমই শুনেছি।"

ফরিদ এমনভাবে তাকাল যেন বলতে চায় শোনা আর দেখা এক কথা নয়। ঠিকই বলেছিল ও। কারণ শেষ পর্যন্ত কাবুল আমাদের সামনে এসে পড়ল, আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, পুরোপুরি নিশ্চিত, কোথাও ভুল বাঁক নিয়ে বসেছে সে। নির্ঘাত আমার চেহারায় হতবুদ্ধিকর ভাবটা দেখেছিল ফরিদ, কাবুলে লোকজন আনা নেওয়া করতে অভ্যস্ত বলে যারা অনেক দিন কাবুল দেখেনি তাদের চোখের ভাব কী অর্থ বহন করে তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল সে।

আমার কাঁধে চাপড় দিল সে। "আবার স্বাগতম," বলল সে।

হতদরিদ্র আর ভিখেরি। যেদিকে তাকাচ্ছি এদেরকেই দেখতে পাচ্ছি কেবল। আগের দিনেও ফকির দেখার কথা মনে আছে। ওদের দেওয়ার জন্যে বাবা সব সময়ই পকেটে বাড়তি কিছু আফগান টাকা রাখত। আমি কখনওই কোনও ফেরিঅলাকে বিমুখ করতে দেখিনি ওকে। এখন যদিও রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে আছে এরা, পরনে ছেঁড়া বারল্যাপ বস্তা, কাদামাখা হাত বাড়িয়ে রেখেছে একটা পয়সার জন্যে; এখন বেশীরভাগ ফকিরই ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। শুকনো

BanglaBoi.org

বিষণ্ণ চেহারা ওদের। অনেকের বয়সই পাঁচ–ছয় বছরের বেশী হবে না। ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে নালার পাশে *বুরকা* পরা মায়ের কোলে বসে আছে, একসুরে বলে চলেছে, "*বকশিশ, বকশিশ!*" আরেকটা ব্যাপারও আছে, যেটা প্রথমেই চোখে পড়েনি, খেয়াল করিনি আমি। ওদের খুব কমই কোনও পুরুষের সঙ্গে বসেছে। যুদ্ধ আফগানিস্তানে বাবাকে এক বিরল পণ্যে পরিণত করেছে।

পশ্চিমে কার্থে-সেহ-র দিকে যাচ্ছিলাম আমরা। সত্তর দশকে একটা প্রধান লোকালয় ছিল এখানে: জাদেহ মেওয়ান্দ। আমাদের ঠিক উত্তরে হাড়ের মতো শুকনো খটখটে কাবুল নদী। দক্ষিণের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শহরের ভাঙা প্রাচীর। ওটার ঠিক পুবেই শারদরওয়াযা পর্বতমালার উপর রয়েছে বালা হিসার দুর্গ–প্রাচীন দুর্গ, ১৯৯২ সালে যুদ্ধ-সর্দার দোস্তম দখল করে নিয়েছিল ওটা–এই একই পাহাড়সারি থেকে *মুজাহিদিন* বাহিনী ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কাবুলের উপর রকেট বৃষ্টি ঝরিয়েছিল। এখন আমার চোখে ধরা পড়া বেশীরভাগ ক্ষত সৃষ্টি করেছিল ওরা। শারদরওয়াযা পর্বতমালা সোজা পশ্চিমে চলে গেছে। এই পর্বতমালা থেকেই *তোপে চাশত*–"দুপুরের কামান"–এর গুলি বর্ষণের কথা মনে আছে আমার। রোজ দুপুর *নামাযের* সময় হয়েছে ঘোষণা দেওয়ার জন্যে গোলা বর্ষণ করা হত। আবার *রমযান* মাসে দিনের আলো শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার জন্যেও কাজে লাগানো হত ওটা। সেইসব দিনে তুমি সারা শহরে সেই গেলাবর্ষণের শব্দ শুনতে পেতে।

"ছোটবেলায় এখানে জাদেহ মেওয়ান্দে আসার কথা আমার মনে আছে," বিড়বিড় করে বললাম। "এখানে দোকান-পাট আর হোটেল ছিল। নিওন লাইট আর রেস্তঁরা। সাইফু নামে এক বুড়ো লোকের কাছ থেকে ঘুড়ি কিনতাম আমি। পুলিস হেডকোয়ার্টারের পাশে একটা ছোট ঘুড়ির দোকান ছিল তার।"

"পুলিস হেডকোয়ার্টার এখনও আছে," বলল ফরিদ। "এই শহরে পুলিসের কোনও অভাব নেই। কিন্তু জাদেহ মেওয়ান্দ বা কাবুলের কোথাও তুমি কোনও ঘুড়ি বা ঘুড়ির দোকানের দেখা পাবে না। সেই দিন আর নেই।"

জাদেহ মেওয়ান্দ একটা বিরাট বালির দুর্গে পরিণত হয়েছে। পুরোপুরি ধসে পড়েনি যেসব দলানকোঠা সেগুলো কোনওমতে দাঁড়িয়ে আছে। রকেটের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন দেয়াল আর ছাদ ধসে পড়েছে। আস্ত ব্লকই ধংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে। আবর্জনার স্তূপে কেনাকুনি পড়ে থাকা বুলেটের ঘায়ে ঝাঁঝড়া হয়ে যাওয়া একটা সাইন বোর্ড দেখতে পেলাম; লেখা রয়েছে কোকাকোলা পান করুন–, এবড়োখেবড়ো ইট আর পাথরের খুঁটির মাঝে একটা জানালাবিহীন দালানের ধংসস্তূপে ছেলেদের খেলতে দেখলাম। বাইসাইকল চালক আর

BanglaBook.org

গাধায় টানা ঠেলাগাড়ি বাচ্চা, বেওয়ারিশ কুকুর আর আবর্জনার স্তূপ পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। শহরের উপরে ধোঁয়াশা ঝুলে রয়েছে। নদীর ওপাশে ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

"গাছপালার কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"শীতকালে লাকড়ির জন্যে কেটে ফেলেছে," বলল ফরিদ। "*শোরোভিরাও* অনেক গাছপালা কেটেছে।"

"কেন?"

"স্নাইপাররা গাঢাকা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করে, তাই।"

আমার মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠল। কাবুলে ফিরে আসাটা ছিল বিস্মৃত কোনও বন্ধুর কাছে ফিরে আসার মতো, জানতে পারা জীবন তার সুখে কাটেনি। যেন উন্মূল, দুস্থ হয়ে পড়েছে।

"এখান থেকে দক্ষিণে পুরোনো শহর শার-ই-কোহনায় একটা এতীমখানা দিয়েছিল বাবা," বললাম।

"আমার মনে আছে," বলল ফরিদ। "কয়েক বছর আগে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে ওটা।"

"একটু থামতে পারবে?" জিজ্ঞেস করলাম। "এখানে চট করে একটু হেঁটে নিতে চাই।"

দরজাহীন একটা জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে ফুটপাথ ঘেঁষে গাড়ি থামাল ফরিদ। "ওটা একটা ফার্মাসি ছিল," ট্রাক থেকে বের হওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলল ফরিদ। পায়ে হেঁটে জাদেহ মেওয়ান্দে ফিরে এলাম আমরা, তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে পশ্চিমে পা বাড়ালাম। "গন্ধটা কীসের?" জানতে চাইলাম। কিছু একটা আমার চোখে জল নিয়ে আসছে।

"ডিজেল," জবাব দিল ফরিদ। "শহরের জেনারেটরগুলো সবক্ষণই নষ্ট থাকে। ফলে ইলেক্ট্রিসিটির উপর কোনও ভরসা নেই। লোকে তাই ডিজেল ব্যবহার করে।"

"ডিজেল। আগের দিনে এই রাস্তায় কীসের গন্ধ পাওয়া যেত মনে আছে?"

হাসল ফরিদ। "কাবাব।"

"ভেড়ার কাবাব," বললাম আমি।

"ভেড়া," বলল ফরিদ, মুখের ভেতরে যেন শব্দটার স্বাদ নিচ্ছে। "কাবুলে এখন কেবল তালিবানরাই ভেড়ার মাংস খেতে পারে।" আমার শার্টের হাতা ধরে টান দিল সে। "বলতে না বলতেই..."

আমাদের দিকে একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। "দাড়িঅলা প্যাট্রল,"

BanglaBook.org

বিড়বিড় করে বলল ফরিদ।

প্রথমবারের মতো তালিবানদের দেখলাম আমি। টিভি পর্দায়, খবরের কাগজের পাতায়, ইন্টারনেটে, ম্যাগাজিনের কাভারে ওদের দেখেছিলাম। কিন্তু এখন এখানে রয়েছি আমি, ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুটেরও কম দূরত্বে। নিজেকে বোঝাচ্ছি আমার মুখের ভেতরের স্বাদটা নির্ভেজাল নগ্ন আতঙ্কের নয়। নিজেকে বলছি আমার শরীরের মাংস হঠাৎ করে হাড়ের সঙ্গে লেপ্টে যায়নি। আমার হৃৎপিণ্ড ধড়াশ ধড়াশ করছে না। ওই আসছে ওরা। ওদের সমস্ত গৌরব নিয়ে।

লাল টয়োটা পিকআপ ট্রাকটা আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ক্যাবে কয়েকজন কঠোর চেহারার তরুণ গোড়ালিতে ভর দিয়ে বসে আছে। ওদের কাঁধে কালাশনিকভ ঝুলছে। সবার মুখে দাড়ি, মাথায় কালো পাগড়ি। ওদের মধ্যে একজন, শ্যামলা বর্ণের বিশের গোড়ার দিকে হবে তার বয়স, ভুরুজোড়া পাক খাওয়া, হাতে একটা চাবুক ঘোরাচ্ছে আর সেটা দিয়ে ট্রাকের পাশে তাল ঠুকছে। আমার উপর এসে পড়ল তার অস্থির দৃষ্টি। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। সারা জীবনে কোনও দিন নিজেকে এমন নগ্ন বলে মনে হয়নি আমার। তারপর তামাক ভরা থুতু ফেলে অন্যদিকে চোখ ফেরাল তালিব। আবার নিঃশ্বাস নিতে পারছি বলে মনে হল আমার। ট্রাকটা জাদেহ্ মেওয়ান্দ ধরে চলে গেল, পেছনে পড়ে রইল ধুলোর একটা মেঘ।

"তোমার কী হয়েছে?" হিসহিস করে উঠল ফরিদ।

"কী?"

"কক্ষনও ওদের দিকে তাকাবে না! বুঝেছ? কখনও না!"

"ইচ্ছে করে তাকাইনি," বললাম।

"তোমার বন্ধু ঠিকই বলেছে, এরচেয়ে বরং কোনও পাগলা কুকুরকে লাঠি দিয়ে গুতোনো ঢের ভালো," বলল কে যেন। বুলেটের ঘায়ে ঝাঁঝড়া একটা দালানের সিঁড়ির উপর খালি পায়ে বসে থাকা এক ফকিরের কণ্ঠস্বর এটা। একেবারে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাওয়া *চাপান* আর মাটির দাগঅলা পাগড়ি পরে আছে সে। বাম চোখের পাতাটা শূন্য কোটরে লুটিয়ে পড়েছে। আথরাইটিক হাতে লাল ট্রাকটা যেদিকে চলে গেছে সেদিকে ইশারা করল সে। "ওরা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর নজর রাখে। আশায় থাকে কেউ না কেউ ওদের উস্কানি দেবে। আগে বা পরে, কেউ না কেউ সেটা করেও। তখন কুকুরগুলো আনন্দে মেতে ওঠে। সারাদিনের একঘেয়েমি অবশেষে কেটে যায়। সবাই বলে ওঠে *"আল্লাহু আকবার!"* যখন কেউ ওদের কিছু বলে না, তবুও একটা না একটা সহিংস ঘটনা

BanglaBook.org

ঘটেই, তাই না?"

"তালিবানরা ধারে-কাছে থাকলে চোখ পায়ের দিকে রাখবে," বলল ফরিদ।

"তোমার বন্ধু ঠিক পরামর্শই দিচ্ছে," বলে উঠল বুড়ো ফকির। শুকনো গলায় কেশে উঠল সে। একটা ময়লা রুমালে থুতু ফেলল। "মাফ করবে, কিন্তু আমাকে কয়েকটা আফগানি দিতে পারো?" দম নিয়ে বলল সে।

"*ব্যস*, চলো যাই," আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল ফরিদ।

বুড়ো লোকটার হাতে লাখ খানেক আফগানি বা তিন ডলারের মতো তুলে দিলাম। সে টাকাটা নেওয়ার জন্যে যখন সামনে ঝুঁকল, তার গায়ের দুর্গন্ধ–টক দুধ আর অনেকগুলো সপ্তাহ না ধোয়া পায়ের গন্ধ যেন–আমার নাক ভরে দিল। পেট গুলিয়ে উঠল আমার। ঝটপট টাকাটা কোমরে পাঠিয়ে দিল সে। তার একমাত্র চোখটা এপাশ ওপাশ নড়ছে। "তোমার মেহেরবানীর জন্যে অনেক ধন্যবাদ, আগা সাহিব।"

"কার্তে-সেহর এতীমখানাটা কোথায় বলতে পারো?" জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

"খুঁজে পাওয়া কঠিন না। দারুলামান ব্যুলেভার্দের ঠিক পশ্চিমেই," বলল সে। "এতীমখানায় রকেট এসে পড়ার পর ছেলেদের কার্তে-সেহ-তে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা অনেকটা কাউকে সিংহের খাঁচা থেকে বের করে বাঘের খাঁচায় ছেড়ে দেওয়ার মতো।"

"ধন্যবাদ, আগা," বললাম আমি, বিদায় নেওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম।

"এটাই তোমার প্রথম দফা, না?"

"দুঃখিত?"

"প্রথমবারের মতো তালিব দেখলে।"

কিছু বললাম না। মাথা দুলিয়ে হাসল বুড়ো ফকির। আঁকাবাঁকা কালো অল্পকটা দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। "প্রথমবার ওদের কাবুলে আসার কথা আমার মনে অছে। কি যে আনন্দের দিন ছিল সেটা!" বলল সে। "খুনখারাবির শেষ! বাহ! বাহ! কিন্তু কবি যেমন বলেছেন: 'ভালোবাসাকে মনে হয়েছিল অন্তহীন, কিন্তু তারপরেই এল ঝামেলা!"

আমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। "এই *গযলটা* আমার জানা। হাফিযের।"

"হ্যাঁ, ঠিক তাই," জবাব দিল বুড়ো। "আমারই জানার কথা। কারণ ইউনিভার্সিটিতে পড়াতাম আমি।"

"পড়াতে?"

BanglaBoi.org

কেশে উঠল বুড়ো। "১৯৫৮ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত। আমি হাফিয, খৈয়াম, রুমি, বেইদেল, সাদি পড়িয়েছি। একবার তেহরানে গেস্ট লেকচারারও হয়েছিলাম। সেটা ছিল ১৯৭১ সালে। মরমী বেইদেলের উপর লেকচার দিয়েছিলাম আমি। মনে আছে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত তালি দিয়েছিল। হা!" মাথা নাড়ল সে। "কিন্তু ট্রাকের উপর ওই তরুণদের দেখলে না। ওরা *সুফি*বাদের কী দাম দেয়?"

"আমার মা ইউনিভার্সিটিতে পড়াত," বললাম আমি।

"কী নাম ছিল তার?"

"সুফিয়া আকরাম।"

ছানির পর্দা ভেদ করে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার চোখের তারা। "'মরুভূমির আগাছা বেঁচে থাকে, কিন্তু বসন্তের ফুল ফুটে আবার মরে যায়।' এমন জৌলুশ, এমন মর্যাদা, এমন করুণ ঘটনা।"

"মাকে চিনতে তুমি?" বুড়োর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জানতে চাইলাম।

"হ্যাঁ, অবশ্যই," বুড়ো ভিখেরি বলল। "আমরা ক্লাস শেষে একসঙ্গে বসে আলাপ করতাম। শেষবার এক বৃষ্টিভেজা দিনে ফাইনাল পরীক্ষার আগে আগে আমরা একটা আখরোট কেকের টুকরো ভাগাভাগি করে খেয়েছি। চা আর মধু দিয়ে আখরোটের কেক। তখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল প্রেগনেন্ট সে। আগের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর লাগছিল ওকে। সেই দিন ওর বলা সেই কথাটা কোনওদিন ভুলব না আমি।"

"কী? দয়া করে বলো আমাকে।" বাবা সব সময় মোটাদাগে মায়ের কথা বলেছে আমাকে, যেমন: "অনেক মহান মানুষ ছিল ও।" কিন্তু আমি সব সময়ই আরও বিস্তারিত কিছু শোনার জন্যে লালায়িত ছিলাম। রোদের আলো কীভাবে ওর চুলে ঝিলিক খেলত, ওর প্রিয় আইসক্রিম ফ্লেভারটা কী, গুনগুন স্বরে কী গান গাইতে পছন্দ করত ও। হয়ত মায়ের নাম উচ্চারিত হলেই পাপের কথা মনে পড়ে যেত ওর। মনে পড়ে যেত মা মারা যেতে না যেতেই সে কী করেছে। কিংবা তার বেদনা এত প্রবল ছিল আর ক্ষতিটা এমন গভীর ছিল যে, মায়ের কথা বলতে চাইত না সে। হয়ত দুটোই।

"বলেছিল,'আমার অনেক ভয় লাগছে।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?' তখন ও বলেছে, 'কারণ আমি এতো গভীরভাবে সুখী, ডক্টর রসুল সেজন্যে। এমন সুখ খুবই ভয়ের।' ওকে জিজ্ঞেস করেছি কেন। ও তখন বলেছে, 'তোমার কাছ থেকে একটা কিছু কেড়ে নেওয়ার আগেই ওরা তোমাকে এমন সুখ দেয়।' আমি বলেছি, 'আরে রাখ, অনেক বাজে আলাপ হয়েছে।'"

BanglaBook.org

আমার হাত ধরল ফরিদ। "আমাদের যাওয়া দরকার, আমির আগা," মৃদু স্বরে বলল সে। জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিলাম আমি। "আর কী? আর কী বলেছিল ও?"

বুড়োর চেহারা কোমল হয়ে উঠল। "তোমাকে বলার জন্যে মনে রাখতে পারলে ভালো হত, বাবা। কিন্তু মনে নেই। অনেক দিন হয় মারা গেছে তোমার মা। আমার স্মৃতিও এইসব দালানকোঠার মতো শেষ হয়ে গেছে। আমি দুঃখিত।"

কিন্তু ছোটখাট কোনও কথা হলেও বলো। যেকোনও কিছু।"

হাসল বুড়ো। "মনে করার চেষ্টা করব আমি। কথা দিচ্ছি। আবার এসে আমাকে খুঁজে বের করো।"

"ধন্যবাদ," বললাম। "অনেক ধন্যবাদ।" মন থেকেই বললাম কথাটা। এখন আমি জানি আমার মা চায়ের সঙ্গে আখরোটের কেক, মধু খেতে পছন্দ করত, একবার "গভীর" কথাটা ব্যবহার করেছিল, নিজের সুখ নিয়ে বড়াই করেছে। বাবার কাছ থেকে সারা জীবনে যা জানতে পারিনি রাস্তার ধারের এই লোকটার কাছ থেকে মায়ের কথা তার চেয়ে বেশী জানতে পেরেছি আজ।

ট্রাকের কাছে ফিরে যাবার সময় আমরা কেউই বেশীর ভাগ অ-আফগান যে রাস্তার কোনও ভিখেরির মাকে চিনতে পারার একটা অসম্ভব ঘটনাকে কাকতালীয় যোগাযোগ বলে ভাবতে পারে তা নিয়ে কথা বললাম না। কারণ আমরা দুজনই জানি যে আফগানিস্তানে, বিশেষ করে কাবুলে এই ধরনের অসম্ভব ব্যাপার সম্ভবপর। বাবা প্রায়ই বলত, "কখনও দেখা হয়নি এমন দুজন আফগানকে একটা ঘরে আটকে রাখ, তারপর দশ মিনিট পার হতে দাও, ওরা বের করে ফেলবে কোথায় ওদের সম্পর্ক আছে।"

দালানের সিঁড়িতে বুড়ো লোকটাকে ফেলে এলাম আমরা। আমার ইচ্ছে ছিল তার কথা মতো আবার ফিরে এসে মা সম্পর্কে আর কোনও তথ্য দিতে পারে কিনা সেটা জানার। কিন্তু আর কখনও তার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।

শুকিয়ে যাওয়া কাবুল নদীর পারে কার্থে-সেহ্-তে নতুন এতীমখানার খোঁজ পেলাম আমরা। চ্যাপ্টা ব্যারাক স্টাইলের একটা দালান, কাঠের তক্তা দিয়ে ঢাকা স্প্লিন্টারড দেয়াল আর জানালা রয়েছে ওটার। এখানে আসার পথে ফরিদ আমাকে বলেছে যে কার্থে-সেহ্ কাবুলের অন্যতম যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা মহল্লা। ট্রাক থেকে নামার সময় তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পেলাম। খানাখন্দে ক্ষতবিক্ষত রাস্তার দুপাশে শেলের ঘায়ে ধসে পড়া এবং পরিত্যক্ত দালানের

অবশেষ পড়ে আছে। একটা উল্টানো গাড়ির মর্চে পড়া কঙ্কাল, আবর্জনায় অর্ধেক দেবে থাকা একটা টিভি সেট, কালো রঙ স্প্রে করে যিন্দাবাদ তালিবান। (তালিবান দীর্ঘজীবী হোক!) লেখা একটা দেয়াল পার হয়ে এলাম আমরা।

ছোটখাটো হ্যাংলাপাতলা গড়নের উস্কোখুস্কো দাড়িঅলা একলোক দরজা খুলে দিল। পুরোনো টুইডের জ্যাকেট তার পরনে, মাথায় খুলির সঙ্গে লেপ্টানো টুপি, চোখে ঘঁষা খাওয়া লেন্সের চশমা, নাকের উপর ঝুলে আছে। চশমার ওপাশ থেকে মটরদানার মতো ছোট ছোট চোখজোড়া পালা করে একবার আমার দিকে আরেকবার ফরিদের দিকে তাকাতে লাগল। "*সালাম আলাইকুম,*" বলল সে।

"*সালাম আলাইকুম,*" বললাম। পোলারয়েডটা দেখালাম তাকে। "এই ছেলেটাকে খুঁজছি আমরা।"

ছবির দিকে দায়সারাভাবে একবার তাকাল সে। "দুঃখিত। একে কখনও দেখিনি।"

"দোস্ত, ছবিটার দিকে ভালো করে তাকাওইনি তুমি," বলল ফরিদ। "ভালো করে একবার দেখো না কেন?"

"*লুৎফান,*" যোগ করলাম আমি। প্লিজ।

দরজার ওপাশের লোকটা ছবির দিকে তাকাল। পরখ করল। আমার কাছে ফিরিয়ে দিল তারপর। "না, দুঃখিত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটা ছেলেকে চিনি আমি। একে চেনা বলে মনে হচ্ছে না। এবার তোমরা অনুমতি দিলে আমি আমার কাজে ফিরে যাই। অনেক কাজ পড়ে আছে।" দরজা আটকে তালা আটকে দিল সে।

আঙুলের গিঁট দিয়ে আবার দরজায় আঘাত করলাম আমি। "আগা! আগা। দয়া করে দরজা খোল। আমরা কোনও ক্ষতি করতে আসিনি।"

"বলেছি তো। এখানে নেই ও," অন্যপাশ থেকে এল কণ্ঠস্বর। "এবার দয়া করে যাও।"

দরজার কছে এসে কবাটে মাথা রাখল ফরিদ। "দোস্ত, আমরা তালিবানদের কেউ নই," নিচু সতর্ক কণ্ঠে বলল সে। "আমার সাথের এই ভদ্রলোক ছেলেটাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে চায়।"

"পেশওয়ার থেকে এসেছি আমি," বললাম। "আমার এক পুরোনো বন্ধু ওখানে এক আমেরিকান পরিবারকে চেনে যারা বাচ্চাদের জন্যে একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালায়।" দরজার ওপাশে লোকটার উপস্থিতি টের পাচ্ছিলাম আমি। ওপাশে দাঁড়িয়ে মনযোগ দিয়ে শুনছিল। ইতস্তত করছে। সন্দেহ আর আশার

BanglaBook.org

দোলাচলে দুলছে। "দেখ, সোহরাবের বাবাকে আমি চিনতাম," বললাম। "ওর নাম হাসান। ওর মায়ের নাম ছিল ফারজানা। দাদীকে ও *সাসা* ডাকত। ও লেখাপড়া জানে। গুলতিতে দারুণ হাত ওর। এই ছেলেটার একটা আশা আছে, আগা, বাঁচার একটা উপায় আছে। দয়া করে দরজাটা খোল।"

দরজার ওপাশে কেবলই নীরবতা।

"আমি ওর সৎচাচা," বললাম আমি।

একটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল। তারপর দরজার তালায় চাবি ঘুরল। ফোকরে দেখা দিল লোকটার সরু চেহারা। পালা করে ফরিদ আর আমার দিকে তাকাল সে। "একটা জিনিস ভুল বলেছ তুমি।"

"কোনটা?"

"গুলতিতে ও সবার *সেরা*।"

আমি হাসলাম।

"ওকে ওই জিনিস থেকে আলাদা করা যায় না। যেখানেই যায় ওটা কোমরে গুঁজে তারপর বের হয় সে।"

আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিল লোকটা। নিজের পরিচয় দিল যামান বলে। এতীমখানার পরিচালক। "তোমাদের আমার অফিসে নিয়ে যাচ্ছি।" বলল সে।

ম্লান বিষণ্ন হলওয়ে ধরে ওকে অনুসরণ করে এগোলাম আমরা। জীর্ণ স্যুয়েটার গায়ে ছোট ছোট বাচ্চারা এখানে ঘুরঘুর করছে। ম্যাটেড কার্পেট ছাড়া আর কোনও ফ্লোর কাভারিং নেই। জানালাগুলো প্লাস্টিকের টুকরো দিয়ে ঢাকা। ধাতব খাটের কাঠামো ভরে রেখেছে রুমগুলো, বেশীর ভাগেরই কোনও জাজিম নেই।

"এখানে কয়জন এতীম থাকে?" জানতে চাইল ফরিদ।

"আমাদের রুমের চেয়ে ঢের বেশী। প্রায় আড়াইশো হবে," কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে বলল যামান। "কিন্তু ওরা সবাইই *এতীম* নয়। ওদের বেশীরভাগই যুদ্ধে বাবাকে হারিয়েছে, এখন তালিবানরা কাজ করতে দেয় না বলে মায়েরা ওদের খাওয়াতে পারছে না। সেজন্যে বাচ্চাদের এখান নিয়ে এসেছে ওরা।" হাত ছড়িয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করল সে, তারপর বিমর্ষ কণ্ঠে বলল, "এটা রাস্তার চেয়ে ঢের ভালো। তবে খুব বেশী ভালো না। এই দালানটা কখনও মানুষের বসবাসের উপযোগী ছিল না। কার্পেট বানিয়েদের একটা গুদাম ছিল এটা। ফলে এখানে কোনও ওয়াটার হীটার নেই। ওরা কূয়োটাকে শুকিয়ে যেতে দিয়েছে।" গলা নামাল সে। "তালিবানদের কাছে কূয়োটা আবার খনন

BanglaBook.org

করার জন্যে কতবার যে টাকা চেয়েছি, ইয়ত্তা নেই। ওরা স্রেফ তজবীহ্ জপতে জপতে বলেছে ওদের কাছে টাকা নেই। টাকা নেই।" নাক সিঁটকাল সে।

দেয়াল বরাবর একসারি খাটের দিকে ইঙ্গিত করল সে। "আমাদের যথেষ্ট খাট নেই। যত খাট আছে তত জাজিমও নেই। আরও খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের কাছে কোনও কম্বল নেই।" অন্য দুটো বাচ্চার সঙ্গে স্কিপিং রোব জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকা একটা ছোট মেয়েকে দেখাল সে। "ওই মেয়েটাকে দেখছো? গত শীতে বাচ্চাদের কম্বল ভাগাভাগি করতে হয়েছে। ওর ভাইটি ঠাণ্ডায় মারা গেছে।" হেঁটে চলল সে। "শেষবার যখন পরীক্ষা করেছি, গুদামে একমাসেরও কম সময়ের খাবার মওজুত ছিল। এই খাবার ফুরিয়ে গেলে বাচ্চাদের সকালের নাশতা আর ডিনারে রুটি আর চা খেতে হবে।" লক্ষ করলাম দুপুরের খাবারের কথা বলেনি সে।

দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে তাকাল সে। "এখানে আশ্রয় বলতে কিছু নেই। কোনও খাবার নেই, কাপড়চোপড় নেই, পরিষ্কার পানি নেই। আছে অফুরন্ত বাচ্চাদের সাপ্লাই, এইসব বাচ্চা তাদের ছেলেবেলা হারিয়ে ফেলেছে।" আমার দিকে এক কদম এগিয়ে এল সে। "তুমি বলছ সোহরাবের একটা আশা আছে? আশা করি তুমি মিথ্যে বলছ না, আগা। কিন্তু...তুমি হয়ত অনেক দেরি করে ফেলেছ।"

"কী বলতে চাইছ?"

চোখ সরে গেল যামানের। "আমার সঙ্গে এসো।"

পরিচালকের অফিস হিসাবে যে-ঘরটাকে চালানো হচ্ছে সেটা চারটে নাঙা দেয়াল, মেঝের উপর একটা ম্যাট, একটা টেবিল আর দুটো ফোল্ডিং চেয়ারের সমষ্টি মাত্র। আমি আর যামান বসার পরপরই খেয়াল করলাম দেয়ালে একটা গর্ত থেকে মাথা বের করে উঁকি দিচ্ছে ধূসর রঙা একটা ইঁদুর। মেঝের উপর দিয়ে ছুটে এল ওটা। আমার জুতো শোঁকার সময় শিউরে উঠলাম। এরপর যামানের পা শুঁকল ওটা। তারপর খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

"অনেক দেরী হয়ে গেছে বলে কী বোঝাতে চাইছ?" বললাম।

"চায়ে খাবে? আমি বানাতে পারব।"

"না, ধন্যবাদ। আমরা বরং কথা বলি।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল যামান। বুকের উপর আড়াআড়ি করে হাত বাঁধল। "তোমাকে যে কথা বলতে চাইছি সেটা খুব খুশীর খবর নয়। বরং বেশ বিপজ্জনকও হতে পারে।"

BanglaBook.org

"কার জন্যে?"

"তোমার। আমার। আর সোহরাবের জন্যে তো বটেই। এরই মধ্যে যদি অনেক দেরি করে না ফেলে থাক।"

"আমাকে জানতে হবে।"

মাথা দোলাল সে। "তুমি বলছ বটে। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। ভাইপোকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে তুমি কতটা ব্যাকুল?"

ছোটবেলায় রাস্তায় মারপিটে জড়িয়ে পড়ার সেই সময়গুলোর কথা ভাবলাম আমি। সব সময়ই আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে যেত ও। দুজনের বিরুদ্ধে একজন, কখনও তিনজনের বিরুদ্ধে একজন। আমি কাঁচুমাচু হয়ে অপেক্ষা করতাম, অনেক সময় ভাবতাম হাত লাগাই, কিন্তু বরাবর পিছু হটে আসতাম। সব সময়ই কিসে যেন বাধা দিত আমাকে।

হলওয়ে বরাবর তাকিয়ে একদল বাচ্চাকে গোল হয়ে নাচতে দেখলাম। বাম পাটা হাঁটুর নিচ থেকে কেটে নেওয়া একটা ছোট মেয়ে ময়লা তক্তপোষের উপর বসে ওদের খেলা দেখছে। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাসছে, হাত তালি দিচ্ছে। দেখলাম ফরিদও বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে আছে। একপাশে ঝুলছে তার পঙ্গু হাতটা। ওয়াহিদের ছেলেদের কথা মনে পড়ল আমার...একটা জিনিস বুঝে গেলাম: সোহরাবকে না পাওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তান ছাড়তে পারব না আমি। "ও কোথায় আছে বলো আমাকে," বললাম।

আমার উপর স্থির হয়ে রইল যামানের দৃষ্টি। তারপর মাথা দোলাল সে। একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে আঙুলের ফাঁকে ঘোরাতে লাগল। "আমার নাম এতে জড়াবে না।"

"কথা দিচ্ছি।"

পেন্সিল দিয়ে টেবিলের উপর টোকা দিল সে। "তুমি কথা দিলেও মনে হয় এজন্যে আমাকে পস্তাতে হবে, কিন্তু সেটাই ভালো, এমনিতেও শেষ হয়ে যাব আমি। তবে সোহরাবের জন্যে কিছু করা যায় যদি। তোমাকে বিশ্বাস করেছি বলেই কথাটা বলছি। তোমাকে দেখে মরিয়া বলে মনে হচ্ছে।" অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সে। "এক তালিব অফিশিয়াল আছে," বিড়বিড় করে বলল তারপর। "এক দুইমাস পরপর এখানে আসে সে। সঙ্গে নগদ টাকা থাকে তার, খুব বেশী না অবশ্য, কিন্তু একেবারে কিছুই না থাকার চেয়ে ভালো।" আমার উপর ওর দৃষ্টি একবারের জন্যে স্থির হয়েই আবার সরে গেল। "সাধারণত কোনও মেয়েকে নিয়ে যায় সে। তবে সব সময় নয়।"

BanglaBook.org

"তুমি সেটা হতে দাও?" আমার পেছনে বলে উঠল ফরিদ। টেবিলের কিনার ঘুরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও।

"আমার কী করার আছে?" পাল্টা জবাব দিল যামান। ডেস্ক থেকে উঠে দাঁড়াল সে।

"তুমি এখানকার পরিচালক," বলল ফরিদ। "এই বাচ্চাদের দিকে খেয়াল রাখাই তোমার দায়িত্ব।"

"ঠেকানোর কোনও উপায় নেই আমার।"

"বাচ্চাদের বিক্রি করছ তুমি!" গর্জে উঠল ফরিদ।

"ফরিদ, বসো! যেতে দাও!" বললাম। কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছি। কারণ হঠাৎ টেবিলের উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফরিদ। ফরিদ গায়ের উপর গিয়ে পড়তেই যামানের চেয়ার উল্টে পড়ে গেল। ওকে মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল ফরিদ। ফরিদের নিচে চাপা পড়া অবস্থায় হাত-পা ছুঁড়তে লাগল পরিচালক। চাপা কণ্ঠে আর্তনাদ করছে। লাথি মেরে ডেস্কের ড্রয়ারটা আলগা করে ফেলল সে। কাগজের পাতা ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

ডেস্কের কিনারা ঘুরে ছুটে গেলাম আমি। যামানের আর্তনাদ চাপা শোনার কারণ বুঝতে পারলাম: ওর গলা টিপে ধরেছে ফরিদ। দুহাতে ফরিদের কাঁধ ধরে জোরে টানলাম আমি। আমার কাছ থেকে ঝটকা মেরে সরে গেল ও। "অনেক হয়েছে!" চিৎকার করে উঠলাম আমি। কিন্তু ফরিদের চেহারা লাল হয়ে আছে। মুখের উপর থেকে ঠোঁট সরে গিয়ে গর্জনের ভঙ্গিতে ফাঁক হয়ে আছে। "ওকে আমি খুন করব! আমাকে ঠেকাতে পারবে না! খুন করে ফেলব।" খেঁকিয়ে উঠল ও।

"নামো ওর উপর থেকে!"

"ওকে খুন করব আমি!" ওর গলার আওয়াজে এমন কিছু ছিল যাতে আমার মনে হল জলদি একটা কিছু না করতে পারলে জীবনে প্রথম খুন দেখার অভিজ্ঞতা হবে আমার।

"বাচ্চারা দেখছে, ফরিদ। ওরা খেয়াল করছে," বললাম। আমার হাতের বাঁধনের নিচে শক্ত হয়ে উঠল ওর কাঁধের পেশী। মুহূর্তের জন্যে মনে হল যামানকে শেষ করে ফেলবে ও। তারপর আমার দিকে ফিরল ও, ছেলেমেয়েদের দেখল। দরজার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। পরস্পরের হাত ধরে রেখেছে। কেউ কেউ কাঁদছে। ফরিদের পেশী শিথিল হয়ে আসা টের পেলাম। হাত আলগা করে উঠে দাঁড়াল ও। চোখ নামিয়ে যামানের দিকে তাকিয়ে মুখভর্তি থুতু ফেলল তার মুখের উপর। তারপর দরজার কাছে গিয়ে আটকে দিল

BanglaBook.org

পাল্লাটা।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল যামান। জামার হাতায় রক্তাক্ত মুখটা মুছল। গালের উপর থেকে থুতু মুছল। কাশতে কাশতে টুপি আর চশমা পরে নিল সে। দুটো গ্লাসই ভেঙে গেছে দেখে আবার খুলে ফেলল। দুহাতে মুখ ঢাকল এবার। অনেকক্ষণ আমরা কেউ কোনও কথা বললাম না।

"এক মাস আগে সোহরাবকে নিয়ে গেছে সে," অবশেষে ককিয়ে উঠে বলল যামান। এখনও মুখ ঢেকে রেখেছে।

"নিজেকে কিনা পরিচালক বলো তুমি?" বলল ফরিদ।

হাত আলগা করল যামান। "ছয়মাসেরও বেশী হয়ে গেছে কোনও টাকাপয়সা পাইনি আমি। এই এতীমখানার পেছনে সারা জীবনের সঞ্চয় খরচ করে এখন আমি ফতুর হয়ে গেছি। এই হতচ্ছাড়া জায়গাটা চালাতে গিয়ে জীবনে যা কিছু জমিয়েছিলাম, যা কিছু বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম, সবই শেষ করে ফেলেছি। তোমার কি ধারণা পাকিস্তান আর ইরানে আমার পরিবার নেই? বাকি সবার মতো আমিও পালাতে পারতাম। কিন্তু পালাইনি। *ওদের* জন্যে রয়ে গেছি।" দরজার দিকে দেখাল সে। "আমি একটা ছেলেকে দিতে অস্বীকার করলে দশটা ছেলেকে নিয়ে যেত সে। তাই একজনকে নিতে দিয়ে বিচারের ভার আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। আমি মান-সম্মানের ম্যাথা খেয়ে তার নোংরা...নাপাক টাকা নিয়েছি। তারপর বাজারে গিয়ে বাচ্চাদের জন্যে খাবার কিনে এনেছি।"

চোখ নামিয়ে নিল ফরিদ।

"তার নিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের কপালে কী ঘটে?" জিজ্ঞেস করলাম।

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে চোখ ডলল যামান। "অনেক সময় ওরা ফিরে আসে।"

"কে সে? তাকে খুঁজে পাব কীভাবে?" জানতে চাইলাম।

"আগামীকাল গাযি স্টেডিয়ামে চলে যাও। হাফ-টাইমের সময় পাবে তাকে। কালো সানগ্লাস পরা লোকটাই সে।" ভাঙা চশমা তুলে নিয়ে ঘোরাতে লাগল সে। "এবার আমি চাই তোমরা চলে যাও। ছেলেরা ভয় পেয়েছে।"

আমাদের পথ দেখিয়ে বাইরে নিয়ে এল সে।

ট্রাকটা সরে আসার সময় সাইডভিউ মিররে দেখলাম যামান দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। একদল ছেলেমেয়ে ঘিরে রেখেছে তাকে। আলগা শার্টের হাতা আঁকড়ে আছে তারা। দেখলাম ভাঙা চশমাটা আবার চোখে লাগাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

একুশ

নদী পেরিয়ে জনাকীর্ণ পশতুনিস্তান স্কয়ারের ভেতর দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে এগোতে লাগলাম আমরা। ওখানে কাবাব খাওয়ার জন্যে খাইবার রেস্তরাঁয় নিয়ে যেত আমাকে বাবা। দালানটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ওটার দরজায় তালা দেওয়া। জানালার পাল্লা নামানো। নাম থেকে 'কে' আর 'আর' হরফ দুটো খোয়া গেছে।

রেস্তরাঁর কাছেই একটা লাশ চোখে পড়ল। একটা ফাঁসির ঘটনা ঘটেছে। একটা বীমের সঙ্গে ঝোলানো দড়ির মাথায় ঝুলছে এক তরুণ। ওর চেহারা ফোলা, নীল হয়ে গেছে। জীবনের শেষ দিনে তার পরনের কাপড়চোপড় ছেঁড়াফাটা, রক্তাক্ত। কেউ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে বলে মনে হল না।

স্কয়ারের ভেতর দিয়ে নীরবে ওয়াযির আকবার খানের দিকে এগোতে লাগলাম আমরা। যেদিকেই তাকাচ্ছি, ধুলোর একটা ধোঁয়াশা শহর আর রোদের-পোড়া দালানকোঠাকে ঢেকে রেখেছে যেন। পশতুনিস্তান থেকে কয়েক ব্লক দূরে এসে ব্যস্ত রাস্তার মোড়ে আলাপে মগ্ন দুজন লোকের দিকে ইঙ্গিত করল ফরিদ। একজন এক পায়ে খোঁড়াচ্ছে। হাঁটুর নিচ থেকে তার আরেক পা কেটে ফেলা হয়েছে। বগল তলায় একটা নকল পা বয়ে বেড়াচ্ছে সে। "ওরা কী করছে, জানো? পা নিয়ে দরাদরি করছে।"

"নিজের পা বিক্রি করছে?"

মাথা দোলাল ফরিদ। "কালোবাজারে ভালো দাম পাবে সে। কয়েক সপ্তাহ বাচ্চাকাচ্চাকে খাওয়াতে পারবে।"

BanglaBook.org

ওয়াযির আকবার খানের বেশীর ভাগ বাড়ির ছাদ এখনও অক্ষত আছে দেখে অবাক লাগল আমার। দেয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। আসলে বেশ ভালো অবস্থাতেই আছে ওগুলো। এখনও দেয়ালের উপর দিয়ে নুয়ে পড়েছে গাছপালা, কার্থে-সেহ'র পথঘাটের মতো এখানকার রাস্তাগুলো আবর্জনায় ভরে নেই তেমন। কিছু বুলেটে ঝাঁঝড়া, কিছু দোমড়ানো সাইনবোর্ড এখনও পথের দিশা দিচ্ছে।

"এখানকার অবস্থা তো তত খারাপ না," মন্তব্য করলাম আমি।

"অবাক হওয়ার কিছু নেই। বেশীর ভাগ গণ্যমান্য লোক এখন এখানেই থাকে।"

"তালিবান?"

"ওরাও," বলল ফরিদ।

"আর কারা?"

দুপাশে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাইডওঅক আর দেয়াল ঘেরা বাড়িঅলা একটা চওড়া রাস্তায় চলে এল সে। "তালিবানদের মদদদাতারা। এই সরকারের আসল বুদ্ধিদাতা। যদি তা বলতে পারো: আরব, চেচেন আর পাকিস্তানিরা।" বলল ফরিদ। উত্তর-পশ্চিমে ইশারা করল সে। "ওদিকে স্ট্রিট নাম্বার ১৫-কে বলা হয় সড়ক-ই-মেহমান।" অতিথিদের রাস্তা। "এখানে ওদের এই নামেই ডাকে ওরা। আমার ধারণা এই মেহমানরা একদিন ঠিক কার্পেটের উপরই পেশাব করে দেবে।"

"মনে হয় ওটাই!" বললাম। "ওদিকে!" আমি ছোট থাকতে গাইডের কাজ করত একটা ল্যান্ডমার্ক, সেটার দিকে ইঙ্গিত করলাম আমি। *যদি কখনও হারিয়ে যাও*, বলত বাবা, *মনে রাখবে শেষমাথায় গোলাপি বাড়িঅলা রাস্তাটাই আমাদের বাসায় আসার পথ।* সূচাল ছাদের ওই গেলাপি বাড়িটাই সেইসময়ে মহল্লার একমাত্র এই রঙের বাড়ি ছিল। এখনও তাই আছে।

সেই রাস্তায় বাঁক নিল ফরিদ। সঙ্গে সঙ্গে বাবার বাড়িটা দেখতে পেলাম।

উঠোনে বুনোগোলাপের একটা ঝোপের ভেতর ছোট কচ্ছপটাকে খুঁজে পেলাম আমরা। ওটা কী করে এখানে এল জানতাম না, এত উত্তেজিত ছিলাম যে, সেটা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। ওটার খোলে উজ্জ্বল লাল রঙ লাগিয়ে দিলাম আমরা। এখন আর ঝোপেঝাড়ে সহজে হারিয়ে যাবে না ওটা। আমাদের কাছে মনে হল আমরা যেন দুই বেপরোয়া অভিযাত্রী দূরের কোনও গহীন জঙ্গলে দানবাকৃতি

BanglaBook.org

এক বিশাল প্রাগৈতিহাসিক দৈত্যের দেখা পেয়েছি। সভ্যজগতের মানুষকে দেখাতে নিয়ে আসছি ওটাকে। হাসানের আগের বছরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে আলির বানিয়ে দেওয়া ওয়্যাগনে উঠে বসলাম আমরা, ভাব করতে লাগলাম এটা একটা বিরাট লোহার খাঁচা। আগুন উগড়ে দেওয়া দানোটাকে আটকে রেখেছে! ওয়্যাগনটাকে টানতে টানতে ঘাসের উপর দিয়ে এগোতে লাগলাম আমরা। আমাদের আশপাশে আপেল আর চেরি গাছের সারি। মেঘছোঁয়া স্কাইস্ক্র্যাপারে পরিণত হল ওগুলো, হাজার হাজার জানালা দিয়ে অসংখ্য চেহারা উঁকি দিচ্ছে, ওদের চোখের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া অভূতপূর্ব দৃশ্য লক্ষ করছে। একটা ডুমুর গাছের ঝোপের কাছে বাবার বানানো অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্রিজটা পর হলাম আমরা। দুটো শহরকে মিলিয়ে দেওয়া একটা বিরাট সেতুতে পরিণত হল ওটা। ওটার নিচের ছোট পুকুরটা হয়ে গেল ফেনিল কোনও সাগর। ব্রিজের বিশাল পাইলনের উপর আতশবাজির বিস্ফোরণ ঘটছে, সশস্ত্র সৈনিকরা আকাশে রিরাট বিরাট ইস্পাতের তাল ছুড়ে দেওয়ার সময় স্যালুট করছে আমাদের। লাল ইটের বৃত্তাকার ড্রাইভওয়ের উপর দিয়ে রট আয়রন গেইটের বইরে নিয়ে এলাম আমরা ক্যাবে লাফাতে থাকা কচ্ছপটাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সম্মান দেখাচ্ছিল দুনিয়ার সব নেতারা, তাদের স্যালুটের জবাব দিলাম। আমি আর হাসান হচ্ছি জগৎ বিখ্যাত অভিযাত্রী, এই দুঃসাহসিক অভিযানের জন্যে মেডাল পেতে যাচ্ছি...

রোদের অত্যাচারে ম্লান হয়ে যাওয়া ইটের ফাঁকে ফাঁকে আগাছা জন্মেছে এখন, সসঙ্কোচে ড্রাইভওয়ে ধরে আগে বাড়লাম আমি। বাবার বাড়ির গেইটের বাইরে দাঁড়ালাম। নিজেকে আগন্তুক বলে মনে হচ্ছে। মর্চে-পড়া গরাদের উপর হাত রেখে মনে মনে ভাবলাম, এই গেইট দিয়েই কত হাজার বার ছেলেবেলায় এমন সব জিনিসের জন্যে আসা যাওয়া করেছি এখন যেগুলোর আর কোনও মূল্য নেই কিন্তু তারপরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। গেইটে ধাক্কা দিলাম।

গেইট থেকে উঠোনের দিকে চলে যাওয়া ড্রাইভওয়ের এক্সটেনশনকে এখন আর আগের মতো লম্বা চওড়া বলে মনে হল না। এখানে আমি আর হাসান গ্রীষ্মকাল এলেই পালা করে বাইক চালাতাম। বিদ্যুৎ-রেখার মতো ফেটে গেছে অ্যাসফল্ট, ফাঁকে ফোকরে আরও আগাছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বেশীর ভাগ পপলার গাছই কেটে ফেলা হয়েছে। পড়শীদের বাড়িতে আয়না দিয়ে সূর্যের আলো ঠিকরে পাঠাতে এই গাছের মাথায় চড়তাম আমি আর হাসান। এখনও

BanglaBook.org

যেগুলো দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর কোনও পাতা নেই। রোগা ভূট্টার দেয়ালটা এখনও আছে, যদিও এখন ওই দেয়াল বরাবর রোগা বা অন্য কোনও রকম কোনও ভূট্টা চোখে পড়ল না। দেয়ালের রঙ খসে পড়তে শুরু করেছে। কিছু কিছু অংশ এরই মধ্যে খসে পড়েছে। লনটা শহরের উপর ভেসে থাকা সেই একই রকম ধোঁয়াশার একটা মেঘে পরিণত হয়েছে, কোথাও কোথাও এক চিলতে জমিন রয়েছে যেখানে কোনও কিছুই জন্মায়নি।

ড্রাইভওয়েতে একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। এটাকেই কেবল বেমানান মনে হল। এখানে বাবার কালো মাস্টাংটা থাকত। অনেকগুলো বছর মাস্টাংয়ের আট সিলিন্ডারের এঞ্জিন রোজ সকালে গর্জে উঠে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে। দেখতে পেলাম জীপের নিচে তেল চুঁইয়ে পড়ে রর্সচাক কালির বিরাট একটা দাগের মতো ড্রাইভওয়েতে দাগ ফেলে দিয়েছে। জীপের ওপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা খালি ঠেলা গাড়ি। ড্রাইভওয়ের বাম পাশে বাবা আর আলির লাগানো গোলাপ ঝোপের কোনও চিহ্ন চোখে পড়ল না। খালি অ্যাসফল্টের উপর মাটি স্তূপ হয়ে আছে। আর আগাছা।

আমার পেছনে দুবার হর্ন বাজাল ফরিদ। "আমাদের যাওয়া উচিত, আগা। কারও চোখে পড়ে যাব," গলা চড়িয়ে বলল ও।

"আর একটা মিনিট," বললাম আমি।

আমার ছেলেবেলার সেই ছড়ানো শাদা ম্যানশন আর নেই এখন বাড়িটা। ওটার ছাদ বসে গেছে, পলেস্তারা খসে পড়েছে। লিভিংরুম, ফয়ে, ওপর তলার গেস্টরুমের জানালাগুলো ভেঙে গেছে। কোনওমতে শাদা প্লাস্টিকের শীট বা পেরেক দিয়ে কাঠের বোর্ড আটকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে ওগুলো। এককালের ঝরমলে শাদা রঙ এখন ভূতুড়ে ধুসর হয়ে গেছে। নিচের ইটের সারি বেরিয়ে পড়েছে। সামনের সিঁড়ি ধসে পড়েছে। কাবুলের আর সব জিনিসের মতোই বাবার বাড়িটাও অতীত জৌলুশের একটা ছবিমাত্র।

দোতলায় আমার পুরোনো বেডরুমের জানালাটা খুঁজে পেলাম। বাড়ির দিকে যাবার সময় দক্ষিণের তৃতীয় জানালাটা। আঙুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। জানালার ওপাশে কিছুই দেখতে পেলাম না। পঁচিশ বছর আগে এই একই জানালার পেছনে দাঁড়িয়েছিলাম আমি। জানালার উপর দিয়ে নিবিড়ভাবে গড়িয়ে নামছিল বৃষ্টির জল, জানালার কাচ আবছা করে দিচ্ছিল আমার নিঃশ্বাস। হাসান আর আলিকে দেখেছি ওদের সমস্ত মালপত্র টেনে নিয়ে বাবার গাড়ির ট্রাঙ্কে তুলছে।

"আমির আগা," আবার ডাকল ফরিদ।

BanglaBook.org

"আসছি," পাল্টা জবাব দিলাম।

পাগলের মতো ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করছিল। সিঁড়ির কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। ওখানে হাসান আর আমাকে স্নো বুট খুলতে বাধ্য করত আলি। ইচ্ছে করছিল ফয়েতে পা রাখি, কাঠের গুঁড়োর সঙ্গে পোড়ানোর জন্যে কমলার খোসা ছুড়ে দিত আলি, সেই গন্ধ আবার বুকে টেনে নিই। কিচেন টেবিলে বসি, এক টুকরো *নান* দিয়ে চা খাই; হাসানের কণ্ঠে পুরোনো হাযারা গান শুনি।

আরেকবার দেখলাম। তারপর সাইডওঅক বরাবর পার্ক করা ল্যান্ডক্রুজারের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। হুইলের পেছনে বসে সিগারেট টানছে ফরিদ।

"আমাকে আরেকটা জিনিস খুঁজতে হবে," ওকে বললাম।

"একটু তাড়াতাড়ি করবে?"

"দশ মিনিট সময় দাও আমাকে।"

"যাও তবে," তারপর, যাব বলে ঘুরতে যাচ্ছি, সে বলল, "এসব ভুলে যাও। সেটাই ভালো হবে।"

"কীসের জন্যে?"

"সামনে বাড়ার জন্যে," বলল ফরিদ। জানালা দিয়ে সিগারেটটা ফেলে দিল সে। "আর কী দেখা বাকি আছে তোমার? তোমার কষ্ট কমিয়ে দিচ্ছি আমি। তোমার স্মৃতির কোনও কিছুই এখন আর টিকে নেই। ভুলে যাওয়াই ভালো।"

"আমি আর ভুলে যেতে চাই না," বললাম। "দশ মিনিট সময় দাও আমাকে।"

বাবার বাড়ির ঠিক উত্তরে টিলাটার গায়ে চাপার সময় বলতে গেলে একটুও ঘামাতাম না আমরা। আমি আর হাসান। পাহাড়ের কোলে এক অন্যকে তাড়া করে বা ঢালে বসে থাকতাম এখান থেকে দূরের এয়ারপোর্টটা বেশ ভালো করে দেখা যায়। আমরা প্লেনের ওঠানামা দেখতাম। তারপর আবার দৌড়াতে শুরু করতাম।

এখন এবড়োখেবড়ো টিলার মাথার কাছে আসতে আসতে প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস যেন আগুন গেলার মতো মনে হতে লাগল। মুখ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, মুখ দিয়ে শোঁ শোঁ আওয়াজ বের হচ্ছে, আমার শরীরের একপাশে একটা সেলাই রয়েছে। তারপর পরিত্যক্ত কবরস্থানের খোঁজে আগে বাড়লাম। খুঁজে পেতে দেরি হল না। এখনও আছে। সেই পুরোনো

BanglaBook.org

ডালিম গাছটাও আছে।

কবরস্থানের ধূসর পাথুরে গেইটের উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। এখানে হাসান ওর মাকে কবর দিয়েছে। কব্জাতে ঝুলন্ত পুরোনো ধাতব গেইট এখন আর নেই। কবরকে দখল করে নেওয়া আগাছার দঙ্গলের ভেতর স্মৃতি ফলকটা দেখা যায় কি যায় না। কবরস্থানের চারপাশের নিচু দেয়ালের উপর বসে আছে একজোড়া কাক।

হাসান ওর চিঠিতে লিখেছে ডালিম গাছে এখন আর ফল ধরে না। নুয়ে পড়া পাতাহীন গাছটার দিকে তাকিয়ে আর কখনও ওতে ফল ধরবে বলে মনে হল না। ওটার নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম, মনে পড়ল কতবার ওটায় চড়েছি, ডালের উপর পা ছড়িয়ে বসে থেকেছি, পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে আমাদের মুখের উপর। ডালিমের টকটক স্বাদ যেন আমার মুখ ভরে তুলল।

হাঁটু ভেঙে বসে পড়লাম, গাছের গায়ে হাত বোলালাম। যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম: খোদাইটা কমে এসেছে, প্রায় মুছেই গেছে বলা চলে, তবে এখনও আছে: "আমির আর হাসান। কাবুলের সুলতান।" প্রত্যেকটা হরফের উপর হাত বোলালাম আমি। ছোট ছোট খাঁজগুলো থেকে ছোট ছোট বাকল তুলে নিলাম।

গাছের সামনে পায়ের উপর পা তুলে বসে ছেলেবেলার শহরের দক্ষিণে চোখ ফেরালাম। তখনকার দিনে প্রত্যেকটা বাড়ির পেছনে গাছের মাথা উঁকি দিতে দেখা যেত। আকাশটা ছিল বিশাল, নীল; রোদের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠত শুকোতে দেওয়া কাপড়। ভালো করে কান পেতে শুনলে গাধা নিয়ে ওয়াযির আকবার খানের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া ফলঅলার হাঁকও কানে আসত তোমার: *চেরি! খুবানি! আঙুর!* সন্ধ্যার আগে আগে *আযান* শুনতে পেতে তুমি: শার-ই নও-র মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিনের *নামাযের* আহবান।

হর্ন শুনতে পেলাম আমি। দেখলাম হাতের ইশারায় আমাকে ডাকছে ফরিদ। যাবার সময় হয়েছে।

আবার দক্ষিণে এগোলাম আমরা, পশতুনিস্তান স্কয়ারে ফিরে যাচ্ছি আবার। সশস্ত্র দাড়িঅলা লোকে ঠাসাঠাসি ক্যাবঅলা আরও লাল পিকআপ পেছনে ফেলে এলাম আমরা। যখনই কোনও পিকআপ অতিক্রম করছে, চাপা কণ্ঠে খিস্তি করে উঠছে ফরিদ।

পশতুনিস্তান স্কয়ারের কাছে একটা ছোট হোটেলে একটা রুমের ভাড়া মেটালাম আমি। হুবহু একই রকম কালো পোশাক আর শাদা স্কার্ফ পরা তিনটা

BanglaBook.org

মেয়ে কাউন্টারের পেছনের লোকটার গায়ে লেপ্টে রয়েছে। এমন একটা ভয়াবহ চেহারার ঘরের জন্যে অকল্পনীয় ৭৫ ডলার ভাড়া হাঁকল সে। তবে আমি ও নিয়ে মাথা ঘামালাম না। হাওয়াইতে একটা বীচহাউস চালানোর জন্যে শোষণ করা এক জিনিস, আর বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্যে সেই কাজ করা অন্য কথা।

গরম পানির কোনও অস্তিত্ব নেই, ভাঙা টয়লেটে ফ্লাশ হয় না। স্রেফ একটা স্টিল ফ্রেমের খাট, ক্ষয়ে যাওয়া তক্তপোষ রয়েছে ওতে; একটা ছেঁড়া কম্বল; এক কোণে একটা কাঠের চেয়ার। স্কয়ারের দিকে খোলা জানালাটা ভাঙা, ওটা বদলানো হয়নি। আমি স্যুটকেসটা নামিয়ে রাখার সময় খাটের পেছনে দেয়ালের গায়ে শুকনো রক্তের দাগ চোখে পড়ল।

ফরিদকে কয়েকটা টাকা দিলাম। খাবার আনতে চলে গেল ও। ফিরে এল চারটে গরম গরম *শিককাবাব*, টাটকা *নান* আর এক গামলা ভাত নিয়ে। বিছানায় বসে সব খাবার সাবাড় করলাম আমরা। অন্তত একটা জিনিস বদলে যায়নি কাবুলের, *কাবাব*টা সেই আগের মতোই লোভনীয় আর মজাদারই আছে।

সেরাতে আমি বিছানায় ঘুমালাম। নিচে মাটিতে শুল ফরিদ। একটা বাড়তি কম্বলে নিজেকে মুড়ে নিল সে। হোটেল মালিক ওটার জন্যে বাড়তি টাকা নিল আমার কাছ থেকে। ভাঙা জানালার ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে ঢুকে পড়া চাঁদের আলো ছাড়া আর কোনও আলো নেই রুমে। ফরিদ জানাল হোটেল মালিকের কাছে শুনেছে কাবুলে দুদিন ধরে ইলেক্ট্রিসিটি নেই। তার জেনারেটরটাও নষ্ট। খানিকক্ষণ কথা বললাম আমরা। জালালাবাদের মাযার-ই-শরীফে ওর বেড়ে ওঠার গল্প করল ফরিদ। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার অল্প পরে বাবার সঙ্গে পানশির উপত্যকায় *শোরোভি*দের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলল সে। কোনও খাবার ছাড়া আটকা পড়েছিল ওরা। বেঁচে থাকতে পঙ্গপাল খেয়েছে। হেলিকপ্টার গানফায়ারে যেদিন ওর বাবা মারা গেল, সেদিনই ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে দুটি মেয়ে হারানোর কথা বলল সে। আমার কাছে আমেরিকার কথা জানতে চাইল ও। ওকে বললাম আমেরিকায় তুমি যেকোনও মুদি দোকানে ঢুকে পনের থেকে বিশ পদের পছন্দসই সিরিয়াল কিনতে পারো। ভেড়ার মাংস সব সময়ই টাটকা, দুধ পাবে ঠাণ্ডা, ফলের ছাড়াছড়ি, পানি একেবারে টলটলে। প্রত্যেক বাসায় টিভি রয়েছে, প্রত্যেক টিভির রয়েছে রিমোট; চাইলে একটা স্যাটেলাইট ডিশ নিতে পারো তুমি। পাঁচশোরও বেশী চ্যানেল দেখতে পারো।

"পাঁচশো?" চেঁচিয়ে উঠল ফরিদ।

"পাঁচশো।"

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম আমরা। আমার যখন মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনই হেসে উঠল ফরিদ। "আগা, মোল্লা নাসিরুদ্দিনের মেয়ে শ্বশুর বাড়ি থেকে এসে বাপের কাছে যখন বিচার দিল যে তার স্বামী তাকে মেরেছে, তখন সে কী বলেছিল জানো?" অন্ধকারে তার হাসি টের পাচ্ছিলাম আমি। আমার নিজের মুখেও হাসির রেখা ফুটে উঠল। আফগানিস্তানে এমন লোক খুব কমই আছে যে মোল্লার এক আধটা গল্প জানে না।

"কী?"

"মেয়েটাকে সেও মরল, তারপর জামাইয়ের কাছে এই খবর দিয়ে পাঠাল যে মোল্লাহ বোকা নয়: সে যদি তার মেয়েকে আর মারে তাহলে পাল্টা সেও তার বউকে পেটাবে।"

হেসে উঠলাম আমি। খানিকটা কৌতুক শুনে, খানিকটা আফগানদের রসবোধ এতটুক বদলায়নি দেখে। যুদ্ধ হয়েছে, ইন্টারনেটের আবির্ভাব হয়েছে, মঙ্গলের বুকে হেঁটে বেড়িয়েছে রোবট, কিন্তু আফগানিস্তানের লোকজন এখনও মোল্লাহ নাসিরুদ্দিনের চুটকি বলে চলেছে। "মোল্লাহর একবার নিজের পিঠে এক বিরাট বোচকা চাপিয়ে গাধার পিঠে করে যাবার গল্পটা শুনেছ?"

"না।"

"পথে একজন জিজ্ঞেস করল সে বোচকাটা গাধার পিঠ তুলে দিচ্ছে না কেন?" তখন সে বলল, 'সেটা খুবই নিষ্ঠুর ব্যাপার হবে, বেচারার জন্যে এমনিতেই অনেক ভার হয়ে গেছি আমি।'"

ভাণ্ডার শেষ না হওয়া পর্যন্ত মোল্লাহ নাসিরুদ্দিনের চুটকি বলে গেলাম আমরা। তারপর ফের নীরব হয়ে গেলাম।

"আমির আগা?" আমাকে প্রায় ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে বলল ফরিদ।

"কী?"

"কেন এখানে এসেছ তুমি, *আসলে* কেন এসেছ তুমি?"

"বলেছি তো।"

"ছেলেটার জন্যে?"

"ছেলেটার জন্যে।"

মেঝের উপর নড়ে উঠল ফরিদ। "বিশ্বাস করা কঠিন।"

"অনেক সময় নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমি এখানে এসেছি।"

"না...বলতে চাইছি *ওই* ছেলেটা কেন? সেই আমেরিকা থেকে এতদূর এসেছ একটা শি'য়া ছেলের জন্যে"

একথায় আমার ভেতরের সব হাসি ফুরিয়ে গেল। পালিয়ে গেল ঘুমও।

BanglaBook.org

"আমি ক্লান্ত," বললাম। "নাও, একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।"

অচিরেই ফরিদের নাক ডাকার আওয়াজে ভরে উঠল গোটা ঘর। জেগে রইলাম আমি। বুকের উপর হাত রেখে জানালার ফাঁক দিয়ে তারা-জ্বলা রাতের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভাবতে লাগলাম আফগানিস্তান সম্পর্কে লোকের কথাগুলো হয়ত ঠিক: হয়ত এটা একটা আশাহীন জায়গা।

আমরা যখন এন্ট্রান্স টানেল দিয়ে ঢুকছি, গাযি স্টেডিয়াম তখন লোকে লোকারণ্য। কংক্রীটের টেরেসে হাজার হাজার লোক ভীড় করে আছে। আইলে খেলছে ছেলেরা, একে অপরকে ধাওয়া করছে সিঁড়ির ধাপে। মসলাদার সসে ভেজানো গারবাঞ্জো সীমের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ঘাম আর গোবরের গন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সিগারেট, পাইন বাদাম আর বিস্কুটঅলাদের জটলা পার হয়ে এগিয়ে গেলাম আমি আর ফরিদ। টুইডের ছেঁড়া জ্যাকেট পরা একটা হাড্ডিসার ছেলে আমার কনুই ধরে কানের কাছে ফিসফিস করে কয়েকটা "সেক্সি ছবি" লাগবে কিনা জানতে চাইল।

"দারুণ সেক্সি, আগা," বলল সে। সতর্ক চোখে বারবার এদিক ওদিক দেখছে–দেখে কয়েক বছর আগে স্যান ফ্রান্সিস্কোর টেন্ডারলয়েন এলাকায় একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল, আমার সঙ্গে চালাকি করতে চেয়েছিল সে। ছেলেটা জ্যাকেটের একটা পাশ ফাঁক করে সেক্সি ছবিগুলোর এক ঝলক দেখার সুযোগ করে দিল। হিন্দি ছবির পোস্ট কার্ড, তাতে ঘুঘু-চোখের সম্পূর্ণ পোশাক পরা ভরাট শরীরের নায়িকাদের নায়কের সঙ্গে নাচতে দেখা যাচ্ছে। "দারুণ সেক্সি," আবার বলল সে।

"উঁহু, ধন্যবাদ," বললাম, ওকে ঠেলে এগিয়ে গেলাম।

"ধরতে পারলে ওরা এমন ধোলাই দেবে ওকে যে কবরে ওর বাপ পর্যন্ত জেগে উঠবে," বিড়বিড় করে বলল ফরিদ।

বসার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই, বলাই বাহুল্য। আমাদেরকে সেকশন, আইল আর সীট দেখিয়ে দেওয়ার জন্যেও নেই কেউ। ছিলও না কখনও। রাজতন্ত্রের আমলেও ছিল না। বসার মতো একটা ভালো জায়গা খুঁজে বার করলাম আমরা। মাঝমাঠের ঠিক বামে। তবে সেজন্যে ফরিদকে একটু ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি করতে হল।

'৭০-এর দশকে বাবা আমাকে যখন এখানে সকার খেলা দেখতে নিয়ে আসত তখন মাঠের ঘাস কত সবুজ ছিল সেকথা মনে পড়ল আমার। এখন জঘন্য দশা হয়েছে পিচটার। সর্বত্র খানাখন্দের ছড়াছড়ি। দক্ষিণ প্রান্তের

BanglaBook.org

গোলপেস্টের পেছনে একজোড়া গভীর গহ্বর বেশ দেখার মতো। ওখানে ঘাস বলে কিছু নেই, স্রেফ মাটি। দল দুটো মাঠে নামার পর–সবাই তীব্র গরম সত্ত্বেও লম্বা প্যান্ট পরে আছে–খেলা শুরু হল যখন, খেলোয়াড়দের পায়ের আঘাতে সৃষ্ট মেঘের ভেতর বলটাকে দেখা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। চাবুক হাতে তরুণ তালিবরা আইলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ একটু জোরে চেঁচালেই চাবুক হানছে।

হাফ-টাইমের হুইসল বাজার একটু পরেই ওদের নিয়ে এল ওরা। এখানে এসে পৌঁছানোর পর থেকে চোখে পড়া ট্রাকগুলোর মতোই একজোড়া লাল ট্রাক গেইট দিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকল। একটা ট্রাকের ক্যাবে সবুজ *বুরকা* পরা এক মহিলা বসে আছে, অন্যটায় চোখবাঁধা এক লোক। ধীর গতিতে ট্র্যাকে একটা চক্কর দিল ট্রাকজোড়া, সবাইকে ভালো করে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল: লোকজন উঠে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাড়িয়ে দেখতে লাগল। আমার পাশে ফরিদের কণ্ঠমণি ওঠানামা করছে, চাপা স্বরে দোয়া পড়ছে ও।

খেলার মাঠে ঢুকে একজোড়া ধূলির মেঘ উড়িয়ে একপ্রান্তের দিকে এগিয়ে গেল ট্রাক দুটো। সূর্যের আলো ঠিকরে যাচ্ছে ওগুলোর হাবক্যাপে। মাঠের শেষ মাথায় তৃতীয় একটা ট্রাক যোগ দিল ওগুলোর সঙ্গে। এই ট্রাকটা এমন সব জিনিসে বোঝাই যেগুলো দেখে নিমেষে গোলপোস্টের পেছনের গর্তগুলোর তাৎপর্য বুঝে গেলাম। তৃতীয় ট্রাকের মাল নামাল ওরা। প্রত্যাশায় বিড়বিড় করে উঠল জনতা।

"থাকতে চাও?" গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল ফরিদ।

"না," বললাম। জীবনে আর কখনও কোনও জায়গা ছেড়ে এভাবে চলে যেতে চাইনি আমি। "কিন্তু আমাদের থাকতে হবে।"

ঘাড়ের উপর আড়াআড়িভাবে ঝোলানো কালাশনিকভঅলা দুই তালিব প্রথম ট্রাক থেকে চোখবন্ধ লোকটাকে আর অন্য দুজন *বুরকা* পরা মেয়েটাকে নামিয়ে আনল। মেয়েটার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, জমিনে হোঁচট খেয়ে পড়ল সে। সৈন্যরা তাকে ওঠালেও আবার লুটিয়ে পড়ল সে। ওরা আবার তাকে ওঠানোর চেষ্টা করতে যেতেই হাত-পা ছুড়ে চিৎকার জুড়ে দিল। যতদিন বুকে শ্বাস আছে ওই চিৎকার ভুলব না আমি। যেন কোনও পশু ভালুক ধরার ফাঁদে আটকে যাওয়া পা ছাড়ানোর চেষ্টা করছে। আরও দুজন তালিব এসে যোগ দিল, তারপর জোর করে বুক সমান গভীর গর্তে নামাল মেয়েটাকে। অন্যদিকে চোখবাঁধা লোকটা নীরবে তার জন্যে খোঁড়া গর্তে নামাতে দিল তাকে। এখন দুই অভিযুক্তের কেবল ধড়টুকু জমিন থেকে মাথা বের করে আছে।

BanglaBook.org

ধূসর পোশাক পরা নাদুসনুদুস একজন হুজুর গোলপোস্টের কাছে এসে দাঁড়াল। মাইক্রোফোনের কাছে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। তার পেছনে গর্তের মেয়েটা এখনও চেঁচাচ্ছে। কোরান থেকে বেশ দীর্ঘ একটা সুরা পড়ল সে। স্টেডিয়ামের জনতার মাঝে সহসা নেমে আসা নীরবতায় তরঙ্গায়িত হতে লাগল তার নাকি সুরের উচ্চারণ। অনেক দিন আগে বাবার বলা একটা কথা মনে পড়ল: *এইসব আপনা-ভালো বাঁদরগুলোর দাড়িতে আমি পেচ্ছাপ করি। এরা তজবীহর দানা গোনা আর তাদের অজানা ভাষায় লেখা একটা বই থেকে পড়া ছাড়া আর কিছু জানে না। আফগানিস্তান যদি কখনও এদের হাতে গিয়ে পড়ে তো আল্লাহ যেন আমাদের রক্ষা করেন।*

সুরা পড়া শেষ হলে গলা খাকারি দিল হুজুর। "ভাই ও বোনেরা!" ফারসিতে আহ্বান জানাল সে। সারা স্টেডিয়ামে গমগম করে উঠল তার কণ্ঠস্বর। "আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি *শরী'য়া* পালন করার জন্যে। আমরা এখানে এসেছি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে। আজ আমরা এখানে এসেছি, কারণ এই আফগানিস্তানে, আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিতে আল্লাহ'র ইচ্ছে এবং হযরত মুহাম্মদ *সাল্লাহু আলাইহিস সালাম*-এর বাণী আজও জীবীত আছে। আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলি, তাঁকে মান্য করি, কারণ আমরা তাঁর বিশালত্বের সামনে বিনীত অক্ষম সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নই। আর আল্লাহ কী বলেছেন? তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, **আল্লাহ কী বলেছেন?** আল্লাহ বলেছেন প্রত্যেক গুনহগারকে তার গুনাহর উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। এসব আমার কথা নয়, আমার কোনও বন্ধুর কথাও নয়। এগুলো **আল্লাহর** কথা!" মুক্ত হাত দিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করল সে। আমার মাথার ভেতর দপদপ করছিল। অসম্ভব প্রখর ঠেকছিল সূর্যের আলো।

"প্রত্যেক গুনাহগারকে তার গুনাহর উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।" গলা নিচু করে মাইকে পুনরাবৃত্তি করল হুজুর। আস্তে নাটকীয়ভাবে উচ্চারণ করছে প্রত্যেকটা শব্দ। "তা ভাই ও বোনেরা ব্যাভিচারীর জন্যে কোন শাস্তি উপযুক্ত? যারা বৈবাহিক সম্পর্কের অমর্যাদা করে তাদের কীভাবে সাজা দেব আমরা? যারা আল্লাহর মুখে থুতু ফেলে তাদের মোকাবিলা কীভাবে করব? যারা আল্লাহর ঘর লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে কীভাবে তাদের জবাব দেব? **আমরা পাল্টা পাথর ছুড়ব!**" মাইক্রোফোন বন্ধ করে দিল সে। জনতার ভেতর নিচু লয়ের একটা গুঞ্জণ ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল।

আমার পাশে বসে মাথা নাড়ছিল ফরিদ। "এরা নিজেদের মুসলিম দাবী করে," ফিসফিস করে বলল ও।

BanglaBook.org

এবার লম্বা চওড়া কাঁধের এক লোক বের হয়ে এল পিকআপ ট্রাক থেকে । তাকে দেখে দর্শকদের ভেতর উল্লাস ধ্বনি সৃষ্টি হল। এবার জোরে চেঁচানোর জন্যে কাউকে চাবুক পেটা করা হল না। বিকেলের রোদে লম্বা লোকটার ঝলমলে শাদা পোশাক ঝিলিক মারছে। হাওয়ায় উড়ছে তার শার্টের ঢিলে হাতা। ক্রসের উপর জেসাসের মতো দুপাশে দুই হাত মেলে রেখেছে সে। ধীরে একটা চক্কর খেয়ে জনতাকে অভিবাদন জানাল সে। তার চেহারা আমাদের সেকশনের দিকে ফিরতেই দেখলাম গাঢ় সানগ্লাস পরে আছে সে। জন লেনন যেমন পরত।

"এটাই নিশ্চয়ই আমাদের লোক," বলল ফরিদ।

সানগ্লাস পরা লম্বা তালিব তৃতীয় ট্রাক থেকে নামানো পাথরের স্তূপের কাছে এগিয়ে গেল। একটা পাথর তুলে নিয়ে দর্শকদের দেখাল। শোরগোল থেমে গেল, তার জায়গা দখল করল একটা গুঞ্জণ ধ্বনি, ছড়িয়ে পড়ল সারা স্টেডিয়ামে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম সবাই *চুকু চুক* শব্দ করছে। অবিশ্বাস্যভাবে ঢিবির উপর দাঁড়ানো বেসবল পিচারের মতো লাগছে তালিবকে, গর্তে দাঁড়ানো চোখ-বন্ধ লোকটার দিকে পাথরটা ছুড়ে মারল সে। আবার আর্তনাদ করে উঠল মেয়েটা। জনতার মাঝে পাথর নিক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে **"ওহ!"** ধ্বনি উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ চলল এভাবে। ওরা চুপ করলে ফরিদকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপারটা চুকে গেছে কিনা। ও বলল, না। মনে হয় লোকজনের গলা শুকিয়ে গেছে। জানি না কতক্ষণ দুহাতে মুখ ঢেকে বসে ছিলাম আমি। মনে আছে আশপাশের লোকেরা যখন "*মর্দ? মর্দ? মরেছে?*" জিজ্ঞেস করতে লাগল তখন চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম।

গর্তের লোকটা এখন মাংস আর ছেঁড়াফাটা কাপড়ের একটা পিণ্ডমাত্র। বুকের উপর ঝুলে পড়েছে তার মাথাটা। জন লেননের সানগ্লাস পরা তালিব গর্তের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা আরেকটা লোকের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা পাথর হাতে চালাচালি করছে সে। হাঁটু গেড়ে বসে থাকা লোকটার কানে স্টেথেস্কোপের শেষ প্রান্তটা লাগানো। অন্যপ্রান্তটা গর্তের লোকটার বুকে চেপে ধরে রেখেছে। কান থেকে স্টেথেস্কোপ সরিয়ে নিল সে। সানগ্লাস পরা তালিবের উদ্দেশে মাথা নাড়ল। গুঙিয়ে উঠল জনতা।

আবার পাথরের স্তূপের দিকে এগিয়ে গেল জন লেনন।

সবকিছু চুকে-বুকে যাবার পর, যখন রক্তাক্ত লাশগুলো নেহাত অবহেলাভরে আবার লাল পিক আপ ট্রাকে ছুড়ে দেওয়া হল–দুটো আলাদা পিকআপে–শোভেল হাতে কয়েকজন লোক দ্রুত এগিয়ে এসে গর্তগুলো ভরাট

BanglaBook.org

করে ফেলল। ওদের একজান নিরাসক্তভাবে লাথি মেরে বেশ বড়সড় একটা রক্তের দাগ মাটির ঢেলা দিয়ে ঢাকার চেষ্টা চালাল। কয়েক মিনিট বাদে খেলোয়াড়ের দল আবার ফিরে এল মাঠে। সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হল।

সেদিন বিকেল তিনটায় আমাদের দেখা করার সময় ঠিক করা হয়েছিল। সময় ঠিক করার দ্রুততা অবাক করে দিয়েছে আমাকে। আমি ভেবেছিলাম দেরি করানো হবে, অনেক প্রশ্ন করা হবে, আমাদের কাগজপত্রও দেখতে চাওয়া হবে হয়ত। কিন্তু আফগানিস্তানে সরকারি কাজকর্মও এখনও কেমন অনায়াস রয়ে গেছে সেটা আমাকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে: ফরিদকে কেবল চাবুকঅলা একজন তালিবকে বলতে হয়েছে যে শাদা পোশাকের লোকটার সঙ্গে আমার জরুরি আলাপ রয়েছে। ফরিদের সঙ্গে ওর কথা হয়েছে। চাবুকঅলা মাথা দুলিয়েছে, মাঠের তরুণের উদ্দেশে চিৎকার করে পশতুনে একটা কিছু বলেছে, লোকটা দৌড়ে দক্ষিণ প্রান্তের গোলপোস্টের দিকে চলে গেছে। ওখানে সানগ্লাসঅলা তালিব বয়ান দেওয়া সেই হুজুরের সঙ্গে আলাপ করছিল। ওরা তিনজন কথা বলেছে। সানগ্লাসঅলা লোকটাকে চোখ তুলে তাকাতে দেখেছি আমি। মাথা দুলিয়েছে সে। বার্তাবাহকের কানে কানে কি যেন বলেছে। তরুণ সেই বার্তাটা আবার আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে।

তখনই ঠিক হয়েছে সময়টা। বেলা তিনটায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বাইশ

ওয়াযির আকবার খানের একটা সুবিশাল বাড়ির ড্রাইভওয়ে বরাবর ল্যান্ডক্রুজার নিয়ে এগোল ফরিদ। ১৫ নম্বর সড়ক, সড়ক-ই-মেহ্মানের–অতিথির পথ–একটা কম্পাউন্ড ওয়ালের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়া উইলো গাছের ছায়ায় গাড়িটা থামাল সে। এঞ্জিন বন্ধ করে দিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা। নিজের আসনে নড়েচড়ে বসে ইগনিশন সুইচে লাগানো চাবি নিয়ে খেলতে লাগল ও। বুঝতে পারলাম একটা কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

"আমার মনে হয় গাড়িতেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করা ভালো হবে," অবশেষে বলল ও, কণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনার সুর। আমার দিকে তাকাচ্ছে না। "এটা এখন তোমার ব্যাপার। আমি–" ওর বাহু চাপড়ে দিলাম। "তোমাকে আমি যা টাকা দিয়েছি তার তুলনায় অনেক করেছ তুমি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, এই আশাই করিনি আমি।" তবে একা যেতেও মন চাইছিল না আমার। বাবা সম্পর্কে যা জেনেছি তা সত্ত্বেও, এখন ও আমার পাশে থাকলেই ভালো হত বলে মনে হল আমার। বাবা তো সোজা সদর দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে তাকে আসল লোকের কাছে নিয়ে যাবার দাবী জানাত। ওর পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তার দাড়িতেই পেচ্ছাপ করে দিত। কিন্তু অনেক আগেই মারা গেছে বাবা, হেওয়ার্ডের কবরস্থানের আফগান অংশে কবর দেওয়া হয়েছে ওকে। মাত্র গতমাসে সুরাইয়া আর আমি ওর মাথার কাছে ডেউজি আর ফ্রিসিয়া ফুলের তোড়া রেখে এসেছি। এখন আমি একদম একা।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার লম্বা কাঠের সদর দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

BanglaBook.org

বেল বাজালাম, কিন্তু কোনও আওয়াজ কানে এল না। এক মুহূর্ত বাদে অন্যপাশ থেকে কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে এল। কালাশনিকভঅলা দুজন লোক দরজা খুলল।

পেছন ফিরে গাড়িতে বসে থাকা ফরিদের দিকে তাকালাম, মনে মনে বললাম, *আমি ফিরে আসছি,* কিন্তু তেমন একটা ভরসা করতে পারলাম না কথাটার উপর।

সশস্ত্র লোক দুজন আমার আপাদমস্তক তল্লাশি করল। আমার পায়ে চাপড় দিল। কুচকি চিপে দেখল। ওদের একজন পশতুতে কী যেন বলল। দুজনই হেসে উঠল তারপর। সামনের গেইট দিয়ে ভেতরে পা রাখলাম আমরা। দুই পাহারাদার বেশ ভালোমতো পরিচর্যা করা লনের উপর দিয়ে আমাকে নিয়ে এগোল। দেয়াল বরাবর লাগানো একসারি জেরানিয়াম আর খাট ঝোপের পাশ ঘেঁষে আগে বাড়ল ওরা। উঠোনের শেষ মাথায় একটা পুরোনো হ্যান্ডপাম্প পানির কূয়ো। আমার মনে পড়ল জালালাবাদে হুমায়ূন কাকার বাড়িতে ঠিক এমন একটা পানির কূয়ো ছিল-যমজ দুই বোন ফাযিলা ও কারিমা আর আমি ওটায় নুড়ি পাথর ফেলতাম-*প্লিঙ্ক* শব্দ শোনার জন্যে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটা বিশাল দরাজভাবে সাজানো বাড়িতে ঢুকলাম আমরা। ফয়ে পার হলাম। দেয়ালের গায়ে একটা বিরাট আফগান পতাকা সাঁটানো। লোকগুলো দোতলার একটা রুমে নিয়ে এল আমাকে। এখানে একজোড়া মিন্ট সবুজ সোফা আর এককোণে একটা বড় পর্দার টিভি সেট রয়েছে। দুজনের মধ্যে বয়স্ক জন অস্ত্রের ব্যারেল দিয়ে একটা সোফার দিকে ইঙ্গিত করল। বসে পড়লাম আমি। রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা।

পায়ের উপর পা তুলে দিলাম আমি। আবার নামালাম। হাঁটুর উপর ঘামে ভেজা হাত রেখে বসে আছি। এতে কি আমাকে সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে? দুহাত একসঙ্গে জড়ো করলাম আমি। মনে হল এতে আরও খারাপ হয়েছে। এবার আড়াআড়িভাবে বুকের উপর হাত রাখলাম। কপালের দুপাশে রক্তের দপদপানি চলছে। একদম নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে। আমার মাথার ভেতরে নানান চিন্তার তুফান চলছে। কিন্তু একেবারেই ভাবতে মন চাইছে না আমার, কারণ আমার মনের সচেতন অংশ জানে নিজেকে যাতে জড়িয়ে ফেলেছি সেটা স্রেফ পাগলামি। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এমন একটা রুমে বসে আছি যেটাকে হাজতের মতো লাগছে। এক লোকের অপেক্ষা করছি যাকে নিজের চোখে একই দিনে দুজন মানুষকে খুন করতে দেখেছি আমি। এটা পাগলামি। তারচেয়েও খারাপ। অসম্ভব একটা ব্যাপার। খুবই ভালো সম্ভাবনা আছে যে আমি শেষ পর্যন্ত সুরাইয়াকে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে *বিওয়া* মানে

BanglaBook.org

বিধবায় পরিণত করব। *এটা তুমি নও, আমির,* আমার ভেতর থেকে কেউ একজন বলে উঠল, *তোমার কোনও সাহস নেই। এভাবে তোমাকে বানানো হয়েছে। সেটা এমন কিছু খারাপ নয়, কারণ তোমার একটা গুন হচ্ছে এনিয়ে নিজেকে কখনও চোখ ঠাওরাওনি তুমি। এব্যাপারে নয়। কাপুরুষতা বিচারবিবেচনার সঙ্গে এলে তাতে কোনও দোষ নেই। কিন্তু কাপুরুষ যখন নিজের পরিচয় ভুলে যেতে শুরু করে...তাকে খোদা ছাড়া আর কারও বাঁচানোর উপায় থাকে না।*

সোফার পাশে একটা কফি টেবিল রয়েছে। পায়াটা ইংরেজি এক্স আকৃতির, ধাতব পায়াগুলো যেখানে মিলেছে সেখানে ওয়ালনাট আকৃতির তামার বল রিংটাকে অলঙ্কৃত করেছে। এরকম একটা টেবিল আগেও দেখেছি। কোথায়? তারপর মনে পড়ল: পেশওয়ারের জনাকীর্ণ সেই চায়ের দোকানে। সেরাতে হাঁটতে বের হয়েছিলাম আমি। টেবিলের উপর এক বাটি আঙুর রাখা। একটা আঙুর ছিঁড়ে মুখে দিলাম। মাথার ভেতরের কণ্ঠস্বরটাকে থামানোর জন্যে একটা কিছু, যেকোনও কিছু দিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখার দরকার ছিল। আঙুরটা মিষ্টি। আরেকটা আঙুর ছিঁড়ে নিলাম আমি। এটাই অনেক দীর্ঘ সময়ের জন্যে আমার শেষ শক্ত খাবার হতে যাচ্ছে, ভাবতেই পারিনি।

দরজা খুলে গেল। সেই দুজন সশস্ত্রও লোক ভেতরে ঢুকল। ওদের দুজনের মাঝখানে সেই শাদা পোশাকের তালিব। এখনও জন লেনন সানগ্লাস পরে আছে চোখে। দেখে মনে হচ্ছে চওড়া কাঁধের নতুন কালের কোনও মরমী গুরু।

আমার সামনে একটা সিটে বসল সে। আর্মরেস্টের উপর হাত রাখল। অনেকক্ষণ কিছু বলল না। স্রেফ বসে রইল। আমাকে মাপছে, লক্ষ করছে। একহাতে সোফার নকশায় তাল ঠুকছে, অন্যহাতে কোয়েজ রঙ তজবীহ দানা গুনছে। এখন শাদা জামার উপর একটা কালো ভেস্ট পরেছে সে। হাতে সোনার ঘড়ি। তার বামহাতায় রক্তের একটা ছোপ চোখে পড়ল। সেদিন বেশ আগে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার এত পরেও সে পোশাক পাল্টায়নি দেখে হতবাক হয়ে গেলাম।

সময়ে সময়ে তার মুক্ত হাতটা বাতাসে ভাসছে, মোটামোটা আঙুলগুলো কি যেন তাড়ানোর চেষ্টা করছে। ওপর-নিচে, আশপাশে ধীর আঘাত করার ভঙ্গি করছে। যেন অদৃশ্য কোনও পোষা জানোয়ারকে আদর করছে। তার শার্টের একট হাতা সরে যেতেই বাহুর উপর একটা দাগ দেখতে পেলাম। স্যান

BanglaBook.org

ফ্রান্সিস্কোর বিষণ্ন গলির উদ্বাস্তুদের হাতেও এই ধরনের দাগ দেখেছি আমি।

অন্য দুজন লোকের চেয়ে তার গায়ের রঙ ঢের হালকা। প্রায় পাণ্ডুর বর্ণ। কালো পাগড়ির ঠিক প্রান্তে ঘামের একটা পর্দা দেখা যাচ্ছে। অন্যদের মতো বুক পর্যন্ত নেমে আসা তার দাড়িও হালকা রঙের।

"*সালাম আলাইকুম,*" বলল সে।

"*সালাম।*"

"এখন ওসব বাদ দিতে পারো তুমি," বলল সে।

"মাফ করবে?"

সশস্ত্র লোকদের একজনের দিকে হাতের তালু ঘোরাল সে, ইশারা করল। *রিররররপ।* হঠাৎ আমার গাল ব্যথা করে উঠল। পাহারাদার আমার দাড়ি ধরে উপর-নিচে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। হাসছে। হাসল তালিব। "ইদানীং আমার দেখা বেশ ভলো মাল। তবে এভাবেই বেশী ভালো মনে হয় আমার। তোমার কী মনে হয়?" আঙুল ঘোরাল সে, মটকাল। মুঠি করছে আবার খুলছে। "তো, *ইনশাল্লাহ,* আজকের শো উপভোগ করেছ নিশ্চয়ই?"

"তাই কি ছিল সেটা?" বললাম। গাল ডলছি। আশা করলাম গলার স্বরে আমার ভেতরের আতঙ্ক প্রকাশ পেয়ে যায়নি।

"ভাই আমার, প্রকাশ্য বিচার হচ্ছে সবচেয়ে বড় শো। নাটক। সাসপেন্স। এবং সবচেয়ে সেরা-গণশিক্ষা।" আবার আঙুল ফোটাল সে। দুই তালিবের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তরুণ তালিব তাকে সিগারেট ধরিয়ে দিল। তালিব হাসল। আপনমনে বিড়বিড় করে বলল কী যেন। হাত কাঁপছে তার। সিগারেটটা প্রায় ফেলেই দিচ্ছিল। "তবে আসল মজা দেখতে হলে তোমার উচিত ছিল আমার সঙ্গে ১৯৯৮ সালে মাযারে থাকা। ওটা ছিল আসল মজা।"

"দুঃখিত।"

"তুমি জান ওদের কুকুরবেড়ালের হাতে ছেড়ে এসেছি আমরা।"

এবার বুঝলাম কোন দিকে যাচ্ছে সে।

উঠে দাঁড়াল সে। সোফাকে ঘিরে বার দুই চক্কর দিল। আবার বসল। দ্রুত কথা বলল সে, "প্রত্যেকটা ঘরে গিয়েছি আমরা। পুরুষ আর ছেলেদের ডেকে বের করে এনেছি। ওদের পরিবারের চোখের সামনে গুলি করে মেরেছি। দেখতে দিয়েছি ওদের। ওদের মনে করিয়ে দিয়েছি ওরা আসলে কারা, কোথায় ওদের ঠিকানা।" এখন রীতিমতো হাঁপাচ্ছে সে। "অনেক সময় দরজা ভেঙে ওদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছি। তারপর...মেশিন গানের ব্যারেল ঘুরিয়ে একটানা গুলি চালিয়ে গেছি, যতক্ষণ না গুলির ধোঁয়া আমার চোখ অন্ধ করে

BanglaBook.org

দিয়েছে।" আমার দিকে ঝুঁকে এল সে, যেন গোপন কথা জানাতে চায়। "না-করা পর্যন্ত 'মুক্তি দেওয়া' কথাটার মানে বুঝবে না। টার্গেট ভরা একটা রুমে দাঁড়িয়ে অপরাধ বা অনুতাপের অনুভূতি থেকে মুক্ত অবস্থায় একটানা গুলি চালাতে পারা, তোমার জানা থাকা তুমি সৎ, ভালো আর ভদ্র। খোদার কাজ করছ, এটা জানা। রীতিমতো শ্বাসরুদ্ধকর।" একটা তজবীহ দানায় চুমু খেল সে। মাথা কাত করল। "তোমার মনে আছে, জাভিদ?"

"হ্যাঁ, আগা সাহিব," বলল অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রহরী। "কীভাবে ভুলতে পারি?"

খবর কাগজে মাযার-ই-শরীফের হত্যাযজ্ঞের কথা পড়েছি আমি। তালিবানরা মাযার দখল করে নেওয়ার পরপরই এঘটনা ঘটে। এটা ছিল শেষ পতন ঘটা শহরগুলোর একটা। মনে আছে রক্তহীন নাশতার টেবিলে ফ্যাকাশে চেহারায় লেখাটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিল সুরাইয়া।

"বাড়ি বাড়ি গেছি। কেবল *নামায* আর খাওয়ার সময় বিরতি দিয়েছি," বলল তালিব। বেশ আমোদের সাথে কথার কথা বলছে সে, যেন কোনও পার্টির বর্ণনা দিচ্ছে। "লাশগুলো রাস্তায় ফেলে রেখেছি আমরা। ওদের পরিবার চুরি করে লাশ ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। ওদেরও গুলি করেছি আমরা। দিনের পর দিন ওদের রাস্তায় ফেলে রেখেছি। কুকুরের খাবার হিসাবে রেখে দিয়েছি। কুকুরের জন্যে কুকুর।" সিগারেটটা দুমড়ে ফেলল সে। কাঁপা কাঁপা হাতে চোখ ডলল। "তুমি আমেরিকা থেকে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"ওই বেশ্যাটা এখন কেমন আছে?"

হঠাৎ পেশাবের চাপ বোধ করলাম আমি। মনে মনে প্রার্থনা করলাম এটা কেটে যাবে। "একটা ছেলেকে খুঁজছি আমি।"

"সবাই কি তাই খুঁজছে না?" বলল সে। কালাশনিকভঅলা লোকগুলো হেসে উঠল। ওদের দাঁতে সবুজ *নাসবারের* দাগ।

"আমি যতদূর জানি সে এখানে তোমার কাছে আছে," বললাম আমি। "ওর নাম সোহরাব।"

"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি। ওই বেশ্যাটাকে নিয়ে কী করছ? তুমি এখানে নেই কেন? তুমি তোমার মুসলিম ভাইদের সঙ্গে এখানে থেকে দেশ-সেবা করছ না কেন?"

"অনেক দিন আগে থেকেই দূরে আছি আমি," এছাড়া বলার মতো আর কিছু খুঁজে পেলাম না। মাথার ভেতরটা উত্তপ্ত ঠেকছে। দুই হাঁটু এক করলাম

BanglaBook.org

আমি, ব্লাডার সামলে রাখার চেষ্টা করছি। দরজার পাশে দাঁড়ানো লোক দুটোর দিকে তাকাল তালিব। "এটা একটা জবাব হল?" তাদের জিজ্ঞেস করল সে।

"না, আগা সাহিব," হাসিমুখে একসঙ্গে বলল ওরা।

আমার দিকে চোখ ফেরাল সে। কাঁধ ঝাঁকাল। "ওরা বলছে এটা জবাব হয়নি।" সিগারেটে লম্বা একটা টান দিল সে। "আমার দলের লোকজন বলে *ওয়াতানের* সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া বিশ্বাসঘাতাকতার মতোই পাপ। বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তোমাকে গ্রেপ্তার করাতে পারতাম আমি। এমনকি গুলি করতে পারতাম। এটা কি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে?"

"আমি শুধু ছেলেটার জন্যে এখানে এসেছি।"

"তোমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে কি না?"

"হ্যাঁ।"

"দেওয়া উচিত," বলল সে।

সুরাইয়ার কথা ভাবলাম আমি। স্বস্তি বোধ হল। ওর কান্তে অকৃতির জন্মদাগ, কাঁধের রাজকীয় বাঁক, উজ্জ্বল চোখজোড়ার কথা ভাবলাম। ভাবলাম আমাদের বিয়ের প্রথম রাতের কথা, সবুজ পর্দার আড়ালে আয়নায় একে অপরের প্রতিবিম্ব দেখেছি। আমি ফিসফিস করে ওকে ভালোবাসার কথা বলার সময় ওর চেহারা লাল হয়ে উঠেছিল সেকথা ভাবলাম। আমরা দুজন নেচে নেচে, ঘুরে ঘুরে একটা পুরোনো আফগান গান গেয়েছিলাম, সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল, হাত তালি দিচ্ছিল। দুনিয়াটা পরিণত হয়েছিল ফুল, পোশাক, টক্সিডো আর হাসিহাসি মুখের একটা ঝলকে।

একটা কিছু বলছিল তালিব।

"মাফ করবে?"

"বললাম ওকে দেখতে চাও? আমার ছেলেটাকে দেখতে চাও নাকি?" শেষ কথাটা বলার সময় তার উপরের ঠোঁটটা ভেংচি কটার ভঙ্গিতে বেঁকে গেল।

"হ্যাঁ।"

রুম ছেড়ে বের হয়ে গেল পাহারাদাররা। একটা দরজা খুলে যাবার শব্দ পেলাম। কঠিন কণ্ঠে পশতুতে একজন পাহারাদারকে একটা কিছু বলতে শুনলাম। তারপর পায়ের শব্দ, প্রতি পদক্ষেপে নূপুরের আওয়াজ। আমি আর হাসান শার-ই-নও্তে এক বাঁদরঅলার পিছু নিতাম, মনে পড়ে গেল সেকথা। নাচ দেখার জন্যে আমাদের হাত খরচা থেকে এক রূপিয়া দিতাম তাকে। তার বাঁদরের গলার ঘণ্টা ঠিক এরকমই শব্দ করত।

এবার দরজা খুলে ভেতরে এল পাহারাদার। একটা স্টেরিয়ো—একটা বুম বক্স—নিয়ে এসেছে সে। তার পেছনে ঢিলাঢালা সেফায়ার নীল *পিরহান-তাম্বান* পরা একটা ছেলে।

মিলটা শ্বাসরুদ্ধকর। হতবুদ্ধিকর। রহিম খানের পোলারয়েড ওর প্রতি সুবিচার করেনি।

বাবার গোলাকার চাঁদের মতো চেহারা পেয়েছে ছেলেটা। একই রকম সূচাল থুতনি। বাঁকানো ঝিনুকের মতো কান। সেই একই রকম হালকা পাতলা কঠামো। আমার ছোটবেলার চাইনিজ সেই পুতুলটার চেহারা। সেই শীতকালগুলোয় তাস খেলার সময়গুলো মেলে ধরল। গরমকালে আমরা বাবার বাড়ির ছাদে মশারির নিচে ঘুমোনোর সময় জালের পেছনে যে চেহারা দেখা যেত। ওর মাথা কামানো। মাসকারায় গাঢ় হয়ে আছে চোখজোড়া। অস্বাভাবিকভাবে পাউডার লাগানোয় চেহারা লাল হয়ে আছে। রুমের মাঝখানে এসে দাঁড়াতেই গোড়ালিতে বাঁধা নূপুরের আওয়াজ থেমে গেল।

আমার উপর এসে পড়ল তার চোখ, একটু ক্ষণ স্থায়ী হল। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে। নগ্ন পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাহারাদারদের একজন একটা বোতামে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সারা ঘর পশতু গানে ভরে উঠল। তবলা, হারমোনিয়াম আর *দিল-রুবার* শিস। ভাবলাম তালিবানদের কানে যতক্ষণ সুধা ঢালছে ততক্ষণ হয়ত গান শোনা গুনাহর কাজ নয়। তিনজন লোক হাত তালি দিতে শুরু করল।

দুহাত উঁচু করে আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করল সোহরাব। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে মোহনীয় ভঙিতে পাক খেকে খেতে হাঁটু গেড়ে বসল ও, তারপর আবার সোজা হল। আবার পাক খেল। ওর কচিকচি হাতজোড়া কব্জির কাছে মোচড় খাচ্ছে। গিঁটের ঝটকা ফাটছে। পেণ্ডুলামের মতো এপাশ ওপাশ দোল খাচ্ছে ওর মাথা। মেঝেতে তাল ঠুকতে লাগল ওর পা, তবলার তালে তালে নিখুঁতভাবে বাজতে লাগল পায়ের নূপুড়। চোখ বন্ধ করে রেখেছে ও।

"মাশাল্লাহ!" চিৎকার করে উঠল ওরা। *"সাবাস! সাবাস!"* দুই পাহারাদার শিস দিয়ে হেসে উঠল। শাদা পোশাকের তালিব বাজনার তালে তালে সামনে পেছনে মাথা দোলাচ্ছে। ভেঙচি কাটার ভঙিতে ফাঁক হয়ে আছে তার ঠোঁট।

চোখ বুজে চক্কর মেরে নাচছে সোহরাব। বাজনা না থামা পর্যন্ত নেচে গেল ও। গানের শেষ কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেঝেতে পা ঠুকছে। শেষবারের মতো বেজে উঠল ওর পায়ের নূপুড়। ঘূর্ণির মাঝখানেই থমকে দাঁড়াল সে।

"*বায়া, বায়া*, আহা ছেলে আমার," বলে উঠল তালিব। সোহরাবকে কাছে

BanglaBoi.org

ডাকল। ওর কাছে গেল সোহরাব। মাথা নামিয়ে রেখেছে। লোকটার দুই উরুর মাঝেখানে দাঁড়াল ও। ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরল তালিব। "কত বুদ্ধি ওর, না, আমার হাযারা ছেলে!" বলল সে। ছেলেটার পিঠের উপর দিয়ে পিছলে নেমে এল তার হাত। আবার উঠল। বগল তলায় হাত চালাল। এক পাহারাদার আরেকজনকে কনুই দিয়ে ঠেলা মেরে দাঁত খিঁচাল। ওদের চলে যেতে বলল তালিব।

"জ্বি, আগা সাহিব," বলে চলে গেল ওরা।

ছেলেটাকে উল্টো দিকে ঘোরাল তালিব, ফলে আমার মুখোমুখি হল সে। সোহরাবের পেট জড়িয়ে ধরল সে। ওর কাঁধের উপর থুতনি রাখল। নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল সোহরাব। তবে বারবার চোরা-চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আস্তে আস্তে ছেলেটার পেটের উপর হাত বোলাতে লাগল লোকটা।

"আমি ভাবছি," সোহরাবের কাঁধের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল তালিব, তার চোখজোড়া রক্তের মতো লাল হয়ে আছে। "বুড়ো *বাবালুর* আসলে কী হয়েছে শেষ পর্যন্ত?"

প্রশ্নটা যেন হাতুড়ির মতো আমার কপালের ঠিক মাঝখানে আঘাত করল। ঝুঝতে পারলাম আমার চোখমুখ শাদা হয়ে গেছে। পাজোড়া ঠাণ্ডা অসাড় হয়ে এল।

অট্টহাসি দিল সে। "তুমি কী ভেবেছিলে? নকল দাড়ি লাগালেই আর তোমাকে চিনতে পারব না? তাহলে আমার সম্পর্কে একটা কথা শোন, যা কোনওদিন জানতে না তুমি। আমি কখনও কারও চেহারা ভুলি না। কখনওই না।" সোহরাবের কানে ঠোঁট মুছল সে। চোখ রইল আমার দিকে। "শুনেছি তোমার বাবা মারা গেছে। *চুক, চুক!* আমি সব সময়ই তার মোকাবিলা করার কথা ভেবেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে তার এই ডরপুক ছেলেটাকেই বেছে নিতে হবে।" এবার সানগ্লাস খুলে ফেলল সে। রক্তরাঙা চোখে আমার চোখের দিকে তাকাল।

শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। চোখের পাতা ফেলার চেষ্টা করলাম, তাও পারলাম না। মুহূর্তটাকে কেমন যেন পরাবাস্তব বলে মনে হল–না, না, ঠিক পরাবাস্তব নয়, অসম্ভব–আমার শ্বাস রুদ্ধ করে দিয়েছে, আমার চারপাশের জগতকে থমকে দিয়েছে। আমার মুখ-চোখ জ্বলছে। অচল পয়সা নিয়ে পুরোনো প্রবাদটা যেন কী? আমার অতীত ঠিক তেমন–বারবার দেখা দিচ্ছে। মনের গভীর প্রদেশ থেকে তার নাম উঠে এল। সেটা উচ্চারণ করতে চাইলাম না আমি। যেন নামটা উচ্চারণ করলেই সে এসে হাজির হবে এখানে।

BanglaBook.org

কিন্তু সে তো আগেই এসে পড়েছে। রক্তমাংসে। আমার থেকে দশ ফুটেরও কম দূরত্বে। এতগুলো বছর পরে। আমার ঠোঁট ফুঁড়ে তার নাম বের হয়ে এল। "আসেফ।"

"আমির জান।"

"তুমি এখানে কী করছ?" জিজ্ঞেস করলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম প্রশ্নটা কেমন মারাত্মক বোকার মতো হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরেও অন্যকিছু বলার মতো ভেবে পেলাম না।

"আমি?" একটা ভুরু বাঁকাল আসেফ। "আমি তো আমার মতোই আছি। প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি এখানে কী করছ?"

"আগেই বলেছি," বললাম। গলা কাঁপছে আমার। না কাঁপলেই ভালো ছিল, ভাবলাম। আমার শরীরের মাংস হাড়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না, বললাম মনে মনে।

"ছেলেটা?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"তোমাকে ওর জন্যে টাকা দেব," বললাম। "টাকা আনাতে পারব আমি।"

"টাকা?" বলল আসেফ। হাসল বোকার মতো। "রকিং হ্যামের কথা কখনও শুনেছ? পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ায় এক টুকরো বেহেশত। দেখা দরকার ছিল তোমার। মাইলের পর মাইল বীচ। সবুজ পানি, নীল আকাশ। বাবা-মা ওখানে থাকে– একটা বীচফ্রন্ট ভিলায়। ভিলার পেছনে একটা গলফ কোর্স আর একটা ছোট লেক আছে। রোজ গলফ খেলে বাবা। মা আবার টেনিস পছন্দ করে। বাবা বলে মায়ের ব্যাকহ্যান্ড নাকি মারাত্মক। একটা আফগান রেস্তোরাঁ আর দুটো জুয়েলারি দোকানের মালিক ওরা। দুটো ব্যবসাই দারুণ চলছে।" একটা লাল আঙুর ছিঁড়ে নিল সে। সোহাগ ভরে সোহরাবের মুখে তুলে দিল। "তো, আমার টাকা লাগলে ওদেরই বলব টাকা পাঠাতে।" সোহরাবের ঘাড়ের একপাশে চুমু খেল সে। একটু কুকড়ে গেল ছেলেটা। আবার চোখ বুজল। "তাছাড়া, আমি টাকার জন্যে *শোরোভিদের* বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিনি। টাকার জন্যে তালিবানেও যোগ দিইনি। কেন যোগ দিয়েছি জানতে চাও?"

আমার ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালাম। জিভও শুকিয়ে গেছে।

"তোমার তেষ্টা পেয়েছে?" তুষ্টির সঙ্গে হাসল আসেফ।

BanglaBoi.org

"না।"

"আমারও তা মনে হয় না!"

"ঠিকই আছি আমি," বললাম। আসল কথা হল পুরো ঘরটা এখন নিদারুণ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে—শরীরের প্রত্যেকটা রোমকূপ থেকে দরদর করে ঘাম বের হয়ে আসছে, গা চুলবুল করছে। সত্যিই কি এমনটা ঘটছে? সত্যি সত্যি কি আমি আসেফের সামনে বসে আছি?

"তোমার যেমন মর্জি," বলল সে। "যাক গে, কি যেন বলছিলাম? ও হ্যাঁ, কীভাবে তালিবানে যোগ দিলাম আমি। বেশ, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তেমন একটা ধার্মিক ছিলাম না আমি। কিন্তু একদিন একটা এপিফ্যানি হল আমার জীবনে। জেলের ঘটনা। শুনতে চাও?"

কিছু বললাম না।

"বেশ। বলছি তোমাকে," বলল সে। "১৯৮৯ সালে বাবরাক কারমাল ক্ষমতা নেওয়ার পরপরই কিছুদিন পোলেহ্-চারখিতে জেলে থাকতে হয়েছিল আমাকে। একদিন রাতে একদল পারচামি সৈন্য আমাদের বাড়িতে হানা দিয়ে বন্দুকের মুখে বাবা আর আমাকে ওদের সঙ্গে যাবার হুকুম দেয়। তারই ফলে ওখানে যেতে হয়েছিল। হারামজাদারা কোনও কারণ দেখায়নি। মায়ের প্রশ্নেরও কোনও জবাব দেয়নি। এটা অবশ্য কোনও রহস্যজনক কিছু না। সবাই জানে কমিউনিস্টদের কোনও জাত নেই। নামজাতহীন গরীব ঘর থেকে এসেছে ওরা। *শোরোভিরা* আসার আগে যেসব কুত্তার আমাদের জুতো চাটারও যোগ্যতা ছিল না, তারাই বন্দুকের মুখে এখন আমাকে হুকুম করছিল। ওদের ল্যাপেলে পারচামি পতাকা। বুর্জোয়াদের পতন নিয়ে কথা বলছে। এমন ভাব করছে যেন ওরাই আসল জাতের মানুষ। সব জায়গায় এসব ঘটছে। বড়লোকদের পাকড়াও করে জেলে ঢোকাও। কমেরেডদের সামনে একটা নজীর তুলে ধর।

"সে যা হোক, একটা রেফ্রিজারেটরের সমান সেলে ঠাসাঠাসি করে ছয়জন ছিলাম আমরা। রোজ রাতে আধা-হাযারা আধা-উযবেক এক কমানডেন্ট পচা গাধার মতো হাসি দিয়ে কোনও একজন হাজতিকে সেল থেকে বের করে নিয়ে যেত, তারপর চোখমুখ ঘেমে একসার না হওয়া পর্যন্ত বেধড়ক মেরে চলত তাকে। তারপর একটা সিগারেট ধরাত সে। হাড় ফোটাত। চলে যেত তারপর। পরের রাতে আবার অন্য কাউকে বেছে নিত সে। এরচেয়ে খারাপ সময় আর হয় না। তিনদিন ধরে রক্ত পেচ্ছাপ করছিলাম আমি। কিডনির পাথর। তোমার যদি এমন কখনও না হয়ে থাকে তো আমার

BanglaBook.org

কাছে শোন, এরচেয়ে জঘন্য ব্যথা আর হতে পারে না। মায়েরও ছিল রোগটা। মনে আছে আমাকে একবার বলেছিল কিডনির পাথরের ব্যথা সহ্য করার চেয়ে বরং আবার বাচ্চা জন্ম দিতে রাজি আছে ও। যা হোক, কী করার ছিল আমার? জোর করে ওরা আমাকে বের করে নিয়ে এল, তারপর লাথি হাঁকাতে শুরু করল সে। লাথি মারার এই খেলাটার জন্যে আগার দিকে ইস্পাতের ফলা লাগানো হাঁটু অবধি উঁচু বুট জুতো পায়ে দিত সে। আমার উপর কাজে লাগাল সে ওগুলো। আমি তো চিৎকার করেই যাচ্ছি। আর সেও লাথি মেরে যাচ্ছে। তারপর আচমকা আমার বাম দিকের কিডনির উপর লাথি বসিয়ে দিল সে। পাথরটা বের হয়ে গেল। ঠিক এই রকমই! ওহ, কি যে স্বস্তি!" হেসে উঠল আসেফ। "আমি চিৎকার দিয়ে উঠলাম *'আল্লাহু আকবার।'* আমাকে আরও জোরে লাথি মারল সে। হাসতে শুরু করে দিলাম আমি। খেপে গিয়ে আরও জোরে মারতে লাগল সে আমাকে। সে আমাকে যত জোরে মারে, আমিও তত জোরে হাসি। হাসতে থাকা অবস্থাতেই আমাকে সেলে ভরে দিল সে। আমি অবিরাম হেসেই চললাম, কারণ আমি তখন বুঝে গেছি খোদার কাছ থেকে ওহী এসে গেছে আমার কাছে: আমার পক্ষেই আছেন তিনি। একটা বিশেষ কারণে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তিনি।

"কি জানো, কয়েক বছর পরে সেই কমানডেন্টের দেখা পেয়ে যাই আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে। খোদার লীলা বোঝা দায়। মাইমানাহর ঠিক বাইরেই একটা ট্রেঞ্চে তাকে পাই আমি, বুকে একটা শার্পনেলের আঘাতের ফলে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল তার। সেই বুটজোড়াই ছিল তার পায়ে। আমার কথা মনে আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম তাকে। বলল না। ওকেও সেই কথাই বললাম, যা তোমাকে বলেছি। আমি কখনও কারও চেহারা ভুলি না। ব্যাটার বীচিতে গুলি করলাম আমি। তখন থেকেই একটা মিশনে আছি আমি।"

"তা মিশনটা কী?" নিজেকে বলতে শুনলাম। "ব্যভিচারীদের পাথর ছোঁড়া? ছোট ছেলেদের ধর্ষণ করা? হাই-হীল পায়ে দেওয়ার কারণে মেয়েদের চাবুক মারা? হাযারাদের হত্যা করা? সবই ইসলামের নামে?" আমি রাশ টানার আগেই কথাগুলো হড়হড় করে বের হয়ে এল আমার মুখ দিয়ে। কথাগুলো আবার ফিরিয়ে নিতে পারলে, গিলে ফেলতে পারলে ভালো হত। কিন্তু বলা হয়ে গেছে। আমি সীমা অতিক্রম করে ফেলেছি। জীবীত বের হয়ে যাবার যাও একটু আশা ছিল, সেটা এই কথাগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে উধাও হয়ে গেছে।

নিমেষের জন্যে আসেফের চেহারায় বিস্ময়ের একটা ছাপ পড়েই উধাও

BanglaBook.org

হয়ে গেল। "মনে হচ্ছে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠতে যাচ্ছে," চাপা হাসি দিয়ে বলল সে। "তবে তোমার মতো বেঈমানরা বোঝে না এমন কিছু বিষয় আছে।"

"যেমন?"

বেঁকে গেল আসেফের ভ্রূজোড়া। "যেমন তোমাদের মতো লোকদের মনের অহঙ্কার। তোমাদের ভাষা। আফগানিস্তান আবর্জনায় ভরা কোনও বিরাট ম্যানশনের মতো। কাউকে এই আবর্জনা সাফ করতে হবে।"

"সে কাজটাই মাযারে করছিলে তোমরা, ঘরে ঘরে গিয়ে? আবর্জনা সাফ করছিলে?"

"ঠিক ধরেছ।"

"পশ্চিমে এটার একটা নাম আছে," বললাম। "একে ওরা বলে জাতিগত শুদ্ধি অভিযান।"

"তাই?" উজ্জ্বল হয়ে উঠল অসেফের চেহারা। "জাতিগত শুদ্ধি অভিযান। কথাটা আমার পছন্দ হয়েছে। বেশ ভালো লেগেছে।"

"আমি শুধু এই ছেলেটাকে চাই।"

"জতিগত শুদ্ধি অভিযান," বিড়বিড় করে বলতে লাগল আসেফ। স্বাদ নিচ্ছে কথাটার।

"আমি ছেলেটাকে চাই," আবার বললাম। চকিতে আমার দিকে ফিরল সোহরাবের দৃষ্টি। কাসাইয়ের কবলে পড়া ভেড়ার দৃষ্টি এটা। ওদের চোখেও মাসকারা লাগানো থাকত–মনে আছে *ঈদ-ই-কুরবানের* সময় আমাদের পেছনের উঠোনে মোল্লাহ ভেড়ার চোখে দরাজভাবে মাসকারা লাগাত। গলা কাটার আগে ওটাকে চিনির একটা দলা খাওয়াত। সোহরাবের চোখে আবেদন দেখতে পেয়েছি বলে মনে হল আমার।

"কারণটা বলো আমায়," বলল আসেফ। দাঁত দিয়ে সোহরাবের কানের লতি কামড়াচ্ছে সে। ছেড়ে দিল। ভুরু দিয়ে ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে নামছে।

"সেটা আমার ব্যাপার।"

"ওর সঙ্গে কী করতে চাও?" বলল সে। কপট হাসি দিল। "অথবা ওকে কী করবে?"

"জঘন্য," বললাম।

"কীভাবে জান তুমি? চেষ্টা করে দেখেছ?"

"ওকে আরও ভালো কোনও জায়গায় নিয়ে যেতে চাই।"

"কারণটা বলো আমায়।"

BanglaBook.org

"সেটা আমার ব্যাপার," বললাম। জানি না কী কারণে এমন চাঁছাছোলা হয়ে উঠেছিলাম। হয়ত মনে হয়েছিল যে মরতে চলেছি।

"ভাবছি," বলল আসেফ। "ভাবছি, কেন এতটা পথ ভেঙে এসেছ তুমি, আমির, একটা হাযারার জন্যে এতদূর এসেছ? কেন এখানে এসেছ তুমি? *আসলে* কেন এসেছ?"

"আমার নিজস্ব কারণ আছে," বললাম।

"ঠিক আছে তাহলে," দাঁত খিঁচিয়ে বলল আসেফ। সোহরাবের পিঠে ঠেলা দিয়ে ওকে সোজা টেবিলের দিকে পাঠিয়ে দিল। উল্টে পড়ে গেল টেবিলটা, আঙুরের থোকাগুলো ছিটকে গেল। ওগুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়ল সোহরাব। আঙুরের রসে শার্ট ভরে গেল। টেবিলের পায়াগুলো তামার বলের ভেতর দিয়ে বের হয়ে এসে এখন ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"তবে নিয়ে যাও ওকে," বলল আসেফ। সোহরাবকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলাম আমি। ওর প্যান্টের সঙ্গে নৌকার গায়ে শামুকের মতো লেপ্টে থাকা থেঁতলানো আঙুরগুলো ঝেড়ে ফেললাম।

"নিয়ে যাও ওকে," দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল আসেফ।

সোহরাবের হাত ধরলাম আমি। একেবারে কচি হাত। চামড়া শুকনো, কড়া পড়া। ওর আঙুলগুলো নড়ে উঠল, আমার হাত জড়িয়ে ধরল। আবার সেই ছবির সোহরাবকে দেখতে পেলাম আমি। হাসানের পা যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিল ও। বাবার কোমরের কাছে রাখা ওর মাথা। ওরা দুজনই হাসছিল। আমরা ঘরের ভেতর দিয়ে এগোনোর সময় নূপুর বেজে চলল।

দরজা পর্যন্ত এগোতে পারলাম আমরা।

"অবশ্যই আমি একথা বলিনি যে বিনে পয়সায় ওকে নিয়ে যেতে পারবে তুমি।"

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। "কী চাও তুমি?"

"ওকে আয় করে নিতে হবে তোমাকে।"

"কী চাও তুমি?"

"আমাদের কিছু বকেয়া কাজ রয়ে গেছে, তোমার আর আমার," বলল আসেফ। "মনে আছে না তোমার?"

উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না তার। দাউদ খান বাদশাহকে গদিচ্যুত করার পরের দিনের কথা জীবনেও ভুলব না আমি। সারা জীবন যখনই দাউদ খানের নাম শুনেছি, তখনই হাসান ওর গুলতিটা আসফের দিকে তাক করে রেখেছে দেখতে পেয়েছি আমি। হাসান বলছে, *গোশখোর* আসেফের বদলে

BanglaBook.org

সবাই তাকে কানা আসেফ ডাকতে শুরু করবে। হাসানের সাহস দেখে কতটা গর্বিত হয়েছিলাম এখনও মনে আছে আমার। পিছু হটেছিল আসেফ। বলেছিল শেষ পর্যন্ত আমাদের দুজনকেই কায়দামতো পাবে সে। হাসানের বেলায় সেই কথা রেখেছে। এবার আমার পালা।

"ঠিক আছে," বললাম। এছাড়া আর কী বলতে হবে বুঝতে পারলাম না। আমি তার অনুকম্পা চাইতে পারব না, সেটা কেবল পরিস্থিতি তার কাছে আরও মজাদার করে তুলেবে।

পাহারাদারদের আবার তলব করল অসেফ। "আমার কথা শোন," ওদের বলল সে। "একটু পরেই এই দরজাটা আটকে দিচ্ছি আমি। তারপর ও আর আমি একটা পুরোনো লেনদেন চুকাব। তোমাদের কানে যাই যাক না কেন, ভেতরে আসবে না! কানে গেছে আমার কথা? ভেতরে ঢুকবে না।"

মাথা দোলাল দুই পাহারাদার। একবার আমার দিকে আরেকবার আসেফের দিকে তাকাল। "জ্বি, আগা সাহিব।"

"ব্যাপারটা চুকে যাবার পর আমাদের মধ্যে মাত্র একজন এই রুম থেকে জ্যান্ত বের হয়ে যাবে," বলল আসেফ। "যদি ও বের হয়, তাহলে বুঝতে হবে মুক্তি অর্জন করেছে সে। ওকে চলে যেতে দেবে, বোঝা গেছে?"

বয়স্ক পাহারাদারটি এক পা থেকে আরেক পায়ে দেহের ভর বদল করল। "কিন্তু আগা সাহিব–"

"ও বের হলে ওকে তোমরা চলে যেতে দেবে!" চিৎকার করে উঠল আসেফ। কুকড়ে গেল লোক দুজন, তবে সায় দিল। চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাড়াল ওরা। সোহরাবের দিকে হাত বাড়াল ওদের একজন।

"ওকে রেখে যাও," বলল আসেফ। "দেখুক ও। ছোট ছেলেদের একটা শিক্ষা পাওয়া দরকার।"

চলে গেল পাহারাদাররা। তজবীহ নামিয়ে রাখল আসেফ। কালো পোশাকের বুক পকেটে হাত ঢোকাল। পকেট থেকে বের করে আনা জিনিসিটা আমাকে একটুও অবাক করল না: এটা তার সেই ইস্পাতের ব্রাস নাকলস।

চুলে জেল লাগিয়েছে সে, পুরু ঠোঁটে ক্লার্ক গেবল কায়দার গোঁফ। সবুজ পেপার সার্জিকাল ক্যাপ শুষে নিয়েছে জেল, ফলে আফ্রিকার ম্যাপের আদলে একটা গাঢ় দাগ পড়েছে। এই জিনিসটা আমার মনে আছে। আর গলায় ঝোলানো আল্লাহ লেখা লকেটের কথা। আমার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে। আমার অচেনা এক ভাষায় কথা বলে যাচ্ছে। উর্দু মনে হয়।

BanglaBook.org

বারবার ওঠানামা করতে থাকা তার কণ্ঠমণির দিকে চলে যাচ্ছে আমার চোখ। তাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল আসলে কত বয়স তার–অনেক কম বয়সী দেখাচ্ছে তাকে। কোনও বিদেশী অপেরার অভিনেতার মতো। কিন্তু আমি শুধু বিড়বিড় করে বলতে পারলাম, মনে হয় ভালোই লড়েছি ওর সঙ্গে। ভালো লড়েছি ওর সঙ্গে।

আসেফকে ঠিক মতো ধোলাই দিয়েছি কিনা জানি না। মনে হয় না। কীভাবে সেটা সম্ভব আমার পক্ষে? কারও সাথে এটাই ছিল আমার প্রথম মারপিট। সারা জীবন আমি কাউকে একটা ঘুসি পর্যন্ত মারিনি।

আসেফের সঙ্গে আমার মারামারির স্মৃতি বিস্তারের দিক দিয়ে বিস্ময়করভাবে উজ্জ্বল। ব্রাস নাকলস হাতে লাগানোর আগে আমার দিকে ঘুরছিল আসেফ, মনে আছে আমার। দেয়ালে টানানো মক্কা শরীফের বাঁকানো ছবিঅলা জায়নামাজটা একসময় খুলে পড়েছিল। আমার মাথায় এসে পড়ে ওটা। ওটার ধূলির কারণে হাঁচি এসে গিয়েছিল আমার। আসেফ আমার মুখে আঙুর *ঠেসে* দিচ্ছে, মনে আছে। ভেঙচানোর মতো করে সবকটা দাঁত বের হয়ে থাকা। ঘূর্ণি খাওয়া লাল একজোড়া চোখ। এক সময় মাথা থেকে পাগড়ি খসে পড়েছে তার। কাঁধ অবধি লম্বা চুল আলগা হয়ে পড়েছিল।

আর শেষটা তো বটেই। এটা একেবারে জলজল হয়ে আছে আমার মনে। সব সময় মনে থাকবে।

তবে বেশী মনে আছে এইটুকু: বিকেলের আলোয় ঝলকে উঠছে ওর ব্রাস নাকলস; প্রথম কয়েকটা আঘাতের সময় কত শীতল *ঠেকেছিল* ওগুলো, তারপর রক্তের ছোঁয়া পেয়ে অল্পক্ষণেই উষ্ণ হয়ে উঠেছে। একবার দেয়ালের উপর ছুড়ে ফেলা হয়েছে আমাকে, দেয়ালে টানানো একটা ছবির পেরেক গেঁথে গেছে আমার পিঠে। সোহরাবের আর্তনাদ। তবলা, হারমোনিয়াম। একটা *দিল-রুবা*। দেয়ালের উপর *ঠেসে* ধরা। নাকলসের ঘায়ে চোয়াল ভেঙে যাওয়া। নিজের দাঁত গলায় আটকে যাওয়ার অবস্থা, ওগুলো গিলে ফেলা। অসংখ্যবার ব্রাশ আর ফ্লসিং করার কথা ভেবেছি। দেয়ালের উপর ছুড়ে ফেলা। মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে থাকা, আমার মুখের রক্তের স্বাদ অনুভব করা। কার্পেটে লাল দাগ পড়ে যাওয়া। পেটের ভেতর দিয়ে ব্যথার একটা স্রোত বয়ে যাওয়া। আবার কখন শ্বাস নিতে পারব সেই চিন্তা করা। সেই পুরোনো দিনের ছবির সিন্দবাদের মতো তলোয়ারের লড়াই করার জন্যে আমি আর হাসান যেভাবে গাছের ডাল ভেঙে নিতাম ঠিক সেভাবে পাঁজরের হাড় ভাঙার শব্দ কানে আসা।

BanglaBook.org

সোহরাব আর্তনাদ করছে। টেলিভিশন স্ট্যান্ডের কোণে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়া। আবার সেই ফেটে যাবার আওয়াজ। এবার আমার বাম চোখের নিচে। গান। সোহরাবের আর্তচিৎকার। আমার চুল চেপে ধরা হাত। পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমার মাথা। স্টেইনলেস স্টিলের ঝিলিক। আসছে। আবার সেই ফাটার শব্দ। এবার নাক। ব্যথার ঠেলায় ঠোঁট কামড়ে ধরা। তারপর টের পাওয়া আগের মতো ঠিক খাপ খাচ্ছে না ওগুলো। লাথি খাওয়া। সোহরাবের চিৎকার।

জানি না ঠিক কখন হাসতে শুরু করেছিলামা। কিন্তু হেসেছি। হাসতে ব্যথা লাগছিল। ব্যথা লাগছিল চোয়ালে, পাঁজরে, গলায়। কিন্তু আমি একনাগাড়ে হেসেই চললাম। আমি যত জোরে হাসি তত জোরে আমাকে লাথি কষে সে। ঘুসি মারে। আঁচড় কাটে।

"এখানে হাসির কী আছে?" প্রত্যেকটা আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করছে আসেফ। আমার চোখে এসে পড়ছে ওর থুতু। সোহরাব চেঁচাচ্ছে।

"এখানে এত হাসির কী আছে?" গর্জে উঠল আসেফ। আরেকটা পাঁজর ভেঙে গেল। এবার বাম পাশের নিচের দিকে। হাসির ব্যাপার হচ্ছে, ১৯৭৫ সালের পর এই প্রথম বারের মতো শান্তি বোধ করছি আমি। হাসছি কারণ আমারে মনের কোনও গোপন কন্দরে এই রকম একটা অবস্থারই অপেক্ষা করছিলাম আমি। হাসানের গায়ে ডালিমের রস লাগিয়ে ওকে খেপিয়ে তোলার চেষ্টা করার সেই দিনের কথা আমার মনে আছে। ও কেবল ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিল। রসে ভিজে গেলেও কিছুই করেনি। রক্তের মতো লাল রস শার্ট ভেদ করে চলে যাচ্ছিল। তারপর আমার হাত থেকে ডালিমটা নিয়েছে ও, আমার কপালে ভর্তা করেছে ওটা। *সন্তুষ্ট হয়েছ এবার?* হিসহিস করে বলে উঠেছিল ও। *এখন ভালো লাগছে?* আমার ভালো লাগেনি, মোটেই সুখ পাইনি আমি। তবে এখন পাচ্ছি। আমার গোটা শরীর ভেঙে পড়েছে। ঠিক কতটা ক্ষতি হয়েছে সেটা এখনই জানা যাবে না। কিন্তু মনে হচ্ছে সেরে গেছি। অবশেষে সেরে উঠেছি। হাসতে লাগলাম আমি।

তারপর সমাপ্তি। এটাই কবরে নিয়ে যাব আমি :

মাটিতে পড়ে হাসছি আমি। আমার বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে আসেফ। আমার মুখ থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে ওর চুলের কুণ্ডলীর কাঠামোর ভেতর দেখা যাচ্ছে তার চেহারার উন্মাদের ছায়া। ওর মুক্ত হাতটা আমার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে। নাকলস পরা হাতটা কাঁধের উপর তুলে রাখা। মুঠিটা আরও উপরে তুলল সে। আবার আঘাত হানবে।

BanglaBook.org

তারপর: *"ব্যস।"* একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

দুজনই তাকালাম আমরা।

"প্লিজ, আর না।"

ফরিদ আর আমাকে দরজা খুলে দেওয়ার সময় এতীমখানার পরিচালকের বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল: কী যেন ছিল তার নাম? যামান? *ওকে ওই জিনিস থেকে আলাদা করা যাবে না।* বলেছিল সে। *যেখানেই যায় ওটা কোমরে গুঁজে তারপর বের হয় সে।*

"আর না।"

মাসকারা মিশে যাওয়া দুটো কালো ধারা নেমে এসেছে ওর গাল বেয়ে, রুজ লেপ্টে দিয়েছে। ওর নিচের ঠোঁট কাঁপছে। নাক থেকে জল ঝরছে। *"ব্যস,"* ককিয়ে উঠে বলল ও।

কাঁধের উপর স্থির হয়ে আছে ওর হাত। একবারে শেষ মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া গুলতির ইলাস্টিকের ব্যান্ডের শেষে মাথার কাপটা ধরে রেখেছে ওই হাত। কাপে একটা কিছু আছে। চকচকে হলুদ কিছু। চোখ পিটপিট করে রক্ত সরালাম আমি। দেখলাম ওটা টেবিলের পায়ার সেই ব্রাস বল। আসেফের মুখ বরাবর গুলতিটা তাক করে রেখেছে সোহারাব।

"আর না, আগা, প্লিজ," বলল ও, ওর কণ্ঠস্বর ফ্যাসফেসে, কাঁপছে। "ওকে ব্যথা দেওয়া থামাও।"

নিঃশব্দে নড়ে উঠল আসেফের মুখ। একটা কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে গেল সে। "কি করছ বলে তোমার ধারণা?" অবশেষে বলল সে।

"প্লিজ, থামো," বলল সোহারাব। নতুন করে চোখ জলে ভরে উঠছে ওর। মাসকারার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

"ওটা নামাও, হাযারা," হিসহিস করে বলল আসেফ। "ওটা নামিয়ে রাখ, নয়তো তোমাকে নিয়ে যা করব তার তুলনায় এটাকে মনে হবে স্রেফ কান মলে দেওয়া।"

ঝরঝর করে জল নেমে এল। মাথা নাড়ল সোহারাব। "প্লিজ, আগা," বলল ও, "থামো।"

"নামাও ওটা।"

"ওকে আর ব্যথা দিয়ো না।"

"ওটা নামাও।"

"প্লিজ।"

"ওটা নামাও!"

BanglaBook.org

"*ব্যস।*"

"ওটা নামাও বলছি!" আমার গলা ছেড়ে দিল আসেফ। ঝাঁপিয়ে পড়ল সোহরাবের উপর।

সোহরাব কাপ ছেড়ে দিতেই গুলতিটা *থিউইইইইত!* শব্দ করে উঠল। আর্তনাদ করে উঠল আসেফ। এক মুহূর্ত আগেও যেখানে ওর বাম চোখটা ছিল সে জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে ধরল সে। আঙুলের ফাঁক গলে দরদর করে রক্ত নেমে এল। রক্তের সাথে অন্যকিছুও। শাদা জেলের মতো। একে বলে *ভিট্রিয়াস ফ্লুইড*, পরিষ্কার চিন্তা করতে পারলাম আমি। *কোথাও এটা পড়েছি। ভিট্রিয়াস ফ্লুইড।*

কার্পেটে গাড়াগড়ি খাচ্ছে আসেফ। একপাশে কাত হল সে। এখনও রক্তাক্ত কোটরের উপর চেপে ধরে রেখেছে হাতটা।

"চলো যাই!" বলল সোহরাব। আমার হাত ধরল ও। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল আমাকে। শরীরের প্রতি ইঞ্চি জায়গা ব্যথায় বিলাপ করছে আমার। এখনও চিৎকার করে চলেছে আসেফ।

"যাও! বের হয়ে যাও!" চিৎকার করে উঠল সে।

টলমল করতে করতে দরজা খুললাম আমি। আমাকে দেখে পাহারাদারদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আমার চেহারা কেমন হয়েছে বোঝার প্রয়াস পেলাম। প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসের সাথে সাথে পেটে যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। পশতুতে কি যেন বলল একজন প্রহরী, তারপর ঝড়ের বেগে আমাকে পেছনে ফেলে চলা এখনও আর্তনাদ করে আসেফের রুমের দিকে ছুটে গেল। **"বের হও!"** চলেছে সে।

"*বায়া,*" বলল সোহরাব। "চলো!"

হোঁচট খেতে খেতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। সোহরাবের ছোট হাত ধরে রেখেছি। কাঁধের উপর দিয়ে শেষবারের মতো একবার তাকালাম। আসেফের চারপাশে জড়ো হয়েছে পাহারাদাররা। ওর মুখে একটা কিছু করছে। তারপর বুঝতে পারলাম: ব্রাস বলটা এখনও তার চোখের কোটরে আটকে রয়েছে।

সারা দুনিয়া দোল খাচ্ছে, এপাশ ওপাশ দুলছে। সিঁড়ি বেয়ে টলমল পায়ে নামতে লাগলাম আমি। সোহরাবের উপর ভর দিয়ে আছি। উপর থেকে আসেফের চিৎকার অব্যাহত রয়েছে। আহত পশুর আর্তনাদ। বাইরে রোদের আলোয় বের হয়ে এলাম আমরা। সোহরাবের কাঁধে হাত দিয়ে রেখেছি। ফরিদকে আমাদের দিকে ছুটে আসতে দেখলাম।

BanglaBook.org

"বিসমিল্লাহ! বিসমিল্লাহ!" আমাদের দেখে চোখজোড়া যেন বের হয়ে আসতে চাইছে তার। কাঁধের উপর আমার হাত তুলে দিয়ে কোলে তুলে নিল সে আমাকে। চলন্ত ট্রাকের কাছে নিয়ে এল আমাকে। বোধ হয় আর্তনাদ করে উঠেছিলাম আমি। পেভমেন্টের উপর ওর স্যান্ডালের টক্কর খাওয়া লক্ষ করেছি। ওর কালো কড়া পড়া গোড়ালিতে চাপড় মারছিল ওগুলো। শ্বাস টানতেও ব্যথা লাগছিল। তারপর ল্যান্ড ক্রুজারের পেছনের সিটে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছি বলে আবিষ্কার কললাম। রূপালি গদি, ছেঁড়া। খোলা দরজার ডিং-ডিং-ডিং সঙ্কেত কানে আসছে। ট্রাকের চারপাশে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। দ্রুত কথা বলছে ফরিদ আর সোহারাব। দড়াম করে ট্রাকের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। এঞ্জিনের সরব হয়ে ওঠা। লাফিয়ে সামনে ছুটল ট্রাকটা। কপালের উপর একটা হাতের ছোঁয়া টের পেলাম। রাস্তায় গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কেউ চিৎকার করছে। জানালা দিয়ে ঝলকের মতো গাছপালা সরে যেতে দেখলাম। ফুঁপিয়ে কাঁদছে সোহারাব। ফরিদ বলেই চলেছে, *"বিসমিল্লাহ! বিসমিল্লাহ!"*

এমন একটা সময়ে জ্ঞান হারালাম আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তেইশ

ধোঁয়াশার ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে চেহারাগুলো, লেপ্টে থাকছে, তারপর আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। নিচের দিকে তাকিয়ে আমাকে প্রশ্ন করছে ওরা। সবাই প্রশ্ন করছে। আমি কি আমার পরিচয় জানি? আমার কোথাও ব্যথা লাগছে কিনা? আমি আমার পরিচয় জানি। সারা শরীর ব্যথা করছে আমার। কথাটা ওদের বলতে চাইলাম, কিন্তু মুখ খুলতে গেলেও ব্যথা লাগছে। আমার এটা জানা আছে, কারণ কিছুদিন আগে, সেটা এক বছর বা দুই বছর বা দশ বছর হতে পারে, গালে রুজ আর চোখে কালসিটে পড়ে যাওয়া একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম আমি। সেই ছেলেটা, হ্যাঁ, এখন ওকে দেখতে পাচ্ছি। ছেলেটা আর আমি কোনও গাড়িতে ছিলাম। তবে আমার মনে হয় না সুরাইয়া গাড়ি চালাচ্ছিল, কেননা সুরাইয়া কখনওই এত জোরে ড্রাইভ করে না। এই ছেলেটাকে একটা কিছু বলার চেষ্টা করেছিলাম আমি। কথাটা বলা বেশ জরুরি বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। তবে কী বলতে চেয়েছিলাম সেটা বেমালুম ভুলে গেছি। কিংবা কেন কথাটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাও। তবে কথা বলতে চাওয়ার কথাটা মনে আছে। এবার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। নাও হতে পারে। এখন মনে নেই, কোনও কারণে ছেলেটাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি।

অনেকগুলো চেহারা। সবার মাথায় সবুজ টুপি। আমার চোখের সামনে আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত কথা বলে চলেছে ওরা। এমন সব শব্দ ব্যবহার করছে যেগুলো আমার অচেনা। অন্যান্য কণ্ঠস্বর, অন্যান্য আওয়াজ, হর্ন আর সাইরেন কানে আসছে আমার। তারপরে আরও অনেক চেহারা। নিচের

দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের কাউকেই চিনি না আমি। কেবল চুলে জেল লাগানো কার্ক গেবলের মতো গোঁফঅলা লোকটা ছাড়া। তার মাথার টুপিতে আফ্রিকার ম্যাপের মতো একটা দাগ। মিস্টার সোপ অপেরা স্টার। এটা বেশ হাস্যকর। হেসে উঠেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু হাসতে গেলেও ব্যথা লাগছে।

জ্ঞান হারালাম আমি।

ও নিজের নাম বলল আয়েশা। "পয়গম্বরের বউয়ের মতো।" ওর পাক ধরা চুল মাঝখানে সিঁথি করা। মাথার পেছনে ঝুঁটি বেঁধে রেখেছে; ওর নাকটা সূর্যের আদলের একটা গুটলিতে ভাগ হয়ে আছে। চোখে বাইফোকাল থাকায় চোখজোড়া অনেক বড় দেখাচ্ছে ওর। সবুজ জামাও পরেছে ও। হাতজোড়া কোমল। আমাকে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে মৃদু হাসল ও। ইংরেজিতে বলল কি যেন। আমার বুকের একপাশে কিসের যেন খোঁচা লাগল।

বেহুঁশ হয়ে গেলাম আমি।

আমার বিছানার পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একে আমি চিনি। শ্যামলা, ছিপছিপে গড়ন তার, গালে লম্বা দাড়ি। একটা টুপি রয়েছে তার মাথায়। কি নাম এসব টুপির? *পাকোল?* কোনও এক বিখ্যাত লোকের কায়দায় একপাশে কাত করে পরেছে সে, লোকটার নাম এখন মনে করতে পারছি না। এই লোকটাকে আমি চিনি। কয়েক বছর আগে আমাকে গাড়িতে কোথাও নিয়ে গিয়েছিল সে। একে আমি চিনি। আমার চেহারায় কোনও সমস্যা হয়েছে। বুদবুদের মতো একটা শব্দ কানে এল আমার।

আমি জ্ঞান হারালাম।

ডান হাতটা জ্বালা করছে। বাইফোকাল চশমা আর নাকের উপর সূর্যের মতো গুটলিঅলা মেয়েটা আমার হাতের উপর ঝুঁকে রয়েছে। একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের টিউব লাগাচ্ছে। সে বলল এটা, "পাটাসিয়াম। মৌমাছির হুল ফোটানোর মতো, তাই না?" বলল সে। আসলেও তাই। কী নাম মেয়েটার? পয়গম্বরের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে। একেও কয়েক বছর আগে থেকে চিনি। মাথার চুল পনি টেইল করে বাঁধত সে। কিন্তু এখন খোঁপা বেঁধে রেখেছে। আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলার সময় এভাবে চুল বেঁধে রেখেছিল সুরাইয়া। কবেকার কথা সেটা? গেল সপ্তাহর?

BanglaBook.org

আয়েশা! হ্যাঁ।

আমার মুখে কোনও সমস্যা আছে। বুকে আবার খোঁচা মারছে সেই জিনিসটা।

চেতনা হারালাম আমি।

বালুচিস্তানের সুলায়মান পাহাড়ে রয়েছি আমরা। কালো ভালুকের সঙ্গে কুস্তি লড়ছে বাবা। আমার ছেলেবেলার বাবা। *তুফান আগা,* পশতুন বীরের বিশাল এক নমুনা। কম্বলের নিচে মিইয়ে যাওয়া ওই মানুষটা নয়। ওর গাল চুপসে গেছে। চোখজোড়া ঢুকে পড়েছে কোটরের গর্তে। এক চিলতে ঘাসের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে ওরা। মানুষ আর জানোয়ার। হাওয়ায় উড়ছে বাবার ঝাঁকড়া বাদামী চুল। গর্জন ছাড়ছে ভালুকটা। কিংবা বাবাও হতে পারে। লালা আর রক্ত উড়ছে বাতাসে। থাবা আর হাত চলছে। বিকট শব্দ করে জমিনে লুটিয়ে পড়ল ওরা। এখন ভালুকের বুকের উপর বসে আছে বাবা। ওটার গলায় হাত গলিয়ে দিয়েছে। চোখ তুলে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেল সে। আমিই সে। ভালুকের সঙ্গে লড়াই করছি আমি।

জেগে উঠলাম আমি। লিকলিকে শ্যামলা লোকটা আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এখন মনে পড়েছে, লোকটার নাম ফরিদ। ওর সঙ্গে গাড়ির সেই ছেলেটাও রয়েছে। ওর চেহারা দেখে ঘণ্টাধ্বনির কথা মনে পড়ে গেল। পিপাসা লেগেছে আমার।

জ্ঞান হারালাম আমি।

বারবার জ্ঞান হারিয়ে চললাম।

ক্লার্ক গেবলের মতো গোঁফঅলার নাম ডাক্তার ফারুকি। মোটেই সোপ অপেরা স্টার নয়, বরং মাথা আর গলার সার্জন। যদিও আমি বারবার ওকে আরমান্দ বলে ধরে নিচ্ছিলাম। একটা ট্রপিকাল দ্বীপের ধোঁয়া ওঠা সেপে সেটে ছিল সে।

আমি কোথায়? জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু আমার মুখ খুলল না। চোখ কোঁচকালাম, গুঙিয়ে উঠলাম। হাসল আরমান্দ। চোখ ধাঁধানো শাদা ওর দাঁত।

"এখনই নয়, আমির," বলল সে। "তবে অচিরেই পারবে। তারগুলো বের করে ফেলার পর।" ভারি জড়ানো উর্দু উচ্চারণে ইংরেজিতে কথা বলছে সে।

তার?

বুকের উপর আড়াআড়ি করে হাত রেখে দাঁড়াল আরমান্দ। হাতগুলো

BanglaBook.org

লোমশ, বিয়ের সোনার ঘড়ি পরে আছে। "নিশ্চয়ই ভাবছ এখন কোথায় আছো তুমি, তোমার কী হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। অপারেশনের পরের এই সময়টুকু সব সময়ই একটু হতবুদ্ধিকর। আমি যতটুকু জানি বলছি তোমাকে।"

ওকে তারের কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল আমার। অপারেশনের পরের সময় মানে? আয়েশা কোথায়? আমার দিকে চেয়ে সে হাসুক, মনে মনে এটাই চাইছিলাম। ওর কোমল হাতের ছোঁয়া পেতে ইচ্ছে করছিল।

ভুরু কোঁচকাল আরমান্দ। একটা ভুরু বেশ ভারিক্কি চালে নাচাল। "পেশওয়ারের একটা হাসপাতালে আছ তুমি। দুদিন হল এখানে এসেছ। বেশ ভালো রকম চোটই পেয়েছ তুমি, আমির। এটা আমাকে বলতেই হবে। বলতে হয় বেঁচে যে আছো এটা রীতিমতো ভাগ্যের ব্যাপার, মাই ফ্রেন্ড।" এরপরের এই কথা বলার সময় পেন্ডুলামের মতো এপাশওপাশ দোলাল সে তর্জনীটা। "বোধহয় তোমার স্প্লিন ফেটে গেছে। তোমার সৌভাগ্য, ফেটেছে একটু দেরিতে, কারণ তোমার পেটের গহ্বরে রক্তপাতের লক্ষণ ছিল। জেনারেল সার্জারি ইউনিটের আমার কলিগরা ইমার্জেন্সি স্পেলেক্টোমি করতে বাধ্য হয়েছে। আরও আগে ফাটলে রক্তক্ষরণের কারণেই মারা পড়তে তুমি।" আমার আইভি লাগানো হাতে মৃদু চাপ দিল সে। হাসল। "তোমার পাঁচটা পাঁজরের হাড়ও ভেঙে গেছে। ওগুলোর একটা তোমার নিউমোথোরাক্সের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

চোখ কোঁচলালাম। মুখ খোলার চেষ্টা করলাম। তারের কথা মনে পড়ল।

"এর মানে লাঙ ফুটো হয়ে গেছে," বুঝিয়ে বলল আরমান্দ। আমার বামদিকের একটা প্লাস্টিকের টিউবে টান দিল সে। বুকে তীব্র একটা ব্যথা লাগল। "এই চেস্ট টিউবটা দিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা।" দেখলাম, আমার বুকের ব্যান্ডেজের ভেতর থেকে বের হয়ে টিউবটা আধা ভর্তি একটা কন্টেইনারে দিকে চলে গেছে। ওটা থেকেই বুদবুদের আওয়াজটা আসছিল।

"অনেক কটা লেকরেশনেরও—মানে 'ক্ষত'-শিকার হয়েছ তুমি। ।"

ওকে বলতে চাইলাম কথাগুলোর মানে আমার জানা আছে। আমি একজন লেখক। মুখ খোলার চেষ্টা করলাম। আবার ভুলে গেলাম তারের কথা।

"সবচেয়ে জঘন্য ক্ষতটা হয়েছে তোমার ওপরের ঠোঁটে," আরমান্দ বলল। "তোমার ওপরের ঠোঁটটা একেবারে মাঝ বরাবর দুভাগ হয়ে গেছে। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। প্লাস্টিক কাজের লোকেরা ওটাকে ভালো করে সেলাই করে দিয়েছে। ওদের ধারণা বেশ ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে তোমার কাছ থেকে। যদিও একটা কাটা দাগ থেকে যাবে। এটা ঠেকানোর জো নেই।

BanglaBook.org

"বাম পাশে একটা অর্বিটাল ফ্র্যাকচারও হয়েছে। এটা হচ্ছে চোখের সকেট বোন। সেটাও আমাদের মেরামত করতে হয়েছে। ছয় সপ্তাহর মধ্যে তোমার চোয়ালের তারগুলো খুলে ফেলা হবে।" বলল আরমান্দ। "তার আগ পর্যন্ত লিকুইড আর শেকসই খেতে হবে। খানিকটা ওজন হারাবে তুমি। কিছুদিন তোমার চেহারা প্রথম *গডফাদারের* আল পাচিনোর মতো দেখাবে।" জোরে হেসে উঠল সে। "তবে আজ একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। সেটা কী জানো?"

মাথা নাড়লাম আমি।

"আজ তোমার কাজ হলো গ্যাস বের করা। সেটা করলেই তোমাকে আমরা লিকুইড খাওয়ানো শুরু করতে পারব। হাওয়া নেই, তো খাওয়াও নেই।" বলে ফের হেসে উঠল সে।

পরে আয়েশা আইভি টিউবিং বদলে দিয়ে আমার কথামতো খাটের মাথার দিকটা উঁচু করে দিলে আমার কী হয়েছে সেটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। স্প্লিন ফেটেছে। দাঁত ভেঙেছে। ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে। আই সকেট ভেঙে গেছে। কিন্তু জানালার চৌকাঠে একটা কবুতরকে রুটির টুকরো ঠোকড়াতে দেখে আরমান্দ/ডাক্তার ফারুকির বলা অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল: *ক্ষতটা তোমার ওপরের ঠোটটাকে দুভাগ করে দিয়েছে,* বলেছে সে, *ঠিক মাঝ বরাবর।* ঠিক মাঝ বরাবর। হেয়ারলিপের মতো।

পরের দিন ফরিদ আর সোহরাব দেখতে এল আমাকে। "আজ কি আমাদের চিনতে পারছ? মনে পড়েছে?" খানিকটা কৌতুকের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল ফরিদ। আমি মাথা দোলালাম।

"আল হামদুল্লিাহ!" বলল সে, চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "আর কোনও বাজে আলাপ নয়।"

"ধন্যবাদ, ফরিদ," তার দিয়ে আটকানো মুখে বললাম। ঠিকই বলেছিল আরমান্দ। আমাকে সত্যিই *গড ফাদারের* আল প্যাচিনোর মতো লাগছে। যখনই গিলে ফেলা দাঁতের ফাকে জিভ যাচ্ছে, অবাক লাগছে আমার। "মানে সব কিছুর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।"

একটা হাত নাড়ল সে, কিঞ্চিত লাল হয়ে উঠেছে চেহারা। "*ব্যস*, এটা ধন্যবাদ দেওয়ার মতো কোনও ব্যাপার না," বলল সে। সোহরাবের দিকে তাকাল। একটা নতুন জামা পরেছে সে। হালকা বাদামী *পিরহান-তাম্বান*, তার গায়ে যেন একটু বড়ই মনে হচ্ছে। মাথায় খুলির সাথে লেগে থাকা কালো টুপি।

banglabook.org

নিজের পায়ের দিকে চেয়ে আছে সে। খাটের উপর পড়ে থাকা আইভি লাইন নিয়ে খেলা করছে।

"আমাদের আসলে ঠিকমতো পরিচিত হয়ে ওঠা হয়নি," বললাম। হাত বাড়িয়ে দিলাম, "আমার নাম আমির।"

প্রথমে আমার হাত তারপর আমার দিকে তাকাল সে। "তুমি সেই আমির আগা, বাবা যার কথা বলেছিল?" জানতে চাইল সে।

"হ্যাঁ।" হাসানের চিঠির কথাগুলো মনে পড়ে গেল তোমার সম্পর্কে। *ফারজানা জান আর সোহরাবকে অনেক কিছু বলেছি। আমাদের একসঙ্গে বেড়ে ওঠা, খেলাধুলা করা। রাস্তায় দৌড়ানো। আমি আর তুমি মিলে যত রকম দুষ্টামি করেছি সেই সব গল্প!"* "তোমার কাছে আমার একটা ধন্যবাদ দেনা রয়ে গেছে, সোহরাব জান," বললাম আমি। "তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ।"

কিছু বলল না সে। হাত না ধরায় নিজের হাতটা নামিয়ে নিলাম। "তোমার নতুন কাপড় আমার পছন্দ হয়েছে," বিড়বিড় করে বললাম।

"আমার ছেলের এগুলো," বলল ফরিদ। "ওর গায়ে এখন আর লাগে না। সোহরাবের গায়ে বেশ ভালোই মানিয়ে গেছে বলতে হবে।" একটা জায়গার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত সোহরাব ওদের সঙ্গেই থাকতে পারে," বলল সে। আমাদের বাড়িতে বেশী রুম নেই। কিন্তু আমি কীই বা করতে পারি? ওকে তো রাস্তায় ফেলে রাখতে পারব না। তাছাড়া, আমার বাচ্চারা ওকে পছন্দ করে ফেলেছে। তাই না সোহরাব?" কিন্তু নিচের দিকেই তাকিয়ে রইল ছেলেটা। হাত দিয়ে টিউবটা নাড়াচাড়া করে চলল।

"আমি আসলে জানতে চাইছিলাম," খানিকটা ইতস্তত করে বলল ফরিদ, "ওই বাড়িতে আসলে কী হয়েছিল? তালিব আর তোমার মধ্যে কী ঘটেছে?"

"বলা যায় যার যার পাওনাই বুঝে নিয়েছি আমরা," বললাম আমি।

মাথা দোলাল ফরিদ, কোনও রকম জোর করল না। আমার মনে হল, আমরা আফগানিস্তানের উদ্দেশে পেশওয়ার ছাড়ার পরের এই সময় টুকুর মধ্যে আমাদের ভেতর এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। "আমিও একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম।"

"কী?"

জিজ্ঞেস করতে মন চাইল না। জবাবটা শুনতে ভয় হচ্ছিল। "রহিম খান," বললাম।

"ও চলে গেছে।"

বুকটা ধক করে উঠল আমার। "ও কি–"

BanglaBook.org

"না, মানে...স্রেফ চলে গেছে।" আমার হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরো আর একটা ছোট চাবি তুলে দিল সে। "আমি ওর খোঁজ করতে গেলে বাড়িঅলা এটা দিয়েছে আমাকে। বলেছে আমরা চলে আসার পর দিনই রহিম খান চলে গেছে।"

"কোথায় গেছে ও?"

কাঁধ ঝাঁকাল ফরিদ। "বাড়িঅলার জানা নেই। বলেছে রহিম খান চিঠি আর চাবিটা তোমার জন্যে রেখে গেছে।" ঘড়ি দেখল ও। "আমি বরং এবার যাই। *বায়া*, সোহরাব।"

"ওকে কিছুক্ষণের জন্যে এখানে রেখে যাবে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। "পরে এসে নিয়ে যেয়ো?" সোহরাবের দিকে চোখ ফেরলাম। "খনিকক্ষণ আমার সঙ্গে এখানে থাকবে?"

কাঁধ ঝাঁকাল সে, কিছু বলল না।

"অবশ্যই," বলল ফরিদ। "সন্ধ্যার *নামাযের* আগে আগে এসে ওকে নিয়ে যাব আমি।"

আমার রুমে আরও তিনজন রোগি ছিল। দুজন বয়স্ক লোক, একজনের পায়ে কাস্ট লাগানো; আরেক জনের হাঁপানি রোগ, শোঁশোঁ করে শ্বাস ফেলছে; আর পনের বা ষোল বছরের একটা ছেলে, অ্যাপেন্ডিক্স সার্জারি হয়েছে তার। পায়ে কাস্টঅলা বুড়ো অপলক চোখে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। একবার আমার দিকে আরেকবার স্টুলের ওপর বাসা হাযারা ছেলেটার দিকে চলে যাচ্ছে তার চোখ। আমার রুমমেটদের পরিবারের সদস্যরা–উজ্জ্বল শালোয়ার-কামিয পরা বয়স্ক মহিলা, ছোটছোট ছেলেমেয়ে, মাথার খুলির সাথে লেপ্টে থাকা টুপি পরা লোকজন–হৈচৈ করে যাওয়া আসা করছে। সঙ্গে *পাকোরা, নান, সামোসা, বিরিয়ানি নিয়ে* এসেছে ওরা। অনেক সময় স্রেফ ঘরে ঢুকে পড়ছে লোকজন। ফরিদ আর সোহরাব ঢোকার আগ মুহূর্তে ঢুকে পড়া লম্বা দাড়িঅলা লোকটার মতো। একটা বাদামী চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছিল সে। তাকে উর্দুতে কি যেন জিজ্ঞেস করল আয়েশা। ওকে এতটুকু পাত্তা দিল না সে । রুমটা তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করল। মনে হল আমার দিকে প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশী সময়ই তাকিয়ে ছিল সে। নার্স আবার সঙ্গে কথা বলার পর স্রেফ উল্টো ঘুরে বের হয়ে গেছে সে।

"কেমন আছ?" সোহরাবকে জিজ্ঞেস করলাম। কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতের দিকে তাকিয়ে রইল ও।

BanglaBook.org

"তোমার খিদে লেগেছে? ওই মহিলা আমাকে এক বাটি *বিরিয়ানি* দিয়েছিল, কিন্তু আমি খেতে পারছি না," বললাম আমি। আর কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। "ওটা খাবে?"

মাথা নাড়ল সে।

"কথা বলতে চাও?"

আবার মাথা নাড়ল সে।

এভাবে কিছুক্ষণ বসে রইলাম আমরা। নীরব। আমি পিঠের নিচে দুটো বালিশ রেখে উঁচু হয়ে আছি, খাটের পাশে একটা তিনপায়া স্টুলে বসে আছে সোহরাব। এক সময়ে ঘুমে ঢলে পড়লাম আমি। যখন জেগে উঠলাম, দিনের আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। ছায়াগুলো দীর্ঘ হয়ে এসেছে। এখনও আমার পাশে বসে আছে সোহরাব। এখনও হাতের দিকেই চেয়ে আছে।

সে রাতে, ফরিদ সোহরাবকে নিয়ে যাবার পর রহিম খানের চিঠিটা খুললাম। যতক্ষণ সম্ভব দেরি করেছি আমি। চিঠিটা এরকম:

আমির জান,

ইনশাল্লাহ, এই চিঠিটা নিরাপদেই তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে। আমি প্রার্থনা করছি, তোমাকে বিপদের পথে ছেড়ে দিইনি। আর আফগানিস্তানও তোমার জন্যে খুব বেশী খারাপ ছিল না। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকেই নিয়মিত তোমার জন্যে দোয়া করে চলেছি আমি।

আমি যে সব জানি, এতগুলো বছর ঠিকই সন্দেহ করেছ তুমি। ঘটনার পরপরই সংক্ষেপে আমাকে সব বলেছিল হাসান। তোমার কাজটা ভুল ছিল, আমির জান। কিন্তু এটা ভুলে যেয়ো না যে ঘটনাটা ঘটার সময় তুমি একেবারে ছোট ছিলে। অসহায় ছোট ছেলে। তখন নিজের ওপর বেশী অত্যাচার করে ফেলেছ তুমি। এখনও করছ-পেশওয়ারে তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই সেটা বুঝতে পেরেছি। আশা করি তুমি এটা কাটিয়ে উঠতে পারবে। যে লোকের ভেতর কোনও দয়া নেই, বিবেক নেই, তার কোনও ভোগান্তি নেই। আমি আশা করি আফগানিস্তানে তোমার এই আগমনের ভেতর দিয়ে সেই ভোগান্তির অবসান ঘটবে।

আমির জান, এতগুলো বছর ধরে তোমাকে আমরা মিথ্যে বলে এসেছি বলে আমি লজ্জিত। পেশওয়ারে ক্ষেপে ওঠাটা তোমার জন্যে ঠিকই ছিল। জানার

অধিকার ছিল তোমার। ছিল হাসানেরও। জানি এতে করে কারও অপরাধের মাত্রা এতটুকু কমে যাচ্ছে না। তবে সেই সবদিনে আমরা যে কাবুলে বাস করেছি সেটা ছিল এক বিচিত্র জায়গা। যেখানে সত্যির চেয়ে ভিন্ন কিছুকে বেশী মূল্য দেওয়া হত।

আমির জান, তুমি বেড়ে ওঠার সময় তোমার বাবা তোমার উপর কতটা রূঢ় ছিল সেটা আমি জানি। তুমি ওর আদর পেতে ব্যকুল হয়ে কীভাবে কষ্ট পেয়েছ দেখেছি। তোমার জন্যে আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। কিন্তু তোমার বাবা দুদিকের টানাপোড়েনে বিক্ষত একজন মানুষ ছিল। আমির জানঃ তুমি আর হাসান। তোমাদের দুজনকেই সে ভালোবাসত, কিন্তু যেভাবে চাইত সেভাবে হাসানকে ভলোবাসতে পারত না। খোলামেলা, বাবার মতো। সেজন্যে তোমার উপর তার বদলা নিয়েছে সে-আমির, সামাজিকভাবে বৈধ অর্ধেক, যে কিনা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ আর তার সঙ্গে আসা সাজার অতীত পাপের প্রতিনিধিত্ব করছে। তোমার দিকে তাকালে নিজেকেই দেখতে পেত সে-আর নিজের অপরাধ। এখনও ক্ষেপে আছো তুমি, আমি জানি, এত তাড়াতাড়ি তোমার পক্ষে কথাটা মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। তবে হয়ত একদিন বুঝতে পারবে, তোমার বাবা যখন তোমার সঙ্গে রূঢ় হয়েছে, তখন আসলে নিজের উপরই রূঢ় হয়েছে সে। তোমার বাবা, তোমার মতোই বিক্ষত একটা সত্তা ছিল, আমির জান।

ওর চলে যাওয়ার খবরটা যখন পাই তখনকার শোকের গভীরতা আর কষ্ট তোমাকে বোঝাতে পারব না। আমার বন্ধু বলেই ওকে আমি ভালো বেসেছিলাম, আবার ভালো মানুষ ছিল বলেও। এমনকি একজন মাহান সত্তা ছিল সে। এ কথাটাই তোমাকে বোঝাতে চাই আমি। তোমার বাবার বিষাদের ভেতর দিয়ে ভালো, *সত্যিকারের* ভালো কিছু বের হয়ে এসেছিল। অনেক সময় তার সব কাজের কথা ভাবি আমি, রাস্তার ছেলেদের খাওয়াচ্ছে, এতীমখানা বানাচ্ছে, অভাবী বন্ধুদের টাকা ধার দিচ্ছে। এসবই নিজেকে নিস্কৃতি দেওয়ার একটা প্রয়াস। আমার বিশ্বাস এটাই ছিল সত্যিকারের নিস্কৃতি, আমির জান, যখন অপরাধবোধ ভালো কিছুর দিকে তাড়িত করে।

আমি জানি, শেষ বিচারে খোদা মাফ করে দেবেন। তোমার বাবাকে, আমাকে, আর তোমাকেও তিনি মাফ করে দেবেন। আশা করি তুমিও তা করতে পারবে। পারলে তোমার বাবাকে ক্ষমা করে দিয়ো। ইচ্ছে হলে আমাকেও মাফ করে দিয়ো। তবে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, নিজেকে মাফ করো।

তোমাকে কিছু টাকা দিয়ে যাচ্ছি আমি। সত্যি বলতে এই টাকা কটাই বাকি আছে আমার। এখানে আসার পর তোমার খরচের জন্যে নিশ্চয়ই কিছু টাকাপয়সা লাগবে। এই টাকা সে খরচের জন্যে যথেষ্ট হবে বলেই মনে করি। পেশওয়ারে একটা ব্যাংক আছে। ফরিদ চেনে জায়গাটা। টাকাটা সেইফ ডিপোজিট বক্সে আছে। তোমাকে চাবিটা দিয়েছি আমি।

আমার বেলায়, যাবার সময় হল। অল্প কটা দিন বাকি আছে আমার। এই সময়টুকু একা কাটাতে চাই। দয়া করে আমার খোঁজ করো না। এটাই তোমার কাছে আমার অনুরোধ।

তোমাকে খোদার হাতে হাওলা করে গেলাম আমি।

তোমার সর্ব সময়ের বন্ধু

রহিম।

চোখের উপর হাসপাতালের গাউনের হাতা টেনে আনলাম। চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দিলাম ম্যাট্রেসের নিচে। *আমির, সামাজিকভাবে বৈধ অর্ধেক, যে কিনা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদ আর তার সঙ্গে আসা সাজার অতীত পাপের প্রতিনিধিত্ব করছে।* সে কারণেই কি ইউএস-এ বাবা আর আমার এমন ভালো সম্পর্ক হয়েছিল, ভাবলাম আমি। খুচরো টাকায় আবর্জনা বিক্রি, আমাদের চাকরবাকরের মতো কাজ করা, স্যাঁতসেঁতে অ্যাপার্টমেন্ট–কুঁড়েঘরের আমেরিকান চেহারা; হয়ত আমেরিকায় আমাকে দেখার সময় হাসানেরই খানিকটা দেখতে পেত বাবা। *তোমার বাবা, তোমার মতোই বিক্ষত একটা সত্তা ছিল, আমির জান।* লিখেছে রহিম খান। কিন্তু বিষাদের ভেতর থেকে ভালো কিছু বের করে আনতে পেরেছিল বাবা। আর আমি কী করেছি, যাদের সঙ্গে বেঈমানি করেছি সেই লোকের উপরই আমার অপরাধ চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া? তারপর আবার সব কিছু ভুলে যেতে চেয়েছি। একজন ইনসোম্যানিয়াক হওয়া ছাড়া আর কী হয়েছি আমি?

ঠিক কাজ করার জন্যে কী করেছি আমি?

নার্স এসে–আয়েশা নয়, নাম জানি না এমন এক লাল চুল মেয়ে–যখন জিজ্ঞেস করল আমার মরফিন ইঞ্জেকশন লাগবে কিনা, আমি বললাম, হ্যাঁ।

পরের দিন বেশ সকালের দিকে বুকের টিউবটা খুলে নিল ওরা। আমাকে

ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়ার জন্যে স্টাফদের ইশারা করল আরমান্ড। আমার খাটের পাশে ড্রেসারের উপর খুলে রাখার সময় আয়েশার কাছে একটা আয়না চাইলাম আমি। বাইফোকাল চশমাটা কপালের উপর তুলে রেখে জানালার পর্দা সরিয়ে দিল সে। রোদের আলোয় ভেসে গেল গোটা কামরা। "মনে রেখ," বলল সে, "কয়েক দিনের ভেতরই আরও ভালো দেখাবে ওটা। গত বছর একটা মপেড অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিল আমার ভাগ্নে। অ্যাসফল্টের উপর ছেঁচড়ে গিয়ে কেন্নোর গায়ের মতো পিঙ্গল হয়ে গিয়েছিল ওর সুন্দর চেহারাটা। এখন আবার দলিতের মুভি স্টারের মতো সুন্দর হয়ে গেছে ও। ।"

ওর আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও আয়নার দিকে চেয়ে যেটাকে আমার চেহারা বলে শনাক্ত করার জোর চেষ্টা চলছে সেটা দেখে দম বন্ধ হয়ে এল আমার। দেখে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি আমার নাকের নিচে একটা এয়ার পাম্প লাগিয়ে সব বাতাস বের করে নিয়েছে। আমার চোখজোড়া ফোলাফোলা, নীল। সব চেয়ে খারাপ দশা হয়েছে আমার মুখের। পিঙ্গল আর নীলের একটা ছককাটা গোল্লা। খালি কত চিহ্ন আর সেলাইয়ের ছড়াছড়ি। হাসার চেষ্টা করলাম আমি। ব্যথার একটা তীব্র ঝলক খেলে গেল ঠোঁটের উপর। কিছুদিন একাজটা করতে পারব না আমি। আমার বাম গালের উপর, চিবুকের নিচে, চুলের নিচে কপালের উপর শুধু সেলাই আর সেলাই।

গায়ে কালশিটেওলা বুড়ো লোকটা উর্দুতে কি যেন বলল । তার উদ্দেশে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মাথা নাড়লাম। নিজের চেহারার দিকে ইঙ্গিত করে চাপড় দিল সেখানে। দাঁতহীন চওড়া একটা হাসি দিল। "খুব ভালো।" ইংরেজিতে বলল সে। "ইনশাল্লাহ।"

"ধন্যবাদ," ফিসফিস করে বললাম আমি।

আমি আয়নাটা নামিয়ে রাখার পরপরই এল ফরিদ আর সোহরাব। নীরবে আসন গ্রহণ করল সোহরাব। খাটের সাইড রেলিংয়ের উপর মাথা রাখল।

"কি জান, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বের হয়ে যেতে পারবে ততই ভালো," বলল ফরিদ।

"ডাক্তার ফারুকি বলেছে-"

"আমি হাসপাতালের কথা বোঝাইনি। পেশওয়ারের কথা বুঝিয়েছি।"

"কেন?"

"এখানে বেশী দিন নিরাপদে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না," বলল ফরিদ। কণ্ঠস্বর নিচু করল ও। "এখানে তালিবানদের বন্ধুরা আছে। ওরা তোমার খোঁজ করতে শুরু করবে।"

"আমার মনে হয় একটা মেয়ে খুঁজতে শুরু করে দিয়েছেও।" বিড়বিড় করে বললাম। দুটি করে ঘরে ঢুকে পড়া সেই দক্ষিণা লোকটার কথা ভাবলাম। আমার দিকে তাকিয়ে দিল সে।

সামনে ঝুঁকে এল ফরিদ। "তুমি ইচ্ছে করলেই তোমাকে ইসলামাবাদে নিয়ে যাব। পুরোপুরি নিরাপদ নয় অবশ্য। পাকিস্তানের কোথাও নিরাপত্তা নেই। তবে এখানকার চেয়ে ভালো। এতে অন্তত কিছুটা সময় পাবে তুমি।"

"ফরিদ জান, এখানে কোথাও নিরাপত্তা নেই। আমার মতো লোককে দেখা না হলেই তোমার ভালো। তোমার একটা পরিবার আছে দেখাশোনার জন্যে।"

হাত নেড়ে একটা ভঙ্গি করল ফরিদ। "আমার ছেলেরা ছোট হলেও অনেক বুদ্ধি রাখে। ওরা জানে কীভাবে ওদের মা আর বোনদের দেখাশোনা করতে হবে।" হাসল ও। "অবশ্য, আমি তো বলছি না যে কাজটা বিনে পয়সায় করছি আমি।"

"তেমন কিছু করতে চাইলে আমি রাজি হতাম না," বললাম আমি। হাসতে পারব না, সে কথা ভুলে গিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম। চিবুক বেয়ে দুধের একটা ক্ষীণ ধারা নেমে এল। "তোমার কাছে আরেকটা উপকার চাইতে পারি?"

"তোমার জন্যে হাজার বার," ফরিদ বলল।

সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতে শুরু করে দিলাম আমি। মুখ দিয়ে বাতাস বের করতে লাগলাম। গাল বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। ঠোঁটের কাটা জায়গায় জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

"কী ব্যাপার?" সতর্ক হয়ে জানতে চাইল ফরিদ।

এক হাতে মুখ ঢেকে অন্যটা হাত উঁচু করলাম আমি। জানি, রুমের সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ক্লান্ত, ভারী মনে হল নিজেকে। "আমি দুঃখিত।" সোহরাব তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর ভুরুতে ভাঁজ। আবার যখন কথা বলতে পারলাম, ফরিদকে বললাম কী লাগবে আমার। "রাহিম খান বলেছে, ওরা এখানে পেশোয়ারে থাকে।"

"এক কাজ করতে পারো, ওদের নাম লিখে দিতে পারো তুমি," বলল ফরিদ। চিন্তিত চোখে দেখছে সোহরাবকে, যেন বোঝার চেষ্টা করছে এর পর কোন কিশোরটা আবার কাঁদবে। একটা পেপার টিস্যুর উপর ওদের নাম লিখে দিলাম আমি। "জন আর বেটি কল্ডওয়েল।"

ভাঁজ করা কাগজটা পকেটে রাখল ফরিদ। "যত তাড়াতাড়ি পারি ওদের খোঁজ করব আমি," বলল ও। সোহরাবের দিকে ফিরল সে। "তোমাকে বলছি, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে তুলে নেব আমি। আগাকে বেশি জ্বালিয়ো না।"

কিন্তু জানালার দিকে চলে গেছে সোহরাব। টেবিলের উপর আঙুলগুলো

লাগবে সেটা?" আস্তে করে ওর হাতের উপর হাত রাখলাম। কিন্তু মিইয়ে গেল ও। হাতের কার্ড ফেলে স্টুলসহই সরে গেল। আবার জানালার কাছে ফিরে গেল ও। পেশওয়ারের অস্তাচলগামী সূর্যের আলোয় আকাশ লাল আর পিঙ্গল রঙে নেয়ে উঠেছে। নিচে রাস্তা থেকে লাগাতার হর্ন আর গাধার ডাক ভেসে আসছে। পুলিসের হুইসলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। লাল আলোয় দাঁড়িয়ে রইল সোহরাব। কাঁচের উপর চেপে রেখেছে কপাল, বগলতলায় ঠেসে দিয়েছে হাতজোড়া।

সেরাতে এক পুরুষ সহকারীকে দিয়ে আমাকে প্রথমবারের মতো হাঁটাল আয়েশা। একহাতে চাকা লাগানো আইভি স্ট্যান্ড আর অন্যহাতে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাঁধ আঁকড়ে ধরে একবার সারা রুমে ঘুরে এলাম। বিছানায় আবার ফিরে আসতে ঝাড়া দশ মিনিট লেগে গেল। ততক্ষণে আমার পেটের কাটাটা দপদপ করতে শুরু করে দিয়েছে, ঘেমে নেয়ে উঠেছি আমি। বিছানায় লুটিয়ে পড়ে হাপরের মতো হাঁপাতে লাগলাম। কানে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। স্ত্রীকে কতটা মিস করছি ভাবলাম।

আবার সেই নীরবতার ভেতরেই পরের দিন সারাটা সময় পানজপার খেলে কাটালাম সোহরাব আর আমি। তারপরের দিনও। কথা বলিনি বললেই চলে। স্রেফ খেলে গেছি। আমি বিছানায় ঠেস দিয়ে আছি, তিনপায়া স্টুলের উপর বসে ও। কেবল আমি ঘরের ভেতর হাঁটলে বা হলের ওপাশে বাথরুমে গেলেই আমাদের রুটিনে ছেদ পড়ছে। সেরাতে শেষের দিকে আমার হাসপাতালের রুমের দরজায় আসেফকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। চোখের কোটরে তামার বল। "তুমি আর আমি একই," বলছিল সে, "ওর সঙ্গে বেড়ে উঠলেও আসলে তুমি আমার যময।"

পরদিন বেশ সকাল সকাল আরমান্দকে বললাম আমি চলে যাচ্ছি।

"এখনও ডিসচার্জেরর সময় হয়নি," প্রতিবাদ করল আরমান্দ। সেদিন সার্জিকাল স্ক্রাবস ছিল না ওর পরনে, তার বদলে বাটন-ডাউন নেভী-ব্লু স্যুট আর হলুদ টাই পরেছিল সে। চুলে আবার জেল ফিরে এসেছে। "এখনও তোমাকে ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিবায়োটিকস দেওয়া হচ্ছে। আর-"

"আমাকে যেতেই হবে," বললাম। "আমার জন্যে যা কিছু করেছ সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমাদের সবাইকেই ধন্যবাদ। সত্যি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।"

"কোথায় যাবে?" জিজ্ঞেস করল আরমান্দ।

BanglaBook.org

আমার দিকে তাকালেই তাকে আসেফের পাঠানো তালিবান খুনী বলে সন্দেহ হচ্ছিল আমার। দুটো জিনিস আমার ভয় বাড়িয়ে তুলল: পেশওয়ারে দাড়িঅলা লোকের সংখ্যা অঢেল; সবাই চেয়ে থাকে।

"ওকে নিয়ে কী করবে?" জিজ্ঞেস করল ফরিদ। হাসপাতালের অ্যাকাউন্টিং অফিস থেকে আমাকে আবার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে ও। ল্যান্ডক্রুজারের পেছনের সিটে বসে আছে সোহরাব, কাঁচ নামানো জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে আছে। হাতের উপর চিবুক রাখা।

"পেশওয়ারেই থাকতে পারবে ও," হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

"উঁহু, আমির আগা, পারবে না," বলল ফরিদ। আমার কথায় প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে ও। "আমি দুঃখিত, পারলে ভালো হত, কিন্তু–"

"না, ঠিক আছে, ফরিদ," বললাম আমি। চেষ্টাকৃত হাসি দিলাম। "অনেকগুলো মুখ পুষতে হয় তোমাকে।" ট্রাকের পাশেই পেছনের পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা কুকুর, লেজ নাড়ছে। কুকুরটার মাথায় চাপড় দিচ্ছে সোহরাব। "আপাতত মনে হয় ইসলামাবাদেই যেতে হচ্ছে ওকে," বললাম আমি।

ইসলামাবাদে যাবার পথে পুরো চারঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটালাম আমি। অনেকবার স্বপ্ন দেখলাম। বেশীর ভাগই নানা ইমেজের জগাখিচুরি, রোলোডেক্সের ভেতর ঝলক মেরে চলে যাওয়া কার্ডের মতো স্মৃতির টুকরোটাকরা। আমার তেরতম জন্মদিনের অনুষ্ঠানের জন্যে সিরকায় মাংস ভেজাচ্ছে বাবা। আমি আর সুরাইয়া প্রথমবারের মতো মিলিত হচ্ছি। পুবে সূর্য উঠছে। আমাদের কানে তখনও বিয়ের গানের সুর গুঞ্জন তুলছে। ওর মেহেদী মাখানো হাত আমার হাত ধরে রেখেছে। বাবা যেবার আমাকে আর হাসানকে জালালাবাদের এক স্ট্রবেরি খামারে নিয়ে গিয়েছিল– মালিক আমাদের বলেছিল অন্তত চার কিলো ফল কিনলে আমাদের ইচ্ছে মতো খেতে পারব—শেষে আমাদের দুজনেরই পেটের অসুখ হয়ে গিয়েছিল। হাসানের প্যান্টের পেছন থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বরফের উপর ঝরে পড়া রক্ত বিন্দুগুলো কত গাঢ়, প্রায় কালো দেখাচ্ছিল। *রক্ত খুবই শক্তিশালী একটা জিনিস*, বাচ্চে। সুরাইয়ার হাঁটুতে চাপড় দিয়ে বলছিল জামিলা খালা, *খোদাই ভালো জানেন, হয়ত এমন হওয়ার কথা ছিল না।* বাবার বাড়ির ছাদে ঘুমিয়ে আছি। বাবা বলছে কেবল চুরির পাপই আসল পাপ। *যখন মিথ্যে বললে, একজনের সত্যি জানার অধিকার চুরি করলে।* ফোনে আমাকে রহিম খান বলছে আবার ভালো হয়ে ওঠার একটা উপায় আছে। *আবার ভালো হয়ে ওঠার উপায়...*

BanglaBoi.org

ড্রেসারের উপরই টেলিভিশন সেট রাখা ।

"দেখ," বলে উঠল সোহরাব। ওটা হাতেই চালু করলাম আমি–রিমোট কন্ট্রোল নেই–ডায়াল ঘোরালাম। বাচ্চাদের একটা উর্দূ চ্যানেল পেলাম। দুটো মোটাসোটা হাতি উর্দূতে গান গাইছে। একটা খাটে উঠে বসে বুকের কাছে হাঁটু ভাঁজ করে বসল সোহরাব। ও দেখার সময় টিভি পর্দার ছবিগুলো ওর সবুজ চোখের পাতায় ঝিলিক মারতে লাগল। মুখটা পাথরের মতো করে রেখেছে ও। সামনে পেছনে দোল খাচ্ছে। আমরা দুজন বড় হলে ওর পরিবারকে একটা টিভি কিনে দেওয়ার কথা বলেছিলাম হাসানকে, সেকথা মনে পড়ে গেল আমার।

"আমি যাচ্ছি, আগা সাহিব," বলল ফরিদ।

"রাতটা থেকে যাও," বললাম আমি। "অনেক দূরের পথ। কাল সকালে যেয়ো।"

"*তাশাকোর,*" বলল ও। "কিন্তু আমি আজ রাতেই ফিরতে চাই। বাচ্চাদের কথা খুব মনে পড়ছে।" রুম থেকে বের হয়ে যাবার সময় দোরগোড়ায় একটু থামল সে। "গুডবাই, সোহরাব জান," বলল ও। জবাবের অপেক্ষা করল ও। কিন্তু সোহরাব কোনও আমলই দিল না। স্রেফ সামনে পেছনে দোল খেয়ে চলল। পর্দার উপর ঝিলিক মেরে চলা ইমেজগুলোর রূপালী আভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

বাইরে ওর হাতে একটা খাম তুলে দিলাম। ওটা সে খুলতেই মুখ হাঁ হয়ে গেল ওর।

"তোমাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব, জানি না," বললাম আমি। "আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি।"

"কত আছে এখানে?" খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে জানতে চাইল ফরিদ।

"দুই হাজারের একটু বেশী।"

"দুই হাজার–" বলতে গেল সে। পরে কার্ব থেকে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে যাবার পর দুবার হর্ন বাজাল ও, হাত নাড়ল। আমিও পাল্টা হাত নাড়লাম। ওর সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি আমার। হোটেল রুমে ফিরে এসে দেখি বড়সড় একটা সি-এর মতো বিছানায় শুয়ে আছে সোহরাব। চোখ বন্ধ থাকলেও ঘুমাচ্ছে কিনা বুঝতে পারলাম না। টেলিভিশন বন্ধ করে দিয়েছে ও। ব্যথায় মুখ বাঁকা করে নিজের বিছানায় বসলাম আমি। চোখের উপর থেকে ঘাম মুছলাম। মনে মনে ভাবলাম না জানি আর কতদিন এভাবে উঠতে-বসতে-শুতে গিয়ে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আবার কবে শক্ত খাবার খেতে পারব। বিছানায় শুয়ে থাকা এই আহত ছেলেটোকে নিয়েই বা কী করব, যদিও আমার মনের একটা

BanglaBook.org

"সে দৌড়াদৌড়ি করছে বলে মনে হয় না," বললাম। "আমরা এখানকার লোক নই। ছেলেটা বোধ হয় হারিয়ে গেছে।"

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল সে। "তাহলে ওর ওপর নজর রাখা উচিত ছিল তোমার, মিস্টার।"

"জানি," বললাম। "কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে উঠে দেখি ও নেই।"

"জানোই তো ছেলেদের দিকে খেয়াল রাখতে হয়।"

"হ্যাঁ," বললাম, আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠছে। কেমন করে আমার উদ্বেগের ব্যাপারে এতটা নিরাসক্ত থাকতে পারছে সে? কাগজটা অন্য হাতে চালান করল সে। আবার হাওয়া করত শুরু করল। "এখন ওরা বাইসাইকল চাইছে।"

"কারা?"

"আমার ছেলেরা," বলল লোকটা। "ওরা বলে, 'বাবা, বাবা, আমাদের বাইসাইকেল কিনে দাও। আমরা আর তোমাকে জ্বালাব না। প্লিজ, বাবা!'" ছোট একটা নাকি হাসি দিল সে। "বাইসাইকল। ওদের মা আমাকে খুন করে ফেলবে, কসম কেটে বলছি তোমাকে।"

সোহরাব একটা নালায় পড়ে আছে, কল্পনা করলাম, কিংবা কোনও গাড়ির ট্রাঙ্কের ভেতর। হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। ওর রক্তে হাত রাঙাতে চাইনি আমি। ওর রক্তও নয়। "প্লিজ..." বললাম আমি। চোখ কোচঁকালাম। লোকটার হাতাকাটা নীল সুতি শার্টের ল্যাপলে লেখা নামটা পড়লাম। "মিস্টার ফায়ায, তুমি ওকে দেখেছ?"

"ছেলেটাকে?"

ঠোঁট কামড়ালাম। "হ্যাঁ, ছেলেটা! আমার সঙ্গের ছেলেটাকে। দোহাই লাগে, ওকে তুমি দেখেছ?"

বাতাস করা থেমে গেল। চোখ সরু হয়ে এল তার। "আমার সঙ্গে চালিয়াতি করতে এস না, ফ্রেন্ড। আমি ওকে হারাইনি।"

তার কথায় যুক্তি থাকলেও আমার মুখ লাল হয়ে ওঠা ঠেকান গেল না। "তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ভুল হয়েছে। দোষটা আমার। এখন বলো, ওকে দেখেছ?"

"দুঃখিত," সংক্ষেপে বলল সে। আবার চোখে চশমা লাগাল। ঝট করে পত্রিকার পাতা খুলল। "আমি এমন কোনও ছেলেকে দেখিনি।"

এক মুহূর্ত কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আর্তনাদ ঠেকানোর চেষ্টা করছি।

BanglaBook.org

কিন্তু মসজিদের আনুমানিক শ'খানেক গজ দূরে ওকে পেয়ে গেলাম আমরা। আধা ভর্তি পার্কিং লটে এক চিলতে ঘাসের উপর বসে আছে। ঘাসের দ্বীপের কাছে নিয়ে গাড়ি থামাল ফায়ায। বের হতে দিল আমায়। "আমাকে ফিরে যেতে হচ্ছে," বলল সে।

"ঠিকাছে। আমরা পায়ে হেঁটেই ফিরে যেতে পারব," বললাম। "ধন্যবাদ, মিস্টার ফায়ায। সত্যিই।"

আমি বাইরে আসার সময় সামনে ঝুঁকে এল সে। "তোমাকে একটা কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

গোধূলির অন্ধকারে লোকটার চেহারা চশমার কাচে ম্রিয়মান আলো ঠিকরে যাওয়া একজোড়া কাঁচ মাত্র। "তোমাদের আফগানদের ব্যাপার হল...মানে, তোমরা আসলে একটু বেপরোয়া।"

আমি ক্লান্ত এবং যন্ত্রণা ক্লিষ্ট ছিলাম। আমার চোয়াল দপদপ করছে। বুক আর পেটের হতচ্ছাড়া ক্ষতগুলো চামড়ার নিচে যেন কাঁটাতারের মতো খোঁচা দিচ্ছে। কিন্তু তারপরেও হাসতে শুরু করলাম।

"কী...আমি কী এমন..." বলতে যাচ্ছিল ফায়ায। কিন্তু ততক্ষণে জোরে হাসতে শুরু করেছি আমি। আমার তার লাগানো মুখে একেবারে গলা খোলা অট্টহাসি যাকে বলে।

"পাগল লোকজন," বলল সে। সে চলে যাবার সময় টায়ারে তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল। ম্লান আলোয় তার টেইল লাইটগুলো মিটমিট করছিল।

"আমাকে বেশ ভালো ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি," বললাম আমি। ওর পাশে বসলাম। উবু হওয়ার সময় ব্যথায় কুকড়ে গেলাম।

মসজিদের দিকে তাকিয়ে আছে ও। শাহ ফয়সাল মসজিদটা দেখতে বিশাল তাঁবুর মতো। একের পর গাড়িগুলো আসছে যাচ্ছে। শাদা পোশাকের মুসল্লীরা স্রোতের মতো আসছে আর যাচ্ছে। চুপচাপ বসে রইলাম আমরা। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে আছি আমি, আমার পাশেই সোহরাব। বুকের কাছে হাঁটু তুলে রেখেছে। *আযানের* ধ্বনি শুনলাম আমরা। দিনের অলো মুছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দালানের শত শত বাতি জ্বলে উঠতে দেখলাম। অন্ধকারে হীরের মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল মসজিদটা। আকাশটাকে আলোকিত করে তুলল। সোহরাবের মুখও।

"কখনও মাযার-ই-শরীফে গেছ?" হাঁটুর উপর মুখ রেখে জিজ্ঞেস করল

BanglaBoi.org

শোনা একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার: আফগানিস্তানে শিশুদের সীমা নেই, কিন্তু ছেলেবেলা বলে কিছু নেই। ছবিটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে হাত বাড়াল ও।

"রেখে দাও," বললাম, "ওটা তোমার।"

"ধন্যবাদ।" আবার ফটোটার দিকে তাকাল ও, তারপর ভেস্টের পকেটে রেখে দিল। পার্কিং লটের পাশ দিয়ে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি খটাখট শব্দ তুলে পার হয়ে গেল। প্রতি পদক্ষেপে ঘোড়াটার ঘাড়ে ঝোলানো ছোট ছোট ঘণ্টাগুলো টুংটাং শব্দে বাজছে।

"আজকাল মসজিদ নিয়ে অনেক কথা ভাবছি," বলল সোহরাব।

"তাই? কী কথা?"

কাঁধ ঝাঁকাল ও। "এমনি ওগুলোর কথা ভাবি।" মুখ তুলে তাকাল ও। সোজা আমার মুখের দিকে। এখন কাঁদছে, আস্তে, নীরবে। "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, আমির আগা?"

"অবশ্যই।"

"আল্লাহ কি...," শুরু করল ও, উদগত কান্না চাপার প্রয়াস পাচ্ছে। "আল্লাহ কি ওই লোকটাকে যা করেছি সেজন্যে আমাকে দোযখে দেবে?"

ওর দিকে হাত বাড়ালাম আমি। কুকড়ে গেল ও। আমি হাত সরিয়ে নিলাম। "নাহ। অবশ্যই না," বললাম আমি। ওকে কাছে টেনে নিতে ইচ্ছে করছিল, জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করছিল গোটা দুনিয়া ওর ওপর নির্দয় হয়েছিল। সে কারও ক্ষতি করেনি।

স্থির থাকার জন্যে মুখ বেঁকে গেছে ওর, চাপ পড়ছে। "বাবা বলত এমনকি খারাপ লোকদের কষ্ট দেওয়াও খারাপ। কারণ ওরা এরচেয়ে ভালো কিছু জানে না। আর খারাপ লোকেরাও অনেক সময় ভালো হয়ে যায়।"

"সব সময় না, সোহরাব।"

আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ও।

"তোমাকে যে লোকটা আঘাত দিয়েছে, তাকে অনেক আগে থেকে চিনি আমি," বললাম। "আমার মনে হয় ওর সঙ্গে আমার কথাবার্তার ধরণ থেকেই সেটা আন্দাজ করে নিয়েছ তুমি। সে...আমি তোমার সমান থাকতে একবার আমাকে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু তোমার বাবা আমাকে বাঁচিয়েছিল। তোমার বাবা দুর্দান্ত সাহসী ছিল। আমাকে সব সময় বিপদ থেকে বাঁচাত। আমার পক্ষে এসে দাঁড়াত। তো সেজন্যে একদিন একটা বাজে লোক আমার বদলে তোমার বাবাকে কষ্ট দিল। ওকে খুবই খারাপভাবে কষ্ট দেয় সে। আর আমি...আমি তোমার বাবা আমাকে যেভাবে বাঁচাত সেভাবে ওকে বাঁচাতে পারিনি।"

BanglaBook.org

ওঠে। এখন ছেলেটার চোখের পানি আমার শার্ট ভিজিয়ে দেওয়ার সময় বুঝতে পারলাম আমাদের দুজনের মধ্যেও একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। আসেফের সঙ্গে ওই রুমে যা ঘটেছে সেটা আমাদের অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিয়ে দিয়েছে।

এটাই আমার মাথার ভেতর সারাক্ষণ গুণগুণ করে সারারাত জাগিয়ে রাখা প্রশ্নটা করার জন্যে উপযুক্ত সময়, উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষা করছিলাম আমি। মনে হল এটাই সেই উপযুক্ত সময়। এখনই। আমাদের গায়ে যখন খোদার ঘরের আলো ঝলমল করছে।

"তুমি কি আমেরিকায় আমার আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে যাবে?"

জবাব দিল না ও।

আমার শার্টের উপর কেঁদে চলল। ওকে কাঁদতে দিলাম আমি।

সপ্তাহ খানেক আমরা কেউই ওকে যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করলাম না। যেন প্রশ্নটা তোলাই হয়নি। তারপর একদিন আমি আর সোহরাব ট্যাক্সিক্যাবে করে দামান-ই-কোহ–যার অর্থ "পাহাড়ের কিনারা"–ভিউপয়েন্টে গেলাম। জায়গাটা মারগালা পাহাড়ের মাঝামাঝি বলে এখান থেকে ইসলামাবাদের একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়: পরিষ্কার গাছে ছাওয়া রাস্তাঘাট, শাদা দালান কোঠা। ড্রাইভার আমাদের বলেছিল ওখান থেকে প্রেসিডেন্টশিয়াল প্যালেস দেখতে পাব আমরা। "বৃষ্টি হলে আকাশ পরিষ্কার থাকলে এমনকি রাওয়ালপিন্ডি পর্যন্ত দেখতে পাবে," বলেছে সে। রিয়র ভিউ মিররে তার চোখ দেখেছি আমি। পালা করে সোহরাব আর আমাকে দেখছিল। বারবার। নিজের চেহারাও দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। আগের মতো ফোলা ছিল না। তবে মেলাতে শুরু করা অসংখ্য ক্ষতের কারণে হলদে একটা আভা পেয়েছিল।

পিকনিক এলাকাগুলোর একটার একটা বেঞ্চ বেছে নিয়ে একটা গাম গাছের ছায়ায় বসলাম আমরা। উষ্ণ দিন ছিল। টোপাযের মতো আকাশে মাথার উপর উঠে এসেছিল সূর্যটা। কাছের বেঞ্চগুলোয় বিভিন্ন পরিবার *সামোসা* আর *পাকোরা* দিয়ে নাশতা সারছিল। কোথায় যেন হিন্দি গান বাজছিল। আমার মনে হল কোনও ছবিতে এ গান শুনেছি। খুব সম্ভব *পাকিজা*ই হবে। বাচ্চারা–ওদের অনেকেই সোহরাবের বয়সী–সকার বল নিয়ে ছোটাছুটি করছে, হাসছে, চেঁচামেচি করছে। কার্তে-সেহ্-র এতীমখানার কথা ভাবলাম আমি, যামানের অফিসে আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে ছুটে যাওয়া ইঁদুরটার কথা ভাবলাম। আমার দেশের লোকদের নিজের মাটি এভাবে ধ্বংস করে দিতে দেখে অপ্রত্যাশিত

BanglaBook.org

জানতে পেরেছি।"

চোখ পিটপিট করল সোহরাব। যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে; সত্যি সত্যি তাকিয়ে আছে আমার দিকে। এই প্রথমবারের মতো। "কিন্তু কেন সবাই কথাটা তোমার আর বাবার কাছ থেকে চেপে রেখেছিল?"

"কি জান, ঠিক এই প্রশ্নটাই নিজেকে করেছিলাম আমি সেদিন। জবাব একটা আছে বটে, তবে সেটা ঠিক ভালো জবাব নয়। ধরে নাও আমাদের না বলার কারণ তোমার বাবা আর আমার...ভাই হওয়ার কথা ছিল না।"

"ও হাযারা বলে?"

জোর করে চোখজোড়া ওর ওপর স্থির রাখলাম। "হ্যাঁ।"

"তোমার বাবা," শুরু করল ও, খাবারের দিকে চেয়ে আছে, "তোমার বাবা কি তোমাকে আর আমার বাবাকে সমান আদর করত?"

অনেক দিন আগে গারঘা লেকের সেই সময়ের কথা ভাবলাম। সেদিন বাবা হাসানের পাথর আমার পাথরকে হারিয়ে দেওয়ার পর ওর পিঠে চাপড়ে দিয়েছিল। বাবাকে হাসপাতালের রুমে কল্পনা করলাম, হাসানের মুখ থেকে ব্যান্ডেজ খোলার সময় ঝলমল করছিল ওর চেহারা। "মনে হয় আমাদের দুজনকেই সমান তবে ভিন্ন রকম ভালোবাসত বাবা।"

"আমার বাবার জন্যে কি লজ্জিত ছিল সে?"

"না," বললাম। "মনে হয় নিজের উপরই লজ্জিত ছিল ও।"

স্যান্ডউইচটা তুলে নিয়ে নীরবে কামড় বসাল ও।

গরমে ক্লান্ত হয়ে সেদিন বিকেলে চলে এলাম আমরা। তবে এই ক্লান্তি আরামপ্রদ। সারাটা পথ টের পেলাম আমাকে জরিপ করছে সোহরাব। ড্রাইভারকে কলিং কার্ড বিক্রি করে এমন একটা দোকানে থামাতে বললাম আমি। ওকে টাকা দিয়ে বললাম এক দৌড়ে আমার জন্যে একটা কার্ড নিয়ে আসতে।

রাতে আমরা আমাদের বিছানায় শুয়ে টিভিতে একটা টক-শো দেখতে লাগলাম। লম্বা পাকা দাড়িঅলা শাদা পাগড়ি পরা দুজন মোল্লাহ সারা দুনিয়ার বিশ্বাসীদের আহবান জানাচ্ছে। ফিনল্যান্ড থেকে আইয়ূব নামের এক প্রশ্নকর্তা জানতে চাইল তার টিন এইজ ছেলে ব্যাগি প্যান্ট পরার কারণে দোযখে যাবে কিনা। সে প্যান্ট এত নিচু করে পরে যে তা তার আন্ডারওয়্যার দেখা যায়।

"একবার স্যান ফ্রান্সিস্কোর একটা ছবি দেখেছিলাম," বলল সোহরাব।

"তাই নাকি?"

BanglaBook.org

যদি আমাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়? তোমার স্ত্রী আমাকে পছন্দ না করলে?"

অনেক কষ্টে বিছানা ছেড়ে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে গেলাম আমি। ওর পাশে বসলাম। "সোহরাব," বললাম। "কোনওদিনও না। কথা দিচ্ছি। তুমি আমার ভাগ্নে, নাকি? আর সুরাইয়া জান খুবই ভালো মেয়ে। আমার কথা বিশ্বাস করো। তোমাকে ও ভালোবাসবে। কথা দিচ্ছি।" একটা সুযোগ নিলাম আমি। হাত বাড়িয়ে ওর হাত ধরলাম। একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলেও হাতটা ধরে রাখতে দিল ও।

"আমি আরেকটা এতীমখানায় যেতে চাই না," বলল ও।

"তেমনটা কখনওই ঘটতে দেব না আমি। তোমাকে কথা দিচ্ছি," আমার হাতের ওর হাত মুঠো করে ধরে বললাম। "আমার সঙ্গে বাড়ি চলো।"

ওর চোখের পানিতে বালিশ ভিজে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ কোনও কথা বলল না ও। তারপর আমার হাতে চাপ দিল। মাথা দোলাল ও।

চারবারের চেষ্টায় কানেকশন পাওয়া গেল। ও ফোন তোলার আগে তিনবার বাজল। "হ্যালো?" ইসলামাবাদে তখন সন্ধ্যা ৭:৩০। ক্যালিফোর্নিয়ায় মোটামুটি সকালের একই সময়। সেই সময়ে সুরাইয়া ঘুম থেকে উঠেছে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেছে, স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল ও।

"আমি," বললাম। নিজের খাটে বসে ঘুমন্ত সোহরাবের দিকে তাকিয়ে আছি।

"আমির!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ও। "তুমি ঠিক আছো? কোথায় তুমি?"

"পাকিস্তানে।"

"আগেই আমাকে ফোন করোনি কেন? *তাশইউশে* কাহিল হয়ে পড়েছি আমি! মা রোজ দোয়া করছে, *নামায* পড়ছে।"

"ফোন করিনি বলে দুঃখিত। এখন ভালো আছি।" ওকে বলেছিলাম এক সপ্তাহ বড়জোর দুই সপ্তাহ বাইরে থাকব আমি। এখন প্রায় এক মাস হয়ে এসেছে। হাসলাম আমি। "জামিলা খালাকে ভেড়া জবাই বন্ধ করতে বল।"

"'এখন ভালো' মানে? তোমার গলায় কী হয়েছে?"

"আপাতত এনিয়ে ভেব না। আমি ভালো আছি। সত্যি, সুরাইয়া। তোমাকে একটা গল্প বলার আছে। অনেক দিন আগেই এই গল্পটা তোমাকে বলা উচিত ছিল। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলা দরকার তোমাকে।"

"কী?" একটু নামল ওর কণ্ঠস্বর। অনেক সতর্ক।

BanglaBook.org

"থাকব। ও আরেকটা কথা। তোমার বাবা-মাকে ওর পরিচয় জানিয়ো না। যদি জানাতেই হয়, সেটা আমার মুখে শুনলেই ভালো হবে।"

"ঠিকাছে।"

ফোন রেখে দিলাম আমরা।

ইসলামাবাদে আমেরিকান অ্যাম্বেসির লনটা পরিষ্কার করে ছাঁটা বৃত্তাকার ফুলগাছের ঝোপে ভরা। রেযরের মতো খাড়া বেড়ায় ঘেরাও করা। খোদ দালানটা ইসলামাবাদের আরও অনেক দালানের মতোই চ্যাপ্টা, শাদা। ওখানে ঢুকতে গিয়ে বেশ কয়েকটা রোড ব্লক পার হতে হল আমাদের। তিনজন আলাদা সিকিউরিটি অফিশিয়াল মেটাল ডিটেক্টরে আমার চোয়ালের তারের অস্তিত্ব ধরা পড়ার পর দৈহিক তল্লাশি করল। অবশেষে যখন প্রচণ্ড গরম থেকে ভেতরে পা রাখলাম, এয়ারকন্ডিশনারের হাওয়া আমার মুখে যেন বরফ শীতল পানির মতো ঝাপ্টা মারল। লবিতে বসা পঞ্চাশের মতো বয়সী এক হ্যাংলা চেহারার সোনালী চুল মহিলা আমি নিজের নাম বলতেই মুচকি হাসল। অনেকগুলো সপ্তাহ পরে এই প্রথম *বুরকা* বা *শালোয়ার* কামিয ছাড়া ভিন্ন কিছু পরা এক মহিলাকে দেখলাম আমি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিস্টে আমার নাম খুঁজল সে। ডেস্কের উপর পেন্সিলের মাথা দিয়ে তাল ঠুকছে। আমার নাম খুঁজে পেয়ে বসতে বলল আমাকে।

"লেমোনেড খাবে?" জানতে চাইল।

"আমার জন্যে লাগবে না, ধন্যবাদ," বললাম।

"তোমার ছেলের?"

"এক্সকিউজ মি?"

"হ্যান্ডসাম ইয়াং জেন্টলম্যানের কথা বলছি," সোহরাবের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

"ওহ। ভালোই হবে সেটা। ধন্যবাদ।"

রিসিপশন ডেস্কের উল্টোদিকে আমেরিকান ফ্ল্যাগের পাশে কালো চামড়ার সোফায় বসে আছি আমরা। গ্লাসটপ কফি টেবিলের উপর থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিল সোহরাব। পাতা ওল্টাল ও। ঠিক ছবিগুলো দেখছে না।

"কী?" জিজ্ঞেস করল সোহরাব।

"দুঃখিত?"

"তুমি হাসছ।"

"তোমার কথা ভাবছিলাম," বললাম।

BanglaBook.org

বোঝালাম এখন আমি আমেরিকার জমিনে আছি। এই লোকটা আমার পক্ষে। আমার মতো লোকদের সাহায্য করার জন্যে একে বেতন দেওয়া হয়। "আমি এই ছেলেটিকে দত্তক নিতে চাই, ওকে আমার সঙ্গে স্টেটসে নিয়ে যেতে চাই," বললাম।

"আমাকে তোমার গল্পটা বল," আবার বলল সে। তর্জনী দিয়ে গোছানো ডেস্কের উপর ছাই গুঁড়ো করল, ট্র্যাশ ক্যানে ফেলল ওগুলো।

সুরাইয়ার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার পর মাথার ভেতর বানানো গল্পটা তাকে বললাম আমি। আমার সৎ ভাইয়ের ছেলেকে ফিরিয়ে নিতে আফগানিস্তানে যাই আমি। ছেলেটাকে একেবারে পর্যুদস্ত অবস্থায় পাই। এতীমখানায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। আমি এতীমখানার পরিচালককে টাকা দিয়ে ছেলেটিকে বের করে এসেছি। পাকিস্তানে নিয়ে এসেছি ওকে।

"তুমি ছেলেটার সৎ-চাচা?"

"হ্যাঁ।"

ঘড়ি দেখল সে। সামনে ঝুঁকে টম্যাটো গাছটা ঘোরাল। "এমন কাউকে চেন যে এই ঘটনার পক্ষে সাক্ষী দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে এখন কোথায় আছে জানি না।"

আমার দিকে ফিরে মাথা দোলাল সে। লোকটার মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম লোকটা কি কখনও ওই ছোট ছোট হাতগুলো পোকার খেলায় ব্যবহার করেছে কিনা।

"ধরে নিচ্ছি চোয়ালে তার লাগানোটা লেটেস্ট ফ্যাশন না," বলল সে। সোহরাব আর আমি বিপদে পড়েছি, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে গেলাম। লোকটাকে বললাম পেশওয়ারে ডাকাতের কবলে পড়েছিলাম আমি।

"নিশ্চয়ই," বলল সে। "তুমি মুসলিম?"

"হ্যাঁ।"

"প্র্যাকটিসিং?'

"হ্যাঁ।" সত্যি কথা হচ্ছে শেষ কবে *নামায* পড়ার জন্যে মাটিতে মাথা ঠুকেছিলাম মনে নেই আমার। তারপর মনে পড়ল: ডাক্তার আমানি বাবাকে যেদিন প্রগনসিস করল আমি *জায়নামাজে* হাঁটু গেড়ে বসে স্কুলে শেখা অল্প কয়েকটা *আয়াত* মনে করার চেষ্টা করেছিলাম।

"তোমার কিছুটা কাজে আসবে, কিন্তু পুরোপুরি নয়," বলল সে। বালু রঙা চুলের একটা নিপাট জায়গা চুলকাতে চুলকাতে বলল সে।

"কী বলতে চাইছ?" জিজ্ঞেস করলাম। সোহরাবের হাতের দিকে হাত

BanglaBook.org

সমস্যাটা হবে ছেলেটার আসল দেশের সহযোগিতা পাওয়া। আমরা আফগানিস্তান নিয়ে কথা বলছি। কাবুলে আমাদের এম্বেসি নেই। এই ব্যাপারটা অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলছে। প্রায় অসম্ভবই বলা চলে।"

"বলতে চাইছ যে ওকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলি?" বললাম আমি।

"আমি তা বলিনি।"

"ওর উপর যৌন নির্যাতন করা হয়েছে," বললাম আমি, সোহরাবের গোড়ালিতে নূপুর আর চোখে লাগানো মাসকারার কথা মনে পড়ল আমার।

"কথাটা শুনে খারাপ লাগছে," বলল এন্ড্রুজের মুখ। আমার দিকে তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হতে পারে আমরা বুঝি আবহাওয়া নিয়ে কথা বলছি। "কিন্তু তাতে করে আইএনএস এই ছেলেটাকে ভিসা দেবে বলে মনে হয় না।"

"কী বলছ তুমি?"

"বলছি, তুমি সাহায্য করতে চাইলে কোনও নামকরা রিলিফ অরগানইজেশনে টাকা পাঠাও, কোনও রিফিউজি ক্যাম্পে স্বেচ্ছাশ্রম দাও। কিন্তু এই সময়টায় আমরা ইউএস নাগরিকদের আফগান বাচ্চাদের দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে জোরালভাবে নিরুৎসাহিত করছি।"

উঠে দাঁড়ালাম আমি। "এসো, সোহরাব," ফারসিতে বললাম। পিছলে আমার পাশে চলে এল সোহরাব। আমার কোলে মাথা রাখল। ঠিক এইভাবে হাসান আর ওর পোলারয়েডে দাঁড়িয়ে থাকার কথা মনে পড়ল আমার। "তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি, মিস্টার এন্ড্রুজ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার কি ছেলেপুলে আছে?"

প্রথমবারের মতো চোখ পিটপিট করল সে।

"কী, আছে? এটা একটা সহজ প্রশ্ন।"

নীরব রইল সে।

"আমি তাই ভেবেছি," বললাম আমি। সোহরাবের হাত তুলে নিলাম। "ওদের উচিত তোমার জায়গায় এমন একজনকে বসানো যে জানে বাচ্চার আকাঙ্ক্ষা কেমন হয়।" বিদায় নেওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, সোহরাব আমার পিছু নিল।

"তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?" জিজ্ঞেস করল এন্ড্রুজ।

"করো।"

"এই ছেলেটাকে কি তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা দিয়েছ?"

"দিলেই বা কী?"

BanglaBook.org

খাটের কিনারে বসে সুরাইয়াকে ফোন করলাম আমি। বাথরুমের দরজার নিচ দিয়ে চুইয়ে আসা আলোর ক্ষীণ রেখার দিকে তাকালাম। *এখনও কি নিজেকে পাক মনে হচ্ছে না, সোহরাব?*

রেমন্ড এন্ড্রুজ যা যা বলেছে সবই সুরাইয়াকে জানালাম। "তো কী ভাবছ?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"ওর ভুল হচ্ছে, এটাই ধরে নিতে হবে আমাদের," ও বলল কয়েকটা এডপশন এজেন্সির সঙ্গে কথা বলেছে ও, যারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দত্তক নেওয়ার ব্যাপারগুলো দেখাশোনা করে। এখনও এমন কোনও প্রতিষ্ঠানের খোঁজ পায়নি যারা আফগান দত্তক নেওয়ার কাজ করে। তবে এখনও খোঁজ করছে ও।

"তোমার বাবা-মা ব্যাপারটাকে কীভাবে নিচ্ছে?"

"মাদর আমাদের নিয়ে খুশি। তুমি তো জান তোমাকে ও কীভাবে দেখে, আমির, ওর চোখে তুমি কোনও ভুল করতে পারো না। পাদর...এই তো, বরাবরের মতেই ওকে বোঝা একটু কঠিন। তেমন একটা কথাবার্তা বলছে না ও।"

"আর তুমি? তুমি খুশি?"

আওয়াজ শুনে বুঝলাম এক হাত থেকে আরেক হাতে রিসিভার চালান করছে ও। "আমার মনে হয় তোমার ভাস্তের কাছে ভালোই থাকব আমরা। আবার ছোট ছেলেটাও আমাদের জন্যে ভালো হয়ে উঠতে পারে।"

"আমিও একই কথা ভাবছিলাম।"

"জানি শুনে অন্যরকম লাগছে, কিন্তু আমি ভাবতে শুরু করেছি ওর প্রিয় *কুরমা* কেমন হবে বা স্কুলে ওর প্রিয় বিষয় কী হবে? আমি ওর বাড়ির কাজে সাহায্য করছি এমনটা কল্পনা করতে শুরু করেছি আমি..." হেসে উঠল ও। বাথরুমে পানি ঝরা থেমে গেল। ভেতরে সোহরাবের আওয়াজ পাচ্ছি। টাবে নড়াচড়া করছে। পানি ছুড়ে মারছে।

"অনেক বড় হবে তুমি," বললাম আমি।

"ওহ, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম! শরীফ কাকাকে ফোন করেছিলাম আমি।"

মনে পড়ল আমাদের বিয়েতে হোটেলের একটা কাগজে লেখা একটা কবিতা পড়ে শুনিয়েছিল সে। আমি আর সুরাইয়া স্টেজের দিকে এগিয়ে যাবার সময় ওর ছেলে আমাদের মাথার উপরে কোরান ধরে রেখেছিল। ঝলসানো ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছিলাম আমরা। "কী বলেছে সে?"

"বেশ, আমাদের জন্যে একটু নাড়াচাড়া করবে ও। আইএনএস-এ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করবে বলেছে," বলল ও।

BanglaBook.org

ও। কি যেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করেনি। আবার টিভির দিকে মনোযোগ দিয়েছে। কথা বলা পশু-পাখীর অনুষ্ঠান হচ্ছিল তখন।

"এই যে," একটা হলদে লিগ্যাল নোট প্যাড উল্টে বলল ফয়সাল। "আশা করি প্রতিষ্ঠান চালানোর সময় যখন আসবে ছেলেরা ওদের মাকে সাহায্য করবে। আমি দুঃখিত, সম্ভবত তোমার হবু ল-ইয়ারের কাছ থেকে এমন কথা শুনবে বলে আশা করোনি তুমি, না?" হাসল সে।

"বেশ, রেমন্ড এন্ড্রুজ তোমার সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা রাখে।"

"মিস্টার এন্ড্রুজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভালো মানুষ। আসলে, সে-ই আমাকে ফোন করে তোমার কথা বলেছে।"

"তাই?"

"আরে, হ্যাঁ।"

"তার মানে আমার অবস্থা সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে।"

ঠোঁটের উপর থেকে ঘাম মুছল ফয়সাল। "মিস্টার এন্ড্রুজকে তুমি যে অবস্থার কথা বলেছ তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে," বলল সে। ধূর্ত একটা হাসিতে ভরে উঠল তার চেহারা। সোহরাবের দিকে ফিরল সে। "নিশ্চয়ই এই ছেলেটাই সব ঝামেলার কারণ," ফারসিতে বলল সে।

"ও হচ্ছে সোহরাব," বললাম। "সোহরাব, এ হচ্ছে মিস্টার ফয়সাল। তোমাকে যে উকিলের কথা বলেছিলাম।"

বিছানা থেকে পিছলে নেমে এসে ওমর ফয়সালের সঙ্গে হাত মেলাল সোহরাব। "*সালাম আলেকুম*," নিচু কণ্ঠে বলল ও।

"*ওয়ালাইকুম আসসালাম*," বলল ফয়সাল। "জান, এক বিখ্যাত বীরের নামে তোমার নাম রাখা হয়েছে?"

মাথা দোলাল সোহরাব। আবার বিছানায় উঠে টিভি দেখতে লেগে গেল।

"তুমি এত ভালো ফারসি বলতে পার জানতাম না," ইংরেজিতে বললাম আমি। "তুমি কাবুলে বড় হয়েছ?"

"না। আমার জন্ম করাচিতে। তবে বেশ কয়েক বছর কাবুলে ছিলাম আমি। হাজি ইয়াকুব মসজিদের কাছে শার-এ-নও-তে।" বলল ফয়সাল। "আসলে বার্কলিতে বড় হয়েছি আমি। ষাট দশকের শেষের দিকে বাবা ওখানে একটা গানের দোকান খুলেছিল। ফ্রি লাভ, হেডব্যান্ড, টাই-ডাইড শার্ট, যা চাও, তাই মিলত ওখানে।" সামনে ঝুঁকে এল সে। "উডস্টকে ছিলাম আমি।"

"গ্রুভি," বললাম আমি। ফয়সাল এত জোরে হেসে উঠল যে আবার নতুন করে ঘামতে শুরু করল সে। "যাক গে," খেই ধরলাম আমি, "মিস্টার এন্ড্রুজকে

BanglaBook.org

"মানে, বুঝতে পারছি, আবার পারিছি না।"

মাথা দোলাল ওমর। ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে। "বেশ, ব্যাপারটা এমন, যেকোনও বিপর্যয়ের পর, সেটা প্রাকৃতিক বা মানুষর হাতেই তৈরি হোক–তালিবানরা একটা বিপর্যয় তো বটেই, বিশ্বাস করো–কোনও বাচ্চা এতীম কিনা সেটা ঠিক করা সব সময়ই বেশ কঠিন। বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে বাচ্চারা ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা বাবা-মা স্রেফ নিজেদের স্বার্থে তাদের ত্যাগ করে। সব সময়ই এমনটা ঘটে। তো, যতক্ষণ না একটা বাচ্চা এতীমের সংজ্ঞা পূরণ করছে ততক্ষণ আইএনএস ভিসা দেবে না। আমি দুঃখিত, কথাটা হাস্যকর শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট দেখাতে হবে তোমাকে।"

"আফগানিস্তানে ছিলে তুমি," আমি বললাম। "তুমি জান সেটা কতখানি অসম্ভব।"

"জানি," বলল সে। "কিন্তু এসো ধরে নেওয়া যাক বাচ্চাটার বাবা বা মা বেঁচে নেই। তারপরেও আইএনএস মনে করে বাচ্চাকে তার দেশেরই কারও কাছে দত্তক দেওয়াটা ভালো ব্যবস্থা। যাতে ঐতিহ্য বজায় থাকে।"

"কিসের ঐতিহ্য?" আমি বললাম। "আফগানদের যা কিছু ঐতিহ্য ছিল তালিবানরা সব ধ্বংস করে দিয়েছে। ওরা বামিয়ানে বিরাট বুদ্ধ মূর্তিটার কী করেছে, দেখেছ তুমি।"

"দুঃখিত, আইএনএস কীভাবে কাজ করে সেটাই তোমাকে বলছি আমি, আমির," বলল ওমর। আমার হাত ধরল সে। সোহরাবের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। "এখন, কোনও বাচ্চার তার দেশেরই আইনকানুন অনুযায়ী দত্তক হওয়া উচিত। কিন্তু দেশটা যখন উত্তাল অবস্থায় থাকে, ধরো আফগানিস্তানের মতো কোনও দেশ, তখন সরকারী অফিসগুলো ইমার্জেন্সি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটা তখন আর অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকে না।"

লম্বা একটা দম নিয়ে চোখ মুছলাম আমি। ওগুলোর পেছনে আস্তে আস্তে ভীষণ মাথাব্যথা শুরু হতে যাচ্ছে ।

"কিন্তু ধরা যাক, কোনওভাবে আফগানিস্তান ঠিক মতোই কাজ শুরু করল।" স্থূল পেটের উপর দুহাত আড়াআড়ি করে বেঁধে বলল ওমর। "তারপরেও এই দত্তকের ব্যাপারটাকে অনুমতি নাও দিতে পারে। আসলে অনেক উদারপন্থী মুসলিম দেশও দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধা করে। কারণ এসব অনেক দেশেই ইসলামি আইন, শরীয়া, দত্তক নেওয়ার ব্যাপারটাকে অনুমোদন দেয় না।"

"আমাকে হাল ছেড়ে দিতে বলছ তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। হাত

BanglaBook.org

এতীমের জন্যে আবেদন করতে পারবে। ও কোনও নিরাপদ জয়গায় থাকার সময় তুমি তোমার ১-৬০০ আর বাড়ির কাজ শুরু করতে পারবে।"

"এসব আবার কী?"

"দুঃখিত, ১-৬০০ হচ্ছে আইএনএস-এর একটা আনুষ্ঠানিকতা। বাড়ির কাজ করবে তোমার বেছে নেওয়া অ্যাডপশন এজেন্সি," বলল ওমর। "এটা, তুমি জান, তুমি আর তোমার স্ত্রী বদ্ধ উন্মাদ নও সেটা প্রমাণ করার জন্যে।"

"সেটা আমি করতে চাই না," আবার সোহরাবের দিকে তাকিয়ে বললাম। "আমি কথা দিয়েছি ওকে আর এতীমখানায় পাঠাব না।"

"যেমন বললাম, এটাই হয়ত তোমার সেরা উপায়।"

আরও খানিক্ষণ আলাপ করলাম আমরা। তারপর ওকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। একটা পুরোনো ভিডব্লু বাগ। ততক্ষণে পশ্চিম আকাশ লাল রঙে ভরে দিয়ে ইসলামাবাদে সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। ওমর কোনওভাবে হুইলের পেছনে ঢুকতেই গাড়িটা একপাশে হেলে পড়েছে খেয়াল করলাম। জানালার কাচ নামাল সে। "আমির?"

"হ্যাঁ।"

"কথাটা তোমাকে ভেতরেই বলতে চেয়েছিলাম, তুমি যে কাজটা করতে চাচ্ছ, আমার ধারণা এটা একটা বিরাট কাজ।"

চলে যাবার সময় হাত নাড়ল সে। হোটেল রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ার সময় আমার মনে হল এখন সুরাইয়া পাশে থাকলে ভালো হত।

আবার যখন রুমে ফিরে এলাম, সোহরাব টিভি বন্ধ করে দিয়েছে। আমার বিছানার কিনারে বসে আছে ও। ওকে আমার পাশে এসে বসতে বললাম। "মিস্টার ফয়সাল বলছে তোমাকে আমার সঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে যাবার একটা উপায় আছে," বললাম।

"তাই?" ক্ষীণ হেসে বলল সোহরাব। কয়েক দিনের ভেতর এটাই ওর প্রথম হাসি। "কখন যেতে পারব আমরা?"

"ইয়ে, এটাই আসল কথা। সেজন্যে কিছুটা সময় লাগতে পারে। কিন্তু সে বলেছে এটা সম্ভব। আমাদের সাহায্য করবে সে।" ওর ঘাড়ের পেছনে হাত রাখলাম আমি। বাইরে থেকে *নামাযের* আযানের আহবান কানে এল।

"কতদিন?" জানতে চাইল সোহরাব।

"জানি না। কিছুদিন।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসল সোহরাব। এবার একটু চওড়া হাসি। "কোনও অসুবিধে

BanglaBook.org

"এটা অন্যরকম ব্যাপার। ইসলামাদেই হবে ব্যাপারটা, কাবুলে নয়। তোমাকে বের করে আমেরিকায় নিয়ে যেতে না পারা পর্যন্ত আমি তোমাকে সবসময় দেখতে যাব।"

"প্লিজ! প্লিজ, না!" ককিয়ে উঠল ও। "ওই জায়গাকে আমি ভয় পাই। ওরা আমাকে কষ্ট দেবে। আমি যেতে চাই না।"

"কেউ তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না। আর কক্ষণও না।"

"না, দেবে! সব সময় কষ্ট দেবে না বলে, কিন্তু মিথ্যে বলে ওরা। ওরা মিথ্যে কথা বলে! প্লিজ, খোদা!"

বুড়ো আঙুল দিয়ে ওর গাল বেয়ে নেমে আসা জল মুছে দিলাম। "টক আপলের কথা মনে নেই? এটা ঠিক তোমার সেই টক আপেলের মতো," মৃদু কণ্ঠে বললাম।

"না, এটা তা নয়। ওই জায়গায় না। খোদা, ও খোদা। প্লিজ না!" কাঁপছে ও। নাকের পানি আর চোখের পানি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচেছ ওর মুখে।

"*শশশ।*" ওকে টেনে কাছে নিলাম। ওর ছোট্ট কাম্পমান শরীরটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে রাখলাম। "*শশশ*, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরে যাব। দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে"

আমার বুকে চাপা শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। তবে ওর কণ্ঠে আতঙ্ক টের পেলাম। "প্লিজ, আমাকে কথা দাও, আমাকে ওখানে পাঠাবে না। খোদা, আমির আগা! প্লিজ, কথা দাও, ওখানে পাঠাবে না!"

কেমন করে কথা দেব আমি? ওকে আমার গায়ের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরে রাখলাম। সামনে পেছনে দোল খেয়ে চললাম। চোখের জল না শুকানো পর্যন্ত আমার জামাকাপড়ের উপর কেঁদে চলল ও। ওর শঙ্কিত কাকুতি মিনতি এক সময় দুর্বোধ্য বিড়বিড়ানিতে পর্যবসিত হল। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওর শ্বাসপ্রশ্বাস আর শরীর শিথিল না হওয়া পর্যন্ত দোল খাওয়ালাম ওকে। অনেক দিন আগে পড়া একটা কথা মনে পড়ল আমার। *বাচ্চারা ভয়ের মোকাবিলা করে এভাবে। ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।*

ওকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলাম। তারপর শুয়ে পড়লাম নিজের খাটে। চেয়ে রইলাম ইসলামাবাদের পিঙ্গল আকাশের দিকে।

ফোনের শব্দে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। আকাশ তখনও ঘন অন্ধকার। চোখ কচলে বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালালাম। রাত ১০:৩০ টার কিছু বেশী। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে ঘুমাচ্ছি আমি। ফোনটা তুলে নিলাম। "হ্যালো?"

BanglaBook.org

পঁচিশ

আমাকে ঢুকতে দেবে না ওরা।

একটা ডাবল ডোরের ফাঁক দিয়ে স্ট্রেচারে করে ওকে নিয়ে যেতে দেখলাম আমি, অনুসরণ করলাম। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম, আয়োডিন আর পারঅক্সাইডের গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। কিন্তু কেবল দেখতে পেলাম সার্জিক্যাল ক্যাপ পরা দুজন লোক আর সবুজ পোশাকের একজন মহিলা একটা গার্নির কাছে জটলা পাকাচ্ছে। গার্নির একপাশে একটা শাদা চাদর লুটিয়ে পড়েছে, চৌকো ঘর কাটা আঠাল মেঝেতে ঘষা খাচ্ছে। চাদরের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে এক জোড়া রক্তাক্ত পা। দেখলাম বাম পায়ের বড় নখটা কেটে ফেলা হয়েছে। তারপরেই লম্বা চওড়া একলোক আমার বুকের উপর চাপ দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে দরজার বাইরে নিয়ে এল। লোকটার বিয়ের ব্যান্ডটার ঠাণ্ডা ছোঁয়া লাগল আমার গায়ে। ওকে সামনে ধাক্কা দিলাম আমি। মুখ খিস্তি করলাম, কিন্তু সে বলল এখানে থাকতে পারবে না তুমি। ইংরেজিতে কথা বলছিল সে, ভদ্র ভাষায়, দৃঢ় কণ্ঠে। "তোমাকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছে," বলল সে। আবার ওয়েটিং এরিয়ায় নিয়ে এল আমাকে। তার পেছনে মৃদু শব্দ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ডাবল ডোরটা। দরজার উপরের সংকীর্ণ চৌকো জানালার ফোকর দিয়ে এখন শুধু লোকগুলোর সার্জিকাল ক্যাপই দেখতে পাচ্ছি আমি।

দেয়াল বরাবার সাজানো মেটালিক চেয়ারে বসে থাকা লোকজনে ঠাসা একটা জানালা বিহীন করিডরে আমাকে রেখে গেল সে। অন্যরা পাতলা ক্ষয়ে যাওয়া কার্পেটে বসে আছে। আবার আর্তনাদ করে উঠতে ইচ্ছে করল আমার।

BanglaBook.org

ছিলেন। এখানে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি আমি। কাড়িডরে মরিয়া হয়ে ওঠা লোকজনের চোখেমুখে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। এটাই আল্লাহর আসল ঘর। যারা আল্লাহকে হারিয়ে ফেলেছে এখানেই তাদের খোঁজ করা উচিত। ঝলমলে আলো আর আকাশছোঁয়া মিনারঅলা *মসজিদে* নয়। আল্লাহ্ একজন আছেন। থাকতেই হবে। এবার আমি *নামায* পড়ব। দোয়া করব যাতে তিনি তাঁকে এতদিন ধরে অবহেলা করে এসেছি বলে আমাকে যেন মাফ করে দেন। আমার বিদ্রোহ, আমার মিথ্যাচার, আমার গুনাহ্র জন্যে আমাকে যেন মাফ করে দেন। এখন সমস্ত পাপের বোঝা নিয়ে স্রেফ নিজের প্রয়োজনের সময় তাঁর কাছে এসে দাঁড়াবার অপরাধ যেন মাফ করেন। আমি দোয়া করলাম তিনি যেন তাঁর কিতাবে যেমন লেখা আছে তেমনি দয়াময়, করুণাময় আর উদার হন। পশ্চিমে *সেজদা* দিয়ে শপথ করলাম আমি *যাকাত* দেব, নিয়মিত *নামায* পড়ব, *রমযান* মাসে *রোযা* রাখব, *রমযান* মাস শেষ হয়ে গেলেও *রোযা* চালিয়ে যাব আমি। তাঁর পাক কালামের প্রত্যেকটা শব্দ মুখস্থ করে ফেলব। মরুর বুকের সেই উত্তপ্ত শহরে তীর্থযাত্রায় যাব আমি, কাবাহ্র সামনেও মাথা নোয়াব। এসবকিছুই করব আমি। আজ থেকে সারাক্ষণ কেবল তাঁরই নাম জপব। শুধু যদি আমার দোয়া তিনি কবুল করে নেন্। আমার এদুহাত হাসানের রক্তে রঞ্জিত; হে খোদা, তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এগুলোকে আবার ওর ছেলের রক্তে রাঙিও না।

ফোঁপানির শব্দ কানে এল আমার। বুঝতে পারলাম এটা আমারই কান্নার আওয়াজ। আমার গাল বেয়ে জল নেমে আসায় ঠোঁটে লোনা স্বাদ লাগছে। বুঝতে পারছি কড়িডরের প্রত্যেকটা চোখ আমার উপর লেপ্টে আছে। তারপরেও পশ্চিমে মাথা নুইয়ে রাখলাম আমি। দোয়া করতে লাগলাম। দোয়া করলাম আমার পাপ যেন সারাক্ষণ যেমন ভয় পেয়ে আসছি সেভাবে আমাকে খেয়ে ফেলেনি।

ইসলামাবাদের মাথার উপর তারাহীন কালো অন্ধকার রাত নেমে এল। কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। এখন আমি ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের দিকে চলে যাওয়া কড়িডরের পাশের ছোট লাউঞ্জের মেঝেতে বসে আছি। আমার সামনে একটা ফিকে বাদামী কফি টেবিল, ওটার উপর খবর কাগজ আর ছেঁড়াফাটা ম্যাগাজিন পড়ে আছে–*টাইমের* এপ্রিল ১৯৯৬ সংখ্যা; একটা পাকিস্তানি খবরের কাগজ, এক সপ্তাহ আগে ট্রেইনের আঘাতে মারা যাওয়া একটা ছেলের ছবি রয়েছে ওতে। ঝলমলে কাভারের বিনোদন ম্যাগাজিন, তাতে ললিউডের হাসিমুখ অভিনেতাদের ছবি। শাদাটে সবুজ *শালোয়ার-কামিয* পরা এক বয়স্কা মহিলা একটা হুইল চেয়ারে করে আমার সামনে দিয়ে যাবার সময় মাথা দোলা। খানিক পর পরই

BanglaBook.org

লোক হাঁটু গেড়ে বসে আছে। স্যুইং ডাবল ডোরের ওপাশের লোকগুলোর মতো একটা ক্যাপ তার মাথায়। মুখের উপর কাগজের সার্জিকাল মাস্ক। বীপারের উপর একটা ঘুঘু-চোখ ছোট মেয়ের ছবি আটকে রেখেছে। মুখোশটা খুলে ফেলল সে। সোহরাবের রক্তের দিকে তাকাতে হচ্ছে না বলে ভালো লাগল আমার। হাসান আর আমি শার-ই নম্বর বাজার থেকে আমদানি করা সুইস চকোলেট কিনে খেতাম, তার গায়ের রঙ ঠিক সেরকম। মাথায় পাতলা চুল। বাঁকানো ভুরুতে ঢাকা একজোড়া হ্যাযেল চোখ। ব্রিটিশ টানে নিজের নাম জানাল সে আমাকে, ডাক্তার নেওয়ায। সহসা এই লোকের কাছ থেকে দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করল আমার। কারণ এই লোক আমাকে ভালো কোনও খবর দিতে এসেছে বলে মনে হল না। সে বলল ছেলেটা নিজের শরীর অনেক বেশী কেটে ফেলেছে। অনেক রক্ত হারিয়েছে। আবার আমার মুখ দিয়ে দোয়া দরূদ বের হতে শুরু করল:

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুহু, মুহাম্মাদুর রাসূল্লাল্লাহ।

বেশ কয়েক ইউনিট রেড সেল ট্রান্সফিউজ করেছে ওরা–

সুরাইয়াকে কীভাবে বলব আমি?

দুবার,ওকে বাঁচাতে হয়েছে–

আমি নামায পড়ব, যাকাত আদায় করব।

ছেলেটার হার্ট শক্তিশালী আর তরুণ না হলে মারাই যেত–

আমি রোযা রাখব।

ও বেঁচে আছে।

হাসল ডাক্তার নেওয়ায। সে এইমাত্র যা বলল বুঝে উঠতে বেশ খানিক সময় লেগে গেল আমার। তারপর আরও কথা বলল সে। কিন্তু শুনলাম না আমি। কারণ আমি ওর দুই হাত আমার হাতে ধরে মুখের কাছে নিয়ে এসেছি। আগন্তুকের ছোট মাংসল হাতের উপর কাঁদলাম আমি। এখন আর কিছু বলছে না সে। অপেক্ষা করছে।

BanglaBook.org

ইনেটনসিভ কেয়ার ইউনিটটা এল-শেপের, মৃদু আলোকিত ব্লিপ ব্লিপ আর গুঞ্জণ তুলে চলা অসংখ্য যন্ত্রপাতির ছাড়াছড়ি এখানে। সাদা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করা দুইসারি খাটের মাঝখান দিয়ে আমাকে নিয়ে এগোল ডাক্তার নেওয়ায। বাঁক ঘোরার পর শেষ বিছানাটা সোহারাবের। নার্সদের সেকশনের সবচেয়ে কাছে। এখানে সবুজ সার্জিকাল স্ক্রাব পরা দুজন নার্স ক্লিপবোর্ডে কীসব লেখালেখি করছে আর নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। ডাক্তার নওয়াযের সঙ্গে এলিভেটরে করে নীরবে যাবার সময় মনে হল সোহরাবকে

আমি। রাতে হাসপাতালের সাপের মতো আঁকাবাঁকা করিডরে ঘুরে বেড়াই। টাইলের উপর নিজের জুতোর শব্দ শুনি। সোহরাব জেগে ওঠার পরে ওকে কী বলব সেকথাই ভাবি। আবার আইসিইউ-তে ওর খাটের পাশের হুশহুশ করে চলতে থাকা ভেন্টিলেটরের পাশে ফিরে আমি। কিছুই জানতে পারি না।

আইসিইউ-তে তিনদিন থাকার পর ওর ব্রিদিং টিউব খুলে নিল ওরা। নিচের তলার একটা বেডে নিয়ে গেল। ওকে সরিয়ে নেওয়ার সময় ছিলাম না আমি। একটু ঘুমানোর জন্যে সেরাতে হোটেল রুমে গিয়েছিলাম। সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ গড়াগড়ি খেয়ে পার করেছি। সকালে বাথটাবের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করেছি আমি। এখন ঝকঝকে পরিষ্কার ওটা। কেউ রক্ত ধুয়ে সাফ করে ফেলেছে। মেঝেয় নতুন ফ্লোর ম্যাট বিছিয়ে দিয়েছে। দেয়াল পরিষ্কার করেছে। কিন্তু আমি ওটার মসৃণ পোর্সেলিন প্রান্তে না বসে পারিনি। কল্পনা করেছি, সোহরাব পানি দিয়ে ভরছে ওটা। দেখলাম কাপড় খুলছে। রেযরের হাতল ঘোরাতে দেখলাম ওকে। তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে ধরে ওটার মাথার উপরের জোড়া সেফটি ল্যাচ খুলতে দেখলাম। আস্তে করে পানিতে নামতে দেখলাম ওকে। কিছুক্ষণ বসে রইল তাতে। বোঝার চেষ্টা করলাম ব্লেড তুলে পোঁচ লাগানোর আগে মুহূর্তে ওর শেষ ভাবনাগুলো কী ছিল।

আমি লবি পার হচ্ছি, এমন সময় হোটেল ম্যানেজার এসে আমাকে ধরল। "তোমার জন্যে আমার খুবই খারাপ লাগছে," বলল সে। "কিন্তু দয়া করে আমার হোটেল ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করছি তোমাকে। আমার ব্যবসার জন্যে এটা খুবই খারাপ। অনেক খারাপ।"

ওকে বললাম আমি বুঝতে পেরেছি, তারপর বের হয়ে এলাম। হাসপাতালে কাটানো তিন দিনের জন্যে টাকা নিল না সে। হেটেলের বাইরে ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করার সময় আমি যেদিন সোহরাবকে খুঁজছিলাম সেদিন মিস্টার ফায়ায কী বলেছিল সেটা ভাবলাম। *তোমাদের আফগানদের ব্যাপারটা হল...ইয়ে, তোমরা একটু বেপরোয়া।* তখন তার উদ্দেশে হেসেছিলাম, কিন্তু এখন ভাবলাম, সোহরাবকে ওর সবচেয়ে ভয়ের খবরটা দেওয়ার পর আমি কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?

ক্যাবে উঠে বসার পর ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম কোনও পারসিয়ান বইয়ের দোকান চেনে কিনা সে। সে জানাল দেড় দুই কিলোমিটার দূরে একটা দোকান আছে। হাসপাতালে যাবার পথে দোকানের সামনে থামলাম আমরা।

সোহরাবের নতুন ঘরটা ক্রিম রঙের, চিপড গাঢ় ধূসর মোল্ডিং, চকচকে টাইলস,

BanglaBook.org

শেষ হয়ে গেছে, সোহরাব। আর সবাই হয় মরে গেছে। বা মরতে চলেছে। এখন শুধু আমি আর তুমি আছি। কেবল তুমি আর আমি।

"তোমাকে তা দিতে পারব না, সোহরাব," বললাম।

"তুমি যদি আমাকে–"

"প্লিজ, একথা বলো না।"

"–যদি আমাকে...আমাকে পানিতেই ফেলে রাখতে।"

"আর কখনও একথা বলো না, সোহরাব," বললাম আমি। "তোমার এধরনের কথা শুনতে পারব না আমি।" ওর কাঁধে হাত রাখলাম। কুকড়ে গেল ও, সরে গেল দূরে। হাত নামিয়ে নিলাম আমি, মনে পড়ল কীভাবে আমি আমার ছোঁয়ায় সহজ হয়ে ওঠার পর ওকে দেওয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছি। "সোহরাব, আমি তোমাকে তোমার পুরোনো জীবন ফিরিয়ে দিতে পারব না। পারলে খুবই ভালো হত। তবে তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব। সে কথা বলতেই বাথরুমে ঢুকতে যাচ্ছিলাম আমি। আমেরিকায় যাবার জন্যে, আমার আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে থাকার জন্যে ভিসা পেয়েছ তুমি। এটা সত্যি কথা, *কসম*।"

নাক দিয়ে শ্বাস ছেড়ে চোখ বন্ধ করল ও। শেষের কথা দুটো না বললেই ভালো ছিল, ভাবলাম আমি। "তুমি জান, জীবনে অনেক কাজ করেছি আমি যে জন্যে এখন অনুশোচনা হয়," বললাম। "তবে তোমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার মতো ছিল না কোনওটাই। কিন্তু এমন আর ঘটবে না। আমি খুব, খুব দুঃখিত। আমি তোমার *বকশেষ*, ক্ষমা চাইছি। সেটা করতে পারবে? আমাকে মাফ করে দিয়ো? আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবে?" গলার স্বর নামালাম আমি। "আমার সঙ্গে যাবে তুমি?"

ওর জবাবের অপেক্ষা করার সময় অনেক দিন আগের এক শীতের দিনে ফিরে গেল আমার মন। একটা পাতাহীন টক চেরি গাছের নিচে তুষারে বসে ছিলাম আমি আর হাসান। সেদিন হাসানের সঙ্গে একটা নিষ্ঠুর খেলা খেলেছিলাম। তামাশা করেছি। ওকে জিজ্ঞেস করেছি, আমার কাছে বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে ও মাটি খেতে রাজি আছে কিনা। এবার আমিই পরিণত হয়েছি সেই একই পরীক্ষার বিষয়ে। আমাকেই এবার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। এটা আমার পাওনা ছিল।

আমার দিকে পেছন ফিরে একপাশে কাত হল সোহরাব। অনেকক্ষণ কোনও কথা বলল না ও। তারপর আমি যখন ধরে নিতে যাচ্ছি ও ঘুমিয়ে পড়েছে, গোঙানির মতো করে বলল, "আমি খুব *খাস্তা*।" আমি অনেক ক্লান্ত।

ও না ঘুমানো পর্যন্ত বিছানার পাশে বসে রইলাম। আমার আর সোহরাবের

BanglaBook.org

কাছে কোনও সিনেমার শেষটা বলে দেওয়াটা *দস্তুর* নয়। সেটা করলে শেষটা নষ্ট করে দেওয়ার পাপের জন্যে মাফ চাওয়ানো হবে তোমাকে।

কিন্তু আফগানিস্তানে শেষটাই আসল। আমি আর হাসান যখন সিনেমা যায়নাব থেকে কোনও হিন্দি সিনেমা দেখে ফিরে আসতাম, আলি, রহিম খান, বাবা, কিংবা বাবার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব–বাড়িতে আনাগোনা করতে থাকা দুনিয়ার সব চাচাত ভাইয়েরা–জানতে চাইত: ছবির মেয়েটা কী সুখ খুঁজে পেয়েছিল? *বাচে ফিল্ম*–ছবির লোকটা–কি *কামিয়াব* হয়েছিল, তার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছিল নাকি *নাহ কাম*, মানে একেবারে শেষ হয়ে গেছে?

শেষ পর্যন্ত কি সুখের দেখা মিলেছিল, জানতে চাইত ওরা।

আজ যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে, হাসান, সোহরাব আর আমার কাহিনীর সুখ সমাপ্তি হয়েছে কিনা, কী বলতে হবে জানা নেই আমার।

আর কেউ কি জানে?

যাহোক, জীবন কোনও হিন্দি ছবি নয়। *যিন্দেগী মিগযারা*, আফগানরা বলতে পছন্দ করে। জীবন বয়ে চলে সূচনা, সমাপ্তি, *কামিয়াব*, *নাহ-কাম*, ক্রাইসিস বা ক্যাথরেসিসকে গ্রাহ্য করে না, *কোচিদের* নোংরা শ্লথ ক্যারাভানের মতো এগিয়ে চলে।

প্রশ্নটার জবাব কী হবে জানি না আমি। গত রোববারের ছোট সেই অলৌকিক ঘটনার ব্যাপারটা ছাড়া।

মোটামুটি মাস দশেক আগে, ২০০১ সালের আগস্ট মাসের এক উষ্ণ দিনে বাড়ি এসেছি আমরা। এয়ারপোর্টে আমাদের তুলে নিয়েছিল সুরাইয়া। এত লম্বা সময় কখনওই সুরাইয়ার কাছ থেকে দূরে থাকিনি আমি। সুরাইয়া যখন দহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল, আমি ওর চুলে আপেলের গন্ধ পেলাম, বুঝলাম এই দিনগুলোয় কতখানি মনে পড়েছে ওকে। "এখনও তুমি আমার *য়েলদার* পর সকালের সূর্য," ফিসফিস করে বলেছিলাম।

"কী?"

"বাদ দাও," বলে ওকে চুমু খেয়েছি।

পরে সোহরাবের সঙ্গে কথা বলার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসল ও। ওর একটা হাত ধরে মৃদু হাসল ও। "*সালাম*, সোহরাব জান। আমি তোমার সুরাইয়া খালা। আমরা সবাই তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম।"

সোহরাবের দিকে ওকে তাকাতে দেখে আমার মনে হল ওর জরায়ু বেঈমানি না করলে কেমন মা হতে পারত ও সেটারই যেন একটা আভাস দেখতে পাচ্ছি আমি। সোহরাবের চোখও জলে ভরে উঠেছিল তখন।

BanglaBOOK.org

বিক্ষত একজন মানুষ ছিল, চিঠিতে বলেছিল রহিম খান। আমি ছিলাম বৈধ অর্ধেক, সামাজিকভাবে অনুমোদিত, আইনসঙ্গত অর্ধেক, বাবার পাপের অনিচ্ছুক প্রতিমূর্তি। দুটো খোয়া যাওয়া দাঁত বিহীন রোদের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকা হাসানের দিকে তাকালাম। বাবার আরেক অর্ধেক। অবৈধ, অধিকার বঞ্চিত বাকি অর্ধেক। যে অর্ধেক বাবার ভেতরে ভালো যা কিছু ছিল তার উত্তরাধিকার পেয়েছে। হয়ত সেটাই ওর একেবারে গোপন কন্দরে আসল বাবা ছিল। বাবা ওকে নিজের ছেলে বলেই জানত।

যেখানে পেয়েছিলাম আবার সেখানেই রেখে দিলাম ছবিটা। তারপর একটা জিনিস বুঝতে পারলাম আমি। শেষের ভাবনাটার সঙ্গে কোনওরকম কাঁটার স্পর্শ ছিল না। সোহরাবের দরজা আটকে দিতে দিতে ভাবলাম এভাবেই ক্ষমার সূচনা ঘটে কিনা। এপিফ্যানির শোরগোলের ভেতর দিয়ে নয়, বরং বেদনার নানা জিনিস যোগাড় আর গুছিয়ে নেওয়া এবং রাতের অন্ধকারে অলক্ষ্যে আস্তে করে বের হয়ে যাওয়ায়।

পরের দিন রাতে ডিনারে এল জেনারেল আর জামিলা খালা। চুল ছেটে খাট করে ফেলেছে সে। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী লাল মনে হচ্ছে। ডেজার্টের জন্যে সঙ্গে করে আনা এক প্লেট আখরোট বসানো *মাগুত* সুরাইয়ার হতে তুলে দিল সে। সোহরাবকে দেখে চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। "*মাশাল্লাহ!* সুরাইয়া আমাদের বলেছে তুমি কত *খোশতিপ*। কিন্তু সামনাসামনি তুমি তার চেয়েও অনেক সুন্দর, সোহরাব জান।" ওর হাতে একটা নীল টার্টলনেক স্যুয়েটার তুলে দিল সে। "তোমার জন্যে এটা বানিয়েছি আমি," বলল। "আগামী শীতের জন্যে। *ইনশাল্লাহ,* তোমার গায়ে ঠিকই লাগবে।"

ওর কাছ থেকে স্যুয়েটারটা নিল সোহরাব।

"হ্যালো, ইয়াংম্যান," বেতের ছড়ির উপর দুহাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু এটুকুই বলেছিল জেনারেল। এমনভাবে সোহরাবের দিকে তাকিয়েছে যেন কারও বাড়িতে বেড়াতে এসে অদ্ভুত কোনও ডেকোরেশন পিস দেখছে।

একের পর জবাব দিয়ে চললাম আমি। জামিলা খালা আমার নানান ক্ষত নিয়ে প্রশ্ন করে চলল—সুরাইয়াকে বলে দিয়েছিলাম ওদের বলতে যে আমি ডাকাতদের কবলে পড়েছিলাম—ওকে আশ্বাস দিয়েছি আমার মারাত্মক কোনও স্থায়ী ক্ষত হয়নি। কয়েক সপ্তাহের ভেতরই ক্ষতগুলো সেরে উঠবে, আবার ওর রান্না করা খাবার খেতে পারব। ক্ষতগুলো যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে সেজন্যে রুবারের রস আর চিনি মাখার চেষ্টা করব আমি।

BanglaBook.org

সোহরাবকে চুপচাপ বলাটা ভুল হবে। নীরবতা হচ্ছে শান্তি। প্রশান্তি। নীরবতা হচ্ছে জীবনের **ভলিয়্যুম** নবটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

নীরবতা হচ্ছে **অফ বাটনটাকে ঠেলে দেওয়া। বন্ধ করে দেওয়া। পুরোপুরি।**

সোহরাবের নীরবতা স্ব-আরোপিত বা বিক্ষোভকারীদের নীরবতার মতো নয় যারা কিনা কথা না বলে কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এটা হচ্ছে সেই মানুষের নীরবতা যে অন্ধকারের আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত প্রান্ত এক করে নিচে গুজে রেখেছে।

জায়গা দখল করার মতো আমাদের জীবনে তেমনভাবে প্রাণবন্ত নয় ও। খুব কমই জায়গা নেয় ও। অনেক সময় পার্কে বা বাজারে, আমি লক্ষ করেছি, লোকে তেমন একটা খেয়াল করে না ওকে। যেন ওর কোনও অস্তিত্বই নেই। আমি হয়ত বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে তাকিয়েছি, তারপর খেয়াল হবে সোহরাব ঘরে এসেছে। ঘরে ঢুকে আমার সামনে বসেছে, আমি আগে টের পাইনি। এমনভাবে হাঁটে ও, যেন পেছনে পায়ের চিহ্ন রেখে যেতে ভীত। এমনভাবে নড়াচড়া করে যেন আশপাশের বাতাসকেও কাঁপাতে চায় না ও। বেশীরভাগ সময়ই ঘুমিয়েই থাকে ও।

সোহরাবের নীরবতা সুরাইয়ার উপর প্রবল চাপ ফেলছে। পাকিস্তানে লং ডিসটেন্স কলে কথা বলার সময় সুরাইয়া আমাকে সোহরাবকে নিয়ে কী কী পরিকল্পনা করেছে জানাত: সাঁতারের ক্লাস, সকার, বাউলিং লীগ। এখন সোহরাবের রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় পলকের জন্যে বেতের বাস্কেটে পড়ে থাকা পাতা না-ওল্টানো বই, চিহ্নহীন গ্রোথ চার্ট আর না-মেলানো জিগ-স পাযল দেখে। হতে পারত এমন একটা জীবনের স্মারক ওগুলো–এমন এক স্বপ্নের স্মারক যেটা কিনা শুরুর আগেই ভেঙে পড়তে চলেছে। কিন্তু একা নয় ও। সোহরাবকে ঘিরে আমারও স্বপ্ন ছিল।

সোহরাব নীরব থাকলেও দুনিয়া নীরব হয়ে নেই। গত সেপ্টেম্বরের এক মঙ্গলবারের সকালে টুইন টাওয়ার ভূমিসাৎ হয়ে গেল, রাতারাতি বদলে গেল সারা দুনিয়া। সব জায়গায় হঠাৎ করে আমেরিকান পতাকা উড়তে শুরু করল। ট্রাফিকের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে পথ করে চলা হলদে ক্যাবের অ্যান্টেনায়, সাইডওঅক ধরে একটানা এগিয়ে চলা পথচারীদের কোটের ল্যাপেলে, এমনকি ছোটছোট আর্ট গ্যালারি আর দরজা খোলা দোকান-পাটের ছায়ায় বসে থাকা স্যান ফ্রান্সিস্কো প্যানহ্যান্ডলারদের নোংরা টুপিতে পর্যন্ত। সাটার অ্যান্ড স্টকটনের মোড়ে রোজ অ্যাকর্ডিয়ান বাজাত এডিথ, একদিন ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি ওর পায়ের কাছে অ্যাকর্ডিয়ানের বাক্সের গায়ে একটা আমেরিকান পতাকা সাঁটা রয়েছে।

BanglaBook.org

একটা কম্বল আমাদের পা ঢেকে রেখেছে। টিভিতে ডিক ক্লার্ক দেখছি। রূপার বলটা পড়ে গেলেই লোকে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠছে। চুমু খাচ্ছে। আর কনফেটি পর্দাকে শাদা করে দিচ্ছে। আমাদের বাড়িতে একটা নতুন বছরের শুরু হল অনেকটা আগের বছর যেভাবে শেষ হয়েছিল সেভাবেই। নীরবতায়।

তারপর, চার দিন আগে, ২০০২ সালের মার্চের এক বৃষ্টিভেজা ঠাণ্ডা দিনে একটা ছোট অথচ অসাধারণ সুন্দর ঘটনা ঘটল।

সুরাইয়া, জামিলা খালা আর সোহরাবকে নিয়ে ফ্রিমন্টের লেক এলিযাবেথ পার্কে আফগানদের একটা সমাবেশে গিয়েছিলাম। অবশেষে আগের মাসে তলব পেয়ে আফগানিস্তানে চলে গেছে জেনারেল–সপ্তাহ দুই আগে সেখানে গেছে স–ধূসর স্যুট আর পকেট ঘড়িটা রেখে গেছে সে। ওখানে থিতু হওয়ার পর কয়েক মাস পর খালা গিয়ে যোগ দেবে তার সঙ্গে। জেনারেলের কথা অনেক ভাবে খালা–ওখানে তার স্বাস্থ্য নিয়ে সে বিশেষ চিন্তিত। আমরা জোর করে এ কদিনের জন্যে আমাদের কাছে এনে রেখেছি ওকে।

গত বৃহস্পতিবার ছিল আফগান নববর্ষ–শঅল-ই-নঅ-বে এলাকার আফগানরা গোটা বে এলাকা আর পেনিনসূলা জুড়ে উৎসবের অয়োজন করেছিল। কবির, সুরাইয়া আর আমার আনন্দ করার বাড়তি কারণ ছিল: রাওয়ালপিন্ডিতে আমাদের ছোট হাসপাতালটা সপ্তাহখানেক আগে খুলেছে: সার্জিকাল ইউনিটটা নয়, স্রেফ পেডিয়াট্রিক ক্লিনিকটা। তবে শুরু হিসাবে ভালো, একমত হয়েছিলাম আমরা।

কয়েক দিন ধরে রোদ উঠছে। কিন্তু রোববার সকালে আমি যখন বিছানা ছাড়ছি, জানালার গায়ে বৃষ্টির ফোঁটার আঘাতের শব্দ কানে এল। *আফগান কপাল*, ভাবলাম। নাক টানলাম। সুরাইয়া ঘুমে থাকতেই *ফজরের নামায* পড়েছি আমি–এখন আর মসজিদ থেকে যোগাড় করে আনা *নামাযের* প্যামফ্লেট দেখতে হয় না। এখন সাবলীলভাবেই অনায়াসে মুখে উঠে আসে *সূরাগুলো*।

দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম আমরা। দেখলাম জমিনে পোঁতা খুঁটির উপর বিছানো চৌকো আকারের প্লাস্টিক শিটের নিচে আশ্রয় নিচ্ছে জনা কয় লোক। অনেকে এরই মধ্যে *বোলানি* ভাজতে লেগে গেছে। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। ফুলকপির *আউশের* হাড়ি থেকেও ধোঁয়া বের হচ্ছে। ক্যাসেট প্লেয়ারে জোরে বাজছে আহমেদ যহিরের পুরোনো একটা গান। আমরা চারজন ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় মৃদু হাসলাম আমি। আমি আর সুরাইয়া সামনে। মাঝখানে জামিলা খালা। আমাদের পেছনে সোহরাব। হলদে

কোলে তুলে নিয়েছিল আলি, বলেছিল ভয়ের কিছু নেই, ওরা স্রেফ হাঁস শিকার করছে।

তারপর কে একজন মোল্লাহ নাসিরুদ্দিনের কৌতুক বলল, সবাই হেসে উঠলাম আমরা। "কী জান, তোমার বাবা কিন্তু মজার মানুষও ছিল," বলল কবীর।

"ছিল, তাই না?" হেসে বললাম আমি। মনে পড়ল আমরা ইউএস-এ পৌঁছানোর পরপরই বাবা আমেরিকান মাছি নিয়ে গজগজ শুরু করেছিল। ফ্লাইওয়াটার নিয়ে রান্নাঘরে বসে থাকত ও, দেয়াল থেকে আরেক দেয়ালে মাছির উড়ে যাওয়া লক্ষ করত, এখানে ভনভন করছে ওখানে ভনভন করছে, মহা ব্যস্ত। "এই দেশে এমনকি মাছিরা পর্যন্ত মহা ব্যস্ত," গুঙিয়ে উঠে বলত ও। এখন সেই কথা মনে পড়ায় হাসলাম আমি।

তিনটা নাগাদ বৃষ্টি থেমে গেল। খণ্ড-খণ্ড মেঘে ঢাকা আকাশ মুখ ভার করে রইল। পার্কে শীতল একটা বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে আরও অনেক পরিবার এসে হাজির হয়েছে। আফগানরা পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করল, স্বাগত জানাল। চুমু খেল। খাবার বিনিময় করল। কেউ একজন বারবি-কিউতে আগুন জ্বালল। অচিরেই রসুন আর মোরগ *কাবাবের* গন্ধ আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ভরে দিল। গান বাজছে। আমার অপরিচিত কোনও নতুন গায়ক হবে। বাচ্চারা হাসাহাসি করছে। সোহরাবকে দেখলাম। এখনও সেই হলুদ রেইন কোট পরনে। একটা ময়লার বালতির গায়ে ঠেস দিয়ে আছে।

পার্কের উল্টো দিকের একটা খালি ব্যাটিং কেজের দিকে ওর চোখ।

খানিক বাদে আমি যখন সাবেক সার্জনের সঙ্গে আলাপ করছি, আমাকে সে বলছিল বাবা আর সে ফিফথ গ্রেডে ক্লাসমেট ছিল। আমার হাত ধরে টান দিল সুরাইয়া। "আমির, দেখ!"

আকাশের দিকে ইঙ্গিত করছিল ও।

আধা ডযেন ঘুড়ি উড়ছিল আকাশের বেশ উপরে। ধূসর আকাশের পটভূমিতে উজ্জ্বল লাল, হলুদ আর সবুজের সমাহার।

"দেখ তো," বলল সুরাইয়া। ততক্ষণে কাছের একটা স্ট্যান্ডে ঘুড়ি বিক্রিরত এক লোকের দিকে ইশারা করতে শুরু করেছে ও।

"এগুলো একটু ধর," আমার চায়ের কাপটা সুরাইয়ার হাতে দিলাম আমি। সার্জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘুড়িঅলার দিকে এগিয়ে গেলাম। ভেজা ঘাসে পচপচ শব্দ তুলছে আমার জুতো। একটা হলদে *সেহ-পর্চা* দেখালাম আমি। "*সআল-ই-নও মুবারক*," বলল ফেরিঅলা। আমার কাছ থেকে বিশ টাকার

BanglaBook.org

বলেছিলাম এখন আর সেটা মনে নেই।

"তোমাকে কি কখনও বলেছি যে তোমার বাবা ওয়াযির আকবার খান-এর–সম্ভবত কাবুলেরও–সেরা ঘুড়ি ধাওয়াকারী ছিল?" বললাম। নাটাইয়ের সুতোর আলগা প্রান্তটা ঘুড়ির মাঝখানের স্পারে আটকাতে শুরু করলাম। "মহল্লার ছেলেদের ঈর্ষান্বিত করে তুলত ও। আকাশের দিকে একবারও না তাকিয়ে ঘুড়ির পিছু ধাওয়া করত। লোকে বলত ও ঘুড়ির ছায়াকে ধাওয়া করছে। কিন্তু ওকে আমার মতো করে চিনত না ওরা। তোমার বাবা কোনও ছায়া ধাওয়া করত না। ও স্রেফ জানত।"

আরও আধা ডযেন ঘুড়ি উড়তে শুরু করেছে আকাশে। লোকেরা দলে দলে সমবেত হতে শুরু করেছে। হাতে চায়ের কাপ, চোখ আকাশের দিকে।

"আমাকে এটা ওড়াতে সাহায্য করবে?" জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

ঘুড়ি থেকে লাফ দিয়ে আমার দিকে ফিরে এল সোহরাবের চোখ। আবার আকাশের দিকে ফিরে গেল।

"ঠিকাছে," বললাম, "মনে হচ্ছে, এটা *তানহাই*-ই–একা–ওড়াতে হবে আমাকে।"

বাম হাতে নাটাইটা স্থির করে নিয়ে মোটামুটি তিন ফুটের মতো সুতো ছাড়লাম। সুতোর মাথায় দোল খাচ্ছে হলদে ঘুড়িটা। ভেজা ঘাসের ঠিক ওপরে। "শেষ সুযোগ," বলালাম। কিন্তু গাছপালার অনেক ওপরে কাটাকাটি লেগে যাওয়া একজোড়া ঘুড়ির দিকে চেয়ে রইল সোহরাব।

"ঠিকাছে, এই চললাম।" দৌড়াতে শুরু করলাম আমি। আমার স্নিকারের ঘায়ে এখানে ওখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি ছলকে উঠছে। ঘুড়ির সুতো ধরা হাতটা মাথার উপরে তুলে রেখেছি। শেষবার এমন করার পর অনেকদিন, অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। নিজেকে দেখার জিনিসে পরিণত করেছি কিনা ভাবলাম একবার। দৌড়ানোর সময় বাম হাতের নাটাই থেকে সুতো বেরিয়ে যেতে দিলাম। হাতের ভেতর দিয়ে যাবার সময় টের পেলাম ফের আমার হাত কেটে দিচ্ছে। এখন আমার কাঁধের পেছনে উঠে এসেছে ঘুড়িটা। উড়ছে। পাঁই করে ঘুরে আবার ছুট লাগালাম। আরও জোরে ঘুরতে লাগল নাটাইটা, আবার একটা কাঁচ লেগে হাত কেটে গেল। থেমে ঘুরে দাঁড়ালাম। হাসলাম। অনেক উপরে পেণ্ডুলামের মতো এপাশ ওপাশ দুলছে আমার ঘুড়িটা। কাবুলে সেই কাগজের পাখির ডানা ঝাপ্টানোর মতো শব্দ করছে। গত পঁচিশ বছর ঘুড়ি ওড়াইনি। কিন্তু হঠাৎ করেই আবার বার বছর বয়সে ফিরে গেলাম। সেই পুরোনো প্রবৃত্তিগুলো ধেয়ে আসতে লাগল।

BanglaBook.org

তোমার বাবার একটা কায়দা এখন দেখাতে যাচ্ছি আমি। পুরোনো উপরে উঠে তারপর গোত্তা খাওয়া।"

আমার পাশে নাক দিয়ে প্রবল বেগে শ্বাস ফেলছে সোহরাব। ওর হাতের তালুর উপর বনবন করে ঘুরছে নাটাইটা, ওর বিক্ষত হাতের রেখাগুলো যেন *রুবাবের* তার। চোখ পিটপিট করে উঠলাম আমি। তখনই মুহূর্তের জন্যে নাটাই ধরা হাতগুলোয় একটা হেয়ারলিপ ছেলের ছোট করে ছাঁটা নখ আর কড়া-পড়া একটা ছেলের হাত দেখতে পেলাম। কোথাও একটা কাক ডেকে ওঠার শব্দে মাথা তুলে তাকালাম। টাটকা তুষারে একেবারে ঝলমল করছে গোটা পার্ক, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে; শাদা তুষারে ঢাকা গাছের ডালপালায় চিকিচিক করছে নিঃশব্দে। এখন শালগমের *কোরমার* গন্ধ নাকে লাগছে। শুকনো মালবেরি। টক কমলা। কাঠের গুঁড়ো আর ওয়ালনাট। চাপা নীরবতা, তুষারের নীরবতা কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। তারপর অনেক দূর থেকে একটা কণ্ঠস্বর বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে ডাকল আমাদের। ডান পা টেনে টেনে চলা এক লোকের কণ্ঠ ওটা।

এখন ঠিক আমাদের মাথার উপরে এসে ভাসছে সবুজ ঘুড়িটা। "এখুনি হানা দেবে সে, যেকোনও মুহূর্তে," বললাম আমি। একবার ঘুড়ির দিকে আরেক বার সোহরাবের দিকে তাকাচ্ছি আমি।

ইতস্তত করল সবুজ ঘুড়িটা। স্থির হয়ে রইল এক জায়গায়। "এবার আসছে!" বলে উঠলাম।

নিখুঁতভাবে করলাম কাজটা। এতগুলো বছর পর। সেই পুরোনো উপরে উঠে তারপর গোত্তা খাওয়া। হাত শিথিল করে সুতোয় টান দিলাম, গোত্তা খেয়ে ঘুড়িটাকে বাউলি কেটে সরে গেলাম। ঝটপট কয়েকটা টান পড়ল সুতোয়, অমনি আমাদের ঘুড়িটা অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে আবার উপরে উঠে এল। হঠাৎ উপরে চলে এলাম আমি। সবুজ ঘুড়িটা এখন ভয়ে পালানোর তাল করছে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। আগেই হাসানের কায়দা চালিয়ে দিয়েছি ওর উপর। কষে টান লাগালাম, সঙ্গে সঙ্গে গোত্তা খেল আমাদের ঘুড়িটা। আমাদের সুতোয় ওর সুতো কেটে যাওয়াটা যেন মনের চোখে দেখতে পেলাম। কেটে যাওয়ার আওয়াজটাও পেলাম যেন।

তারপর স্রেফ সাঁই করে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল সবুজ ঘুড়িটা।

আমার পেছনে লোকজন চিৎকার দিয়ে উঠল। শিস আর হাততালির শব্দ প্রবল হয়ে উঠল। হাঁপাচ্ছি আমি। শেষবার ১৯৭৫ সালের সেই শীতে একটা ঘুড়ি বোকাট্টা করে বাবাকে আমাদের ছাদে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল চেহারায় হাততালি

BanglaBook.org